হিন্দি*ইংরেজি*রাশিয়ান*বাংলা*পাঞ্জাবী*মারাঠি
প্রেমজীৎ সিরোহী
সম্পূর্ণ সমাধান
নতুন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা
অনুবাদক
মাধব রঞ্জন সরকার

সম্পূর্ণ সমাধান

এক নতুন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থা

অনুবাদক

মাধব রঞ্জন সরকার

বিশ্বব্যাপী গভীর চিন্তকদের উদ্দেশ্যে সমর্পিত,

যারা সকলের জন্য সুখের সন্ধান করেছেন

এবং

সমগ্র জগতের কল্যানে মনুষ্যজাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য

আমি প্রকৃতি, মনুষ্য, জীবজন্তু, বনস্পতি, জড়-চেতন, এমনকি স্বয়ং নিজেকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়নের পর যা অনুভব করেছি এবং উপলব্ধি করেছি তা প্রয়োগ করার জন্য আমি সম্পূর্ণ নতুন এক বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণ করেছি। এই নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং চলমান থাকলে জগতের সমস্ত প্রাণী সকল প্রকার অভীষ্ট সুখ উপভোগ করতে পারবে, এমনকি ভবিষ্যতেও কোনোপ্রকার দুঃখের উদয় হবে না। এই ব্যবস্থায় সকল প্রকার জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগের বিতরণ এমনভাবে করা হয়েছে যেখানে কাউকে কোনোপ্রকার দুঃখ না দিয়ে সকলের কাছে তাদের ঈপ্সিত জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ সুনিশ্চিতভাবে পৌঁছাতে পারবে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা দ্বারা সকলেই যেন পূর্ণরূপে সর্বদা সুখী জীবন উপভোগ করতে পারে এই হচ্ছে আমার মূল অভিপ্রায়।

যদি আপনি এই পুস্তক অধ্যয়ন করে নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বুঝে থাকেন ঠিক যেমনভাবে এবং যেমন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই পুস্তক রচনা এবং বর্ণনা করেছি যে নতুন ব্যবস্থায় সকলেই স্থায়ীরূপে সুখী হবে তবে আপনার কাছেও এই আশা রাখি আপনি অবশ্যই অন্য সকলকে এই পুস্তক সম্পর্কে অবগত করাবেন। আপনার এই সহযোগিতা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়ক হবে। এটি সামাজিক কর্ম যা একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। ফলে সকলের কাছ থেকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা আবশ্যক। যখন সকলে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে যে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের জীবন সমস্তরকম সুখের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে তখন এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলকেই প্রয়াস করা উচিত। এমনটি সম্ভব হলে তবেই আমাদের ইচ্ছেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে এবং এমনতর ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা সকলের জীবনের পরমলক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই প্রত্যেকে সকল প্রকার সুখ উপভোগ করতে পারবে। এই পুস্তক নির্বাচন করার জন্য হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে আপনাকে অভিনন্দন ব্যক্ত করছি। আশা করছি পুস্তকটি অধ্যয়নের পর আপনি সকল সমস্যার মূল কারণ জেনে যাবেন এবং সকল প্রকার সুখের প্রাপ্তি কীভাবে সম্ভব হবে তাও বুঝে যাবেন। তারপর শুধুমাত্র নতুন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার কর্ম অবশিষ্ট থাকবে। বর্তমান ব্যবস্থা চলাকালীন সময়ে এই নতুন ব্যবস্থাকে যারা যতখানি আমল দেবে ঠিক সেই দিন থেকেই তারা মানসিকভাবে ততখানি সুখী হয়ে উঠবে। আর, সকলেই পূর্ণরূপে সুখী তখনই হবে যখন এই পুস্তকে বর্ণিত নতুন ব্যবস্থা আমাদের কাছে চলে আসবে। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর কাউকে ভিন্নভাবে

অন্য কোনো প্রয়াস করতে হবে না। কারণ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হতে থাকবে। এই পুস্তক অধ্যয়নের পর আপনি এমন অনেক বিষয় জানতে পারবেন যা পূর্বে জানতেন না। আপনার মানসিক ক্ষমতা এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতারও বিকাশ ঘটবে। যার দ্বারা আপনার সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বেড়ে যাবে। আপনি জানতে পারবেন আমাদের সকলের জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং কীভাবে তা পূরণ হতে পারে। হয়তো বা এইপ্রকার বিষয়বস্তু নিয়ে এটি আপনার জীবনে প্রথম পুস্তক হবে যা সরাসরি আপনার-আমার জীবনের সাথে সংযুক্ত কথাগুলোকে সরাসরি প্রকাশ করে দেবে এবং আমাদের জীবনের সমস্ত রহস্যের আবরণ অতি সহজেই উন্মোচিত করে দেবে। এমনকি বহুকাল ধরে চলে আসা যে মান্যতা, 'সকলের জীবন পূর্ণরূপে সুখী করা সম্ভব নয়' এমন মিথকেও ভেঙ্গে দেবে। এখনও অবধি আমরা সকল মহাপুরুষদের কাছ থেকে এটিই শুনে আসছি এবং পড়ে আসছি যে এই সংসার হচ্ছে দুঃখের সাগর, এখানে কেউ সুখী হতে পারবে না। যেমন– দুঃখ থেকে যদি বাঁচতে চাও তবে পূজা কর, পাঠ কর, নামাজ পড়, দান কর, মানুষের সেবা কর, মন্ত্র জপ কর, ধ্যান কর, সমাধিস্থ হও, মন্দিরে যাও, গির্জায় যাও, মসজিদে যাও, ভোগী হবে না, যতটুকু আছে ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাক, দীন-দুঃখীদের সেবা কর, অধিক সময় ভগবানের সেবায় উৎসর্গ কর— ইত্যাদি বহু প্রকারের বাক্য আমরা শুনে থাকি। যদি সবগুলি লিপিবদ্ধ করতে যাই তবে এই বিষয়ের উপরই একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচিত হয়ে যাবে। 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক অধ্যয়নের পর এই প্রকার ভ্রমগুলি আপনার ভেঙ্গে যাবে। আপনি এটিও বুঝে যাবেন যে মানুষ মানুষের দুঃখের কারণ নয় বরং ভ্রষ্ট ব্যবস্থা দায়ী। আপনার ভেতর একটি আশার সঞ্চার জাগ্রত হবে এবং আপনিও বলে উঠবেন দুঃখের জীবন অনেক হয়েছে। এই সংসার দুঃখী হবার জন্য রচিত হয়নি বরং পূর্ণরূপে সুখী হবার জন্যই রচিত হয়েছে। সুখী হবার সেই সকল উপায়গুলিকেও এই পুস্তকে সহজ-সরলভাবে পূর্ণাঙ্গ ব্যখ্যাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সামান্য বোধসম্পন্ন ব্যক্তিও তা অতি সহজেই বুঝে যাবেন। এরপরও যদি কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তবে আপনি সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য আমি সমস্তরকম প্রয়াস করব।

RZF- 1/252,

Gali- 2A Mahaveer Enclave,

Palam Village,

S.W. Delhi-45

Mob-901338342

প্রেমজীৎ সিরোহী

অনুবাদকের কথা

২০২০ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক সাক্ষাৎকার শোনার সময় 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকের নাম প্রথম জানতে পারি। পুস্তকটির সারমর্ম শোনামাত্রই অধ্যয়নের প্রবল আগ্রহ জাগে। শপিং সাইটে পুস্তকটি খুঁজে পেয়ে তৎক্ষণাৎ অর্ডার করি। যদিও PDF কপি বা E-Book বিনামূল্যে ডাউনলোড করার সুযোগ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি কাগজের পুস্তক হাতে নিয়ে পড়তেই অধিক সুবিধা পাই। নতুন কাগজের শব্দ ও গন্ধের অনুভূতিই যেন আলাদা। তথাকথিত আধ্যাত্ম, দর্শনশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়গুলির সাধারণ অর্থ কী হওয়া উচিত এবং আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং সমষ্টিগত জীবনে উক্ত বিষয়গুলির বাস্তবিক ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত তা 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক অধ্যয়ন করে স্পষ্ট হতে পারি। এমনকি জগতের কল্যানে অথবা সকলের সুখের জন্য উক্ত বিষয়গুলির উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হবার পেছনে মূল কারণগুলি কী তাও বুঝতে পারি। কোনো রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান ভিত হচ্ছে ব্যবস্থা বা সিস্টেম। যাকে আমরা সরকার বলে থাকি। সরকারের মূল অর্থ হচ্ছে সর্বকার, অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম সম্পাদনকারী সংস্থা। যেসব দেশের ব্যবস্থা উন্নত সেইসব দেশে শিক্ষা, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান এবং নাগরিকের জীবন-যাপনের মানও উন্নত। যদিও বিকশিত দেশের সংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা, এমনকি এইসব বিকশিত বা উন্নত দেশগুলিও বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অবশিষ্ট ৯০ শতাংশ দেশই পুরোপুরি অনুন্নত এবং এই দেশগুলির বাস্তবিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে যেন বিশ্বের সকল নাগরিক আজীবন সমৃদ্ধশালী জীবন উপভোগ করতে পারে। অর্থাৎ সকল নাগরিকের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সুরক্ষা, সুখসুবিধা ইত্যাদি প্রদান করার জন্য কাউকে যেন ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতে না হয়। এমনকি অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, ক্লাব, এনজিও ইত্যাদির যেন আর প্রয়োজন না পড়ে। আজীবন সকলের জন্য পরিপূর্ণ সুখসুবিধা এবং স্থায়ী সংরক্ষণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রদান করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাই যেন সমস্তকিছু পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকের মাধ্যমে লেখক মহাশয় এমনই একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার মডেল উপস্থাপন করেছেন। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর কারোর জীবনে কোনো সমস্যা উৎপন্নই হবে না। কারণ সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থায় সমস্যা উৎপন্ন হবার মূল উৎসটিকেই সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থা একটি নতুন দর্শনের উপর

ভিত্তি করে মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে। যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি, ইন্টারনেট সুবিধা, অটোমেশন সিস্টেম, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি অত্যাধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার থাকবে। ফলে একদিকে কঠিন কাজে শারীরিক শ্রম ন্যুনতম ব্যবহার হবে অপরদিকে স্বল্প সময়ে অধিক বস্তু এবং পরিষেবা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। তাই সঠিক ব্যবস্থাই হচ্ছে কোনো দেশের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যেন কোনো নাগরিক চাইলেও অনৈতিক হবার সুযোগ না পায়। যেন দুর্নীতি করার প্রয়োজনও না পড়ে। সিরোহী মহাশয়ের বিখ্যাত উক্তিটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, 'মানুষকে সংশোধন করার প্রয়োজন নেই, ব্যবস্থা জনগণের সুবিধা অনুযায়ী হওয়া উচিত'। সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থার নতুন অর্থনীতির সাথে পরিচয় ঘটলেই আপনি সকল সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেয়ে যাবেন। এই পুস্তক অধ্যয়নের পূর্বে সাধারণ বোধ অনুযায়ী আমিও মানুষকেই অভিযুক্ত করে আসছিলাম। মূলতঃ সঠিক ব্যবস্থার অভাবেই বেশীরভাগ মানুষ বিপথে চালিত হতে বাধ্য হয়। সুতরাং ব্যবস্থাকে এমনভাবে নির্মাণ করা উচিত যেন কোনোপ্রকার সমস্যা উৎপন্নই না হয়। এই পুস্তকে আপনি সমস্ত সমস্যার মূল কারণ জানার পাশাপাশি প্রকৃত সমাধানও পেয়ে যাবেন। জড়-পদার্থ, বৃক্ষ-বনস্পতি, পশু-পক্ষী এবং মনুষ্য জাতির সকল দুঃখের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখক মহাশয় দীর্ঘ ২০ বছর অতিবাহিত করেছেন। সমস্যার কারণগুলিকে চিহ্নিত করেই থেমে থাকেননি বরং স্থায়ী সমাধান প্রস্তুত করে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করেছেন। এমনকি এই নতুন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের কাজেও দিনরাত প্রয়াস করে চলেছেন।

'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তির পরই আমার মনে হয়েছে এই পুস্তক শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় দ্রুত অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন। এরপর লেখক মহাশয়ের সাথে পরিচয় ঘটলে তিনি ULM (Universal Life Management) সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠানে যুক্ত হবার আমন্ত্রণ জানান। এরপর আমি যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করলাম। পূর্বেই যে আমার এই পুস্তক বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার আগ্রহ জন্মেছিল তা লেখক মহাশয়ের কাছে কোনোভাবেই প্রকাশ করতে পারছিলাম না। অনুষ্ঠানেই একদিন আলাপ হয় সুকান্ত প্রধান মহাশয়ের সাথে। হঠাৎ একদিন তিনিই আমায় অনুবাদ করতে বলেন। আমারও যে একই ইচ্ছে ছিল সেকথা জানালাম। অতঃপর লেখক মহাশয়ের সম্মতি পেয়ে কর্ম শুরু হয়। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা এবং সংশোধন করার জন্য প্রধান মহাশয় ছাড়া আমার কাছে দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই। কারণ উনি আমার পূর্বে সম্পূর্ণ সমাধানের খোঁজ পেয়েছেন এবং বিষয়বস্তু ভাল করে বুঝে নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে দিনরাত প্রচারও করে চলেছেন। ওনার সহযোগিতার কথা স্বল্প পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়। এরপর আরেকজন ব্যক্তির

সাহায্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি অম্বরিশ মিশ্র। ইনিই সম্পূর্ণ সমাধানের ইংরিজি সংস্করণ 'The Complete Solution'-এর সহলেখক এবং অনুবাদক। 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক রচনাকালীন সময়ে মিশ্র মহাশয়ের সাথেই লেখকের সর্বাধিক আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি দিনরাত ULM সংস্থার অন্দরমহলের দায়দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ে তিনি আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। একইসাথে ULM সংস্থার সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তন-মননরত সকল বন্ধুদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। এরপর আমার সহধর্মিণীর সাহায্যের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা না করলে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিষয়টি অপূর্ণ রয়ে যাবে। শুভ্রা একজন প্রকৃত বন্ধুর মতই আমার নানা পাগলামিকে সর্বদা প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। তার সহযোগিতা না পেলে পছন্দের কর্মগুলিকে সম্পাদন করা সহজ হতো না।

বাংলা ভাষায় অনুবাদ সমাপ্ত হবার সুখবরটি লেখক মহাশয়কে জানাতে আমি তখন উদগ্রীব ছিলাম। তিনি সেইসময় 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকের রাশিয়ান ভাষার অনুবাদিকা জুলিয়ানা এস্পস্টল মহাশয়ার সাথে প্রচারের কাজে রাশিয়া সফরে ছিলেন। আমি মেসেজে লিখে জানালাম, 'আপনার সাথে কিছু কথা আছে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করব'। উত্তরে তিনি অডিও মেজেজ পাঠাতে বলেন। সুখবরটি প্রেরণ করার পাশাপাশি পুস্তকের প্রারম্ভে এবং অন্তিম স্থানে কিছু সংযোজন করতে চাই সেকথাও জানালাম। মস্কো থেকে তিনি অডিও মেসেজে আমায় ধন্যবাদ জানালেন এবং সংযোজনের অনুমতিও দিলেন। সঙ্গে এও বললেন আমি নাকি আপন আগ্রহে একটি বিরাট কর্ম সম্পূর্ণ করে ফেলেছি, এই পুস্তক নাকি বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আশা করি কোনো মানুষই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জীবন কাটাতে চায় না, সকলেই সমাধান চায়। স্থায়ী সমাধান এবার আমাদের হাতে রয়েছে। এই প্রকারের বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা সবেমাত্র প্রচারকর্ম শুরু করেছি। এই পুস্তক অন্যান্য গতানুগতিক পুস্তকের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এটি অধ্যয়ন করেই পাঠকের দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না বরং প্রারম্ভ হয়।

'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকটি দ্রুত বিশ্বের সকল নাগরিকের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষায় পৌঁছে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। যেন বিষয়বস্তু বুঝে নিয়ে সকলেই নিজেদের মতামত উপস্থাপন করতে পারে। ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন সংস্থা প্রয়াসরত রয়েছে। যেমন ভারতে অরোভিল ও আনন্দমার্গ, আমেরিকার ফ্লোরিডায় The Venus Project, অস্ট্রেলিয়ায় The World Transformation Movement ইত্যাদি। প্রাথমিক দৃষ্টিতে অনেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থার তত্ত্বকে সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক এবং লেখকের দ্বিতীয় পুস্তক 'সম্পূর্ণ

জীবন দর্শন’ গভীরভাবে অধ্যয়নের পর তারা বুঝতে পেরেছেন, এই তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্বগুলির তুলনায় মূল স্থানেই পৃথক। আমরা এই তত্ত্বকে ‘ব্যক্তিবাদ’ নামে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ সম্পূর্ণ সমাধানের তত্ত্ব প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে ১০০ শতাংশ প্রাধান্য প্রদান করেছে। তা একদিকে আমাদের জীবনের অভ্যন্তরীণ এবং সহজাত উদ্দেশ্য যে সুখী হওয়া সেই মূল ভিতকে কেন্দ্রে রেখে ব্যবস্থা পরিবর্তনের তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছে। অপরদিকে, অর্থনীতিই যে সমস্তকিছুর মূল ভিত্তি এবং বর্তমান সময়ে অর্থনীতিই যে প্রধান বাধা— এই সমস্যাটিকে নতুন ব্যবস্থায় মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থায় বর্তমান অর্থনীতির একটি বিরাট পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ অর্থনীতিকে পরিবর্তন না করে ব্যবস্থা পরিবর্তন নিরর্থক। সুতরাং সমস্ত তত্ত্বের ধারক বাহকগণ এক মঞ্চে মিলিত হয়ে মত বিনিময় করে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বটিকে প্রামাণ্য হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে বিশ্বের মুখোমুখি সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির দ্রুত সমাধানের উদ্দেশ্যে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি-সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করা উচিত। এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠনমূলক চিন্তন-মনন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যই লেখক মহাশয় ULM নামক সংস্থা নির্মাণ করেছেন। ULM সংস্থার মুক্তমঞ্চে বিশ্বের সকলের সাদর আমন্ত্রণ। বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের কাছে সবিনয় অনুরোধ আপনারা এই পুস্তকে বর্ণিত যে কোনো অধ্যায় অথবা বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। যুক্তিপূর্ণ মনে হলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রচার করতে পারেন অথবা আমাদের সাথেও যুক্ত হতে পারেন। ভাল না লাগলে অথবা অবাস্তব মনে হলে সেইসব সমীক্ষাও মুক্ত মঞ্চে উপস্থাপন করতে পারেন। যদি আপনার কাছে সম্পূর্ণ সমাধানের চাইতেও অধিক শ্রেষ্ঠতর কোনো সমাধান থাকে তবে সে বিষয় নিয়েও আমাদের সাথে চিন্তন-মনন করতে পারেন। অন্য কোনো সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হলে আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করে নেব। আপনার বক্তব্য লিখিত আকারেও আমাদের কাছে প্রেরণ করতে পারেন। এতে গঠনমূলক আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধে হবে। সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ আপনার পরিচিত-অপরিচিত সকলকে এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলুন এবং তাদের অবশ্যই E-BOOK কপিটি প্রেরণ করুন। সকলের অধ্যয়নের সুবিধার্থে আমরা এটি বিনামূল্যে অর্পণ করেছি। শিক্ষক, লেখক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, গবেষক, বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গদের কাছে অতি দ্রুত এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরী। সমাজের বিশিষ্ট বর্গের ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে চিন্তন-মনন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে জনগণের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুবিধে হবে। সকলের সুখী জীবনই হচ্ছে এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সকল প্রকার দুঃখের সমাপ্তি। অন্তিম অধ্যায়ে যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যম উল্লেখ করা

হয়েছে। পুস্তকে অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি রয়ে গেলে অবশ্যই আমাদের অবগত করাবেন। নতুন ব্যবস্থার দ্রুত সফলতার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। পরিশেষে **'সম্পূর্ণ সমাধান'** পুস্তকটি সংগ্রহ করার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

175 Panchanantala Road,
Kolkata- 700041
Mob- 9830925502

(2022) মাধব রঞ্জন সরকার

সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার গঠনে জনমত সংগ্রহ অভিযান

তারিখ........../........./............

সরকার

দেশের সকল সার্বজনিক কার্য সম্পাদন করার জন্যই সরকার নামক সংস্থা গঠন করার প্রয়োজন হয়। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত সকল সার্বজনিক কার্য সরকার দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

১. শিক্ষা

দেশের সকল নাগরিকের যোগ্যতা, ক্ষমতা, কৌশল ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সার্বিক বিকাশের জন্য এবং জীবিকা উপার্জন সম্পর্কিত উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

২. জীবিকা/কর্মসংস্থান

২৫ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিকের যোগ্যতা ও পছন্দের অনুরূপ কোনো একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। এছাড়া অন্যান্য সকল নাগরিকের জন্যও সমান সুখসুবিধাসম্পন্ন জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা।

৩. সুখসুবিধা

দেশের সকল নাগরিকের জন্য আধুনিক সুখসুবিধাসম্পন্ন বাসস্থানসহ সমস্ত সার্বজনিক সুখসুবিধা, যেমন— সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, ডাক, দূরভাষ, দূরদর্শন, রেডিও, পরিবহণ, পার্ক, স্টেডিয়াম, পুস্তকালয় ইত্যাদি পরিষেবার যথোপযুক্ত সুখসুবিধার ব্যবস্থা করা।

৪. সংরক্ষণ

দেশের সকল নাগরিকের সুরক্ষা হেতু প্রতিটি শ্রেণীর ভিত্তিতে সমষ্টির চার বিভাগ, যেমন— জড়-পদার্থ, বৃক্ষ-বনস্পতি, পশু-পক্ষী এবং মনুষ্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সহায়তা ও সহযোগিতা, সুরক্ষা ও ন্যায়ালয় ইত্যাদি সার্বজনিক পরিষেবাদির যথোপযুক্ত সংরক্ষণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

আপনার মতামত

আপনি কি উপরোক্ত বিষয়াবলীর সাথে সহমত? হ্যাঁ ☐ / না ☐

নাম..

বয়স...................লিঙ্গ..........................জীবিকা....................

ঠিকানা...
....
....

মোবাইল নম্বর.........................ইমেল.....................................

নাগরিকের হস্তাক্ষর...

যদি আপনি সহমত হন তবে এই কাজে কীভাবে সহায়তা করতে পারেন।

১. বাহ্যিক সমর্থন ☐ ২. আর্থিক সমর্থন ☐

৩. সাংগঠনিক কর্ম ☐ ৪. নেতৃত্ব কর্ম ☐

জনমত সংগ্রাহকের নাম, কোড এবং হস্তাক্ষর.......................................

সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা থেকে প্রাপ্ত লাভসমূহ

প্রিয় পাঠকবর্গ, সহজভাবে বললে এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা স্থাপিত হলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনে কোনোপ্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকবে না বরং সমস্ত প্রকার সুখসুবিধা সর্বদা উৎপন্ন হতে থাকবে। প্রথমত, এই ব্যবস্থা মনুষ্যের প্রাকৃতিক স্বভাব এবং চেতনাকে বুঝে এক নতুন দর্শনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থায় নতুন অর্থনৈতিক মডেল, নতুন রাজনৈতিক মডেল, নতুন সামাজিক মডেল, নতুন পারিবারিক মডেল এবং নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। একত্রে এটি একটি নতুন এবং বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সার্বিকভাবে জগতের কল্যাণ হবে। এই ব্যবস্থার প্রধান কিছু বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে—

১. জন্মের পর থেকেই সকলের জন্য সমস্ত সুখসুবিধা সমানভাবে সহজলভ্য থাকবে, যা সেইসময় নির্মাণ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ ব্যবস্থা বা সরকার দ্বারা ডিজাইন করা পোর্টালের মাধ্যমে অর্ডার করে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং পরিষেবা গ্রহণ করা যাবে।

২. সকল শিক্ষার্থীর ইচ্ছে অনুযায়ী বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা সমাপ্তির পর যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী কোনো একটি কাজের ট্রেনিং অথবা গবেষণা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। ট্রেনিং শেষে সকলের জন্য নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষা প্রদানের মনোরম পরিবেশ এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা থাকবে।

৩. এই ব্যবস্থায় মুদ্রা বা টাকার প্রয়োজন থাকবে না। এমনকি বস্তু এবং পরিষেবার মূল্যও নির্ধারণ করা থাকবে না। কোনো বস্তু এবং পরিষেবা গ্রহণের বিনিময়ে ব্যবস্থাকে কিছু প্রদান করতে হবে না এবং কাজের বিনিময়ে কোনো বেতনও থাকবে না।

৪. ব্যক্তিগত স্তরে বস্তু অথবা পরিষেবা আদান-প্রদানের প্রয়োজন পড়বে না। অর্থ উপার্জনের জন্য জীবিকা, ব্যক্তিগত ব্যবসা অথবা বস্তু বিনিময়ের প্রয়োজন হবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনো বাজার থাকবে না। সকলের চাহিদা পূরণের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা দ্বারা সমস্তকিছু উৎপাদন এবং বিতরণ করা হবে।

৫. এই ব্যবস্থায় সকলের নিজস্ব অনলাইন প্রোফাইল থাকবে। যেখানে জনগণের সমস্ত বিবরণ পঞ্জীভূত থাকবে। যেমন— নাম, ঠিকানা, বয়স, ফটো, যোগ্যতা, দক্ষতা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি।

৬. বিভিন্ন বস্তু এবং পরিষেবা গ্রহণের জন্য সকলে নিজেদের অনলাইন প্রোফাইল তৈরি করতে পারবে এবং অর্ডার প্লেস করতে পারবে। নিরক্ষর মানুষদের জন্যও সরল প্রক্রিয়া এবং সহায়তার বন্দোবস্ত থাকবে। সকলের সমস্ত অর্ডার একটি কেন্দ্রীভূত অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেই হবে।

৭. সমস্ত রকমের চাহিদাকে বিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি নিজের ঈপ্সিত বস্তু এবং পরিষেবা কোনো অর্থ ছাড়াই অর্ডার করতে পারবেন। উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থা সরকার দ্বারা কেন্দ্রীভূত রয়েছে।

৮. নতুন ব্যবস্থায় সম্পদ দখলের কোনোরূপ লড়াই থাকবে না। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা থাকবে না এবং এটি সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র অর্থব্যবস্থাও নয়। এই ব্যবস্থায় জনগণই সকলের জন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এই প্রস্তাব সাম্যবাদের নির্দিষ্ট কোনো রূপান্তরও নয় যা আপনি পুস্তকটি অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারবেন।

৯. সমস্ত সুবিধা উপভোগ করার জন্য ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী সুস্থ্য নাগরিকদের পছন্দ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো একটি জীবিকা নির্বাচন করতে হবে। শিশু, প্রবীণ, অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী নাগরিক কোনোপ্রকার কর্ম সম্পাদন না করেও নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি পরিবারে স্বামীর অথবা স্ত্রীর নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো একটি কর্মে যোগদান অনিবার্য থাকবে।

১০. সরকারের কাছে সকলের অর্ডার অবিরত পৌঁছাতে থাকবে। সেই অর্ডার অনুযায়ী সমস্ত বস্তু নির্মিত হবে এবং ডেলিভারি বিভাগ বিতরণের কর্ম করবে।

১১. শুরুতে নিরাপত্তার জন্য বস্তু এবং পরিষেবার নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকবে। দুর্লভ বস্তু এবং পরিষেবাকে সামাজিক ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। যেন সকলেই সেই সুবিধা গ্রহণ করে সুখ উপভোগ করতে পারে।

১২. মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দুটোই ব্যবস্থার অধীন থাকবে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের জন্য মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সংমিশ্রণে সকলের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হতে থাকবে। আমরা তো জানি এই জগতে প্রাকৃতিক সম্পদের কোনও অভাব নেই। সমস্ত সম্পদ ম্যানেজমেন্টের জন্য শুধুমাত্র একটি সঠিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। নতুন ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক পরিচালন

ব্যবস্থা দ্বারা সকল নাগরিক নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য পছন্দের কর্ম করতে থাকবে।

১৩. এই ব্যবস্থায় গুণমান এবং দক্ষতা নিশ্চিতরূপে উচ্চমানের হবে। কারণ সকলেই নিজেদের পছন্দ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে থাকবে। পছন্দের কর্ম সম্পাদনের ফলে সকল বস্তু এবং পরিষেবা উচ্চমানের নির্মিত হবে। এতে নির্মাণকারীরা যেমন সুখ অনুভব করবে তেমনি সকল ব্যবহারকারীও অনুরূপ সুখ অনুভব করবে।

১৪. ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত ন্যুনতম লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্ম করবে। ব্যবস্থা কাউকে কখনোই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বাধ্য করবে না। প্রতিদিনের কাজের সময় আনুমানিক ৪ ঘণ্টা থেকে ৫ ঘণ্টার হবে। ব্যবস্থা শুধুমাত্র দেখবে বস্তু এবং পরিষেবার গুণগত মান সঠিক রয়েছে কিনা। এই ব্যবস্থায় কেউ কারোর উপর পুলিশের মত নজরদারি রাখবে না। এমনকি ভয় দেখিয়ে অথবা জোরপূর্বক কর্ম করানোর প্রয়োজনও হবে না।

১৫. জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং মতামত ক্রমাগত আসতে থাকবে। কোনো বস্তু এবং পরিষেবা ব্যবহার করার সময় যদি গুণগত মান সঠিক না থাকে তৎক্ষণাৎ জনগণের কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া চলে আসবে। সেই প্রতিক্রিয়া যদি নেতিবাচক হয় তবে উক্ত পদাধিকারী অথবা বিভাগের উপর প্রশ্নচিহ্ন চলে আসবে। তারা খতিয়ে দেখবে কোথায় ভুল রয়েছে এবং সমাধানের জন্য তা নির্দিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ফলে যে কোনো সমস্যাকে জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করে নেওয়া হবে, যেন ব্যবহারকারী সন্তুষ্ট হয় এবং একই সমস্যা পুনরায় না আসে। এইভাবে সমস্ত কিছুর গুণমান সুনির্দিষ্ট করা হবে।

১৬. কিছু বস্তু এবং পরিষেবা এমন থাকবে যা আপনি ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্তরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করতে পারবেন। আপনার ব্যবহারের পর সেই বস্তু রিসাইক্লিং বা নবীকরণের জন্য পুনরায় ব্যবস্থার কাছে ফেরত চলে যাবে। ফলে কোনো ব্যক্তিকেই বস্তু এবং পরিষেবার মালিক হবার প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ যিনি যে বস্তু অথবা পরিষেবা যতদিন অবধি ব্যবহার করবেন ততদিন তার অধিকারী হবেন। যার যখন যা কিছু প্রয়োজন হবে তা অবিরত পেতে থাকবেন। ফলে সকলে সর্বদা সুখী অবস্থায় থাকবে।

১৭. সকল চাহিদা যেহেতু সর্বদা নির্ধারিত সময়ে পূরণ হতে থাকবে সেইজন্য কোনো সম্পদ জমিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়বে না। এমনকি জমিয়ে রাখার সম্ভাবনাও থাকবে না। ব্যক্তিকে কখনই ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

১৮. সকলের জন্য টাউনশিপ অথবা নগরীয় জীবন-যাপনের ব্যবস্থা থাকবে এবং সমস্ত সুখসুবিধা সামাজিক স্তরে প্রদান করা হবে। যেমন— পরিবহণ, সুইমিং পুল, জিম, রেস্তোরাঁ, ক্লাব, রিসোর্ট, সিমেনা হল, সেলুন, বিউটি পার্লার, স্টেডিয়াম, আর্ট গ্যালারী, সাংস্কৃতিক মঞ্চ ইত্যাদি। কাউকে ভিন্নভাবে ওইসকল সুখসুবিধা উপভোগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে মালিক হবার প্রয়োজন পড়বে না। এইসকল সুখসুবিধার বন্দোবস্ত সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা দ্বারাই প্রদান করা হবে। কোনোরূপ টেনশনের বোঝা ছাড়াই সকলে সমস্ত অত্যাধুনিক সুখসুবিধার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

১৯. এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মডেল এমন রয়েছে যেখানে সমস্ত ক্ষমতা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩৬৫ দিন জনগণের হাতে নিহিত থাকবে, কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর হাতে নয়। সমস্ত ক্ষমতা সর্বদা জনগণের হাতে নিহিত থাকার কারণে কখনও কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না। সমস্ত ব্যবস্থা জনগণ দ্বারা, জনগণের পছন্দ অনুযায়ী এবং জনগণের জন্য চালিত হতে থাকবে। ফলে সঠিক অর্থে এটিই হবে 'প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা'।

২০. সাংবিধানিক সংশোধন জনগণের সহমত ছাড়া সম্ভব হবে না। এমন কোনো নীতিনিয়ম থাকবে না যা জনহিতকে আঘাত করবে। জনগণের সুখ, সুরক্ষা এবং অধিকার সুনিশ্চিত করাই হবে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এখন আমরা মতামত প্রকাশের অধিকার যেমন ৫ বছরে একবার পেয়ে থাকি নতুন ব্যবস্থায় এই অধিকার ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ সর্বদা জনগণের হাতে থাকবে। যদি ১০% জনগণ কোনো নীতিনিয়ম অথবা নেতার প্রতি অসম্মতি প্রকাশ করে তবে তা বাতিল হয়ে যাবে অথবা উক্ত পদাধিকারী পদচ্যুত হয়ে যাবে। এই পুস্তকে বর্ণিত নতুন রাজনৈতিক মডেল অধ্যয়ন করে আপনি এই বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারবেন।

২১. অভিযোগের জন্য অনলাইন পদ্ধতি থাকবে। সমস্ত প্রকার অফিসিয়াল কার্যক্রম অনলাইন পদ্ধতিতেই হবে। অর্থাৎ কোনো কাজের জন্য কোথাও লাইনে দাঁড়াতে হবে না। কাউকে সুপারিশ করা অথবা সুপারিশ চাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। জনগণ প্রাপ্ত বস্তু এবং পরিষেবার গুনাগুণ যাচাই অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে। এমনকি সন্তুষ্টি রেটিং প্রদান করতে পারবে। নেতৃত্বমণ্ডলীসহ সকল নাগরিক এই প্রতিক্রিয়ার রেটিং যে কোনো সময় অনলাইনে দেখে নিতে পারবে।

২২. একটি সফটওয়্যার দ্বারা প্রদত্ত রেটিং গণনা হতে থাকবে। ফলে নেতা, কর্মচারী এবং আধিকারিকবৃন্দের উপর প্রদত্ত রেটিং-এর হিসেব বিশ্লেষণ হতে থাকবে। এই রেটিং নির্ধারণ করে দেবে উক্ত পদাধিকারী ওই দায়িত্ব পালনের জন্য

উপযুক্ত না অনুপযুক্ত। যদি কোনো পদাধিকারীর রেটিং নির্দিষ্ট ক্রমাংকের নীচে চলে যায় তবে নির্বাচন কমিশন উক্ত পদের উপযুক্ত নতুন কাউকে নিযুক্ত করবে। এইভাবে 'নাগরিক সন্তুষ্টি রেটিং' নেতৃত্ব মণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রদান করবে।

২৩. সার্বজনিক স্তরে বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমস্ত তথ্য একটি কেন্দ্রীয় পোর্টালে সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে। জনগণ R.T.I.-এর (তথ্য গ্রহণের অধিকার) আবেদন ভিন্নভাবে ফাইল প্রেরণ না করেও সমস্ত তথ্য সরাসরি পোর্টাল থেকে গ্রহণ করতে পারবে। ফলে সরকারের সাথে সমস্ত যোগাযোগ সহজ এবং সরল থাকবে।

২৪. সমস্ত পদের নির্বাচন পরীক্ষার মাধ্যমে হবে। নেতা হবার জন্যও প্রার্থীকে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। উত্তীর্ণ ব্যক্তিরাই কেবলমাত্র নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করবে।

২৫. নতুন ব্যবস্থায় একটি বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার অধীনে সশস্ত্র সেনাবাহিনী থাকবে। যখন একাধিক রাষ্ট্র নতুন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবে তখন সেইসব দেশের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং কোনো দেশকে ভিন্নভাবে সেনাবাহিনী রাখার প্রয়োজন পড়বে না। এই ব্যবস্থাকে যখন বিশ্বস্তরে স্বীকার করে নেওয়া হবে তখন কালক্রমে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

২৬. সকলেই নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবিকা বদল করতে পারবে এবং স্থানান্তরিত হবার স্বাধীনতা থাকবে। মাপদন্ড কেবলমাত্র এটিই থাকবে যে তাকে উক্ত পদের যোগ্য হতে হবে। কেউ যখন নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হবে সেখানে তাদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকবে। বাসস্থান থেকে কর্মস্থলের দূরত্ব এমন থাকবে যে মানুষকে নিজেদের কাজে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হবে না। ফলে সড়কে ভিড়ও ন্যূনতম হবে।

২৭. কাজের সময়সীমা ন্যূনতম থাকবে। অর্থাৎ দিনে আনুমানিক ৫ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৫ দিন মাত্র। অধিকাংশ কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়ার গুণগতমান নির্ধারিত থাকবে এবং সমস্ত সিস্টেম অটোমেটিক হবে। প্রযুক্তির সর্বাধিক প্রয়োগের ফলে সকলের কাছে অনেক অবসর সময় থাকবে।

২৮. কাউকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হবে না। কোনোপ্রকার বিল মেটাতে হবে না। কোনো ট্যাক্স জমা করতে হবে না। এমনকি ব্যাংকও থাকবে না। সরকারি সুখসুবিধা পেতে নিজের পরিচয়পত্র অথবা দস্তাবেজ কোথাও জমা করতে হবে না। আইনি প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল থাকবে। ফলে সকলের পক্ষে তা পালন করাও

খুব সহজ হবে। সমস্ত নিয়মনীতি যুক্তিপূর্ণ হবে এবং সহজ হবে। অধিকাংশ প্রক্রিয়া অনলাইন মাধ্যমে সম্পাদনের ফলে সকলের জীবন খুবই সরল এবং ব্যবহারিক হবে।

২৯. জীবনকে আরামদায়ক এবং সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রযুক্তির সর্বাধিক প্রয়োগ হবে। যেমন চাষবাসের জন্য ট্র্যাক্টর, ট্রাক ইত্যাদি এয়ারকন্ডিশনড হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর সুবিধা এবং সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। অত্যন্ত কঠিন কর্মগুলিও প্রযুক্তির দ্বারা অতি সহজে সমাধান করা হবে। কোনো কর্মকেই হীন দৃষ্টিতে দেখা হবে না।

৩০. সমস্ত বস্তু উচ্চ গুণমানসম্পন্ন হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবহৃত বস্তুকে রিসাইক্লিং করা হবে, এতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপপ্রয়োগ হবে না। দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি দুশ্চিন্তা থাকবে না।

৩১. বিদ্যালয়, হাসপাতাল, জিম, সুইমিং পুল, পার্ক, পুস্তকালয়, সংগ্রহালয়, রেস্তোরাঁ, থিয়েটার, বিভিন্ন প্রকার ক্লাব, স্টেডিয়াম ইত্যাদি পরিষেবা উপভোগের জন্য আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন টাউনশিপ তৈরি করা হবে। ফলে সকল বয়সের মানুষ সম্পূর্ণরূপে জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

৩২. মানুষ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্তরে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করার জন্য স্বতন্ত্র থাকবে। একজনের নিয়ম পালন বাস্তবে যেন অন্য কারও অসুবিধে উৎপন্ন না করে। নতুন ব্যবস্থায় নিয়ম পালন না করার জন্যও সকলে স্বতন্ত্র থাকবে। সামাজিক স্তরে পালন করার জন্য ব্যক্তিকে প্রথমে তার তত্ত্ব অথবা জ্ঞানকে নির্দিষ্ট ফোরামে প্রমাণিত করতে হবে।

৩৩. সমাজের জন্য উপযুক্ত কোনো বস্তু, পরিষেবা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অথবা অন্য কোনো বিষয়ের নীতিনিয়ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে উক্ত বিষয়কে নেতৃত্ব পরিষদ, অনুসন্ধান প্ল্যাটফর্ম এবং সার্বজনিক জনাদেশের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করে আসতে হবে। যদি কারোর কাছে কোনো সমস্যা দেখা দেয় তবে তিনি যেন 'মুক্ত মঞ্চ' ব্যবহার করেন। সমস্ত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধানের জন্যই এই মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে।

৩৪. কোনো নীতিনিয়মের বিরোধিতার জন্য মানুষকে অনশন, ধর্না, বিক্ষোভ, আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি করতে হবে না। কোনো বিতর্কিত অথবা আপত্তিকর বিষয় সমাধানের জন্য 'মুক্ত মঞ্চ' সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই মঞ্চে ব্যক্তিকে তার আপত্তি যুক্তি সহযোগে প্রমাণিত করতে হবে। যদি তিনি তার আপত্তিকে 'মুক্ত মঞ্চে' প্রমাণিত না করতে পারেন তবে সেই আপত্তির কোনো

আধার থাকবে না। জনগণের আলোচনার জন্য এই মঞ্চ ২৪ ঘণ্টা উপলব্ধ থাকবে।

৩৫. নিজের যুক্তি প্রমাণিত না করে কোনো ব্যক্তি সরকারকে দোষ দিয়ে নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে না। প্রতিটি ব্যক্তিকে তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। এইজন্য কোনোপ্রকার বিক্ষোভ বা বিরোধ প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে না। আলোচনা, অনুসন্ধান এবং জনাদেশের মাধ্যমে তা প্রমাণিত করে এক স্বচ্ছ প্রক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৩৬. আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীরা প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। উক্ত প্রস্তাব 'মুক্ত মঞ্চে' ভোটদাতাদের কাছে সমীক্ষার জন্য ৩ মাস রাখা থাকবে। ন্যুনতম ১০% প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক যদি আপত্তি না তোলে তবে তা স্বাভাবিকভাবেই আইনে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আর যদি ১০% প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক আপত্তি তোলে তবে তা পুনরায় বিবেচনার জন্য মুক্ত মঞ্চে চলে যাবে।

৩৭. জনগণের মধ্যে আদান প্রদানের জন্য অর্থের ব্যবহার থাকবে না। ফলে আর্থিক প্রতারণা এবং অন্যান্য অপরাধের সম্ভাবনা থাকবে না। এটি এমন একটি সরল প্রক্রিয়া যেখানে সততা বজায় রাখার জন্য পুলিশি ব্যবস্থার ব্যবহার ন্যুনতম হবে। ধীরে ধীরে পুলিশি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩৮. ব্যবস্থা দ্বারা জনগণকে সমস্তকিছু বিনামূল্যে প্রদান করার ফলে কোনো অপরাধ সংঘটিত হবে না। কারণ অপরাধ থেকে অতিরিক্ত কিছুই প্রাপ্তি হওয়ার নেই। ফলে দুর্নীতি, খাদ্য পদার্থে ভেজাল, প্রতারণা, লুটপাট, শোষণ, স্বৈরাচারী, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি সমস্যাগুলি উৎপন্নই হবে না।

৩৯. সমাজে জাতি, লিঙ্গ এবং ভাষা নিয়ে যা কিছু ভেদাভেদ রয়েছে তা আপনিই বিলীন হয়ে যাবে। এমনকি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম, দেশ, সম্প্রদায়, পরিবার এবং গোষ্ঠীর মধ্যে যেসব বিবাদ রয়েছে সেসবও সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা নতুন ব্যবস্থায় সমস্যার মূল কারণ নির্মূল হয়ে যাবে।

৪০. পরিবারের সকল সদস্য সরাসরি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকবে এবং যখনই তাদের কোনোকিছুর প্রয়োজন হবে তারা তা সরাসরি ব্যবস্থার কাছে ডিমান্ড করতে পারবে। কারোর উপর কোনো আর্থিক নির্ভরতা থাকবে না। ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকবে। মিথ্যে বলা অথবা প্রতারণার প্রয়োজন পড়বে না। যখন কেউ অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকবে না তখন পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস অটুট থাকবে। সম্পর্কগুলিও মধুর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। প্রত্যেকেই

সমস্তরকম সম্পর্কের আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে। কোনো সম্পর্কই আর্থিক কারণে সংকটের সম্মুখীন হবে না এবং কেউ মানসিক চাপ অনুভব করবে না।

৪১. সঠিক ব্যবস্থা থাকলে ভবিষ্যতে কখনও কোনোপ্রকার দুশ্চিন্তা এবং সমস্যা উৎপন্নই হবে না। আগামীকালের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা, সংসার চালানোর খরচ, চিকিৎসার খরচ, জীবিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি অনিশ্চয়তা অনুভব করবে না। এরপরও যদি অন্য কোনোপ্রকার সমস্যা উৎপন্ন হয় তবে নির্দিষ্ট বিভাগ দ্বারা সেই সমস্যাকে দ্রুত সমাধান করে নেওয়া হবে। ফলে সকল নাগরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করবে।

৪২. নতুন ব্যবস্থায় সকল নাগরিক নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী নির্ভয়ে আনন্দময় জীবন-যাপন করতে পারবে। শিশু, মহিলা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিরাও নিজেদের সর্বদা সুরক্ষিত এবং স্বাধীন অনুভব করবে। কেউই অন্যের শোষণ, নিয়ন্ত্রণ অথবা আবদ্ধ অনুভব করবে না।

৪৩. এই ব্যবস্থায় নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবনযাপনের ফলে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সকলেই সমৃদ্ধশালী জীবন উপভোগ করবে। ফলে অসুস্থ্যতা অত্যন্ত কমে যাবে এবং মানুষ অধিক দীর্ঘায়ু হবে।

৪৪. নতুন ব্যবস্থায় বিত্তশালী ব্যক্তিরাও দুশ্চিন্তামুক্ত, স্বাধীন, অধিক বিত্তশালী অথবা অধিক সমৃদ্ধশালী অনুভব করবে। জীবনকে ভোগ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় তাদের হাতে থাকবে। তারা পারিবারিক সুখ এবং সম্পর্কজনিত সুখ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারবে। অপহরণ, প্রতারণা, হত্যা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির ভয় থাকবে না।

৪৫. জগতে মূলত চার প্রকারের মানুষ হয়। শারীরিক স্তরের, মানসিক স্তরের, ভাবনাত্মক স্তরের এবং চেতনাত্মক স্তরের। সকল স্তরের মানুষই জ্ঞান, কর্ম, ভোগ এবং বিশ্রামের মাধ্যমে সুখী হয়। সুখী হওয়াই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আমরা আজ অবধি ন্যায়পূর্ণ বা অন্যায়পূর্ণভাবে যে সকল কর্ম করেছি বা করতে দেখেছি তার কেন্দ্রে সুখী হওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। নতুন ব্যবস্থায় সকলের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

সকলের সুখী জীবনের জন্য এমনতর বৃহৎ ব্যবস্থা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে এই পুস্তকের সমস্ত অধ্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অধ্যায় ১

জীবনের মূল উদ্দেশ্য কী?

সর্বপ্রথমে আমাদের জানতে হবে জগৎ সংসারে সমস্ত প্রাণীর সামগ্রিক উদ্দেশ্য কী? অথবা সমগ্র সমষ্টির উদ্দেশ্য কী? যদি আমরা এই উত্তর জেনে যাই তবেই পরবর্তী সমস্ত বিষয় সহজেই বুঝতে পারব এবং অন্যকেও বোঝাতে পারব। কেননা উদ্দেশ্য না জেনে এটি কেউই বলতে পারে না যে এরপর কি করতে হবে এবং কীভাবে করতে হবে। যতক্ষণ আমরা 'কেন করব' তার উত্তর না জানব ততক্ষণ 'কি করব' এবং 'কীভাবে করব' তা জানতে পারব না। তাহলে প্রথমে **'কেন করব'** জানতে হবে, এরপর **'কী করব'** তা জানব এবং সবশেষে **'কীভাবে করব'** তা জানার সময় আসবে। কিছু করার জন্য আমরা যা নির্বাচন করেছি তা সঠিক রয়েছে কিনা তা কীভাবে বিচার করব? অবশ্যই এই দেখে বিচার করব যে এতে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা। যদি পূরণ হয় তাহলে তো ঠিক আছে, নাহলে তাকে অবশ্যই ভুল বলা হবে। অর্থাৎ কোনোকিছু সঠিক না ভুল তা জানার জন্য উদ্দেশ্যকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরা হয়। যদি আপনি নিজে কোনো কর্ম করতে চান তবে সেই কর্মের উদ্দেশ্য কি তা আপনি নিশ্চয়ই আগে থেকে জানবেন। নাহলে 'কি করতে হবে' তা ঠিক করবেন কি করে? আপনি এটি জেনেই করবেন যে এই কর্ম আপনি কেন করতে চাইছেন। কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি আপনি ভুলে গিয়েছেন যে এই কর্ম আপনি 'কেন করছেন'। 'কি করতে হবে' তা যদি আপনি মনে রাখেন তবে সেই কর্মটি আপনি করে ফেলবেন কিন্তু সেই কাজের ফলাফল সঠিক আসছে কিনা তা জানতে পারবেন না। কেননা আপনি তো জানেনই না সেই কর্ম করার কি প্রয়োজন ছিল। পরিণাম সঠিক আসছে কিনা তা তো কেবলমাত্র তখনই বলা সম্ভব যখন জানা যাবে যে সেই কর্ম কেন করছি। উদাহরণস্বরূপ, আপনি জ্বরের ওষুধ নিতে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ্য হওয়া। ডাক্তারবাবু আপনাকে জ্বর সেরে যাবার ঔষধ দিলেন। ঔষধ নিয়ে বাড়ি ফিরে আপনি ভুলে গেলেন যে ওই ঔষধ আপনি কেন নিয়েছেন। শুধুমাত্র মনে রেখেছেন যে সকালে এবং বিকেলে জলের সাথে খেতে হবে কেননা সেসব আপনার নিজের ভাষায় কাগজে লেখা ছিল। কিন্তু অসুখের নাম এমন ভাবে লেখা ছিল যে তা শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুই বুঝতে পারবেন। আপনি সকাল-বিকাল ঔষধ

খেলেন। দিন চারেকের ঔষধ ছিল এবং চারদিন পর শেষ হয়ে গেল। এমনটি অনুভব করে ঔষধের পরিণাম বুঝতে পারলেন যে এখন পূর্বের তুলনায় ভাল আছেন। কিন্তু এই পরিণাম সঠিক আছে না ভুল আছে তা আপনি বুঝতে পারছে না কেননা ঔষধ কেন খাচ্ছিলেন তা আপনি ভুলেই গিয়েছেন। তখন আপনি আবার ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারবাবু আমি ভুলে গিয়েছি যে ঔষধ কেন খাচ্ছিলাম? তখন ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন দেখে বলে দিলেন, আপনি জ্বরের ওষুধ খাচ্ছিলেন। এরপর ডাক্তারবাবু জ্বর মাপলেন এবং দেখলেন যে জ্বর পূর্বের মতই রয়েছে শুধুমাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা যেটুকু ছিল তা কিছুটা উপশম হয়েছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারলেন— যে ঔষধ আপনাকে দেওয়া হয়েছিল তা কাঙ্ক্ষিত ফল দেয়নি। তখন ডাক্তারবাবু ঔষধ বদলে দিলেন এবং কিছুদিন পর আবার চেক-আপে আসতে বললেন। এইভাবে আমরা সমস্ত কর্ম কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই করে থাকি এবং যদি আমরা দেখি যে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না তবে সেই কাজে পরিবর্তনও করে থাকি। এবার আমরা তাহলে বুঝে গিয়েছি যে আমাদের জীবনে উদ্দেশ্য থাকাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে সব মিলিয়ে একথাই উঠে আসে যে উদ্দেশ্য না জেনে কখনই কিছু বোঝা সম্ভব নয়। এই প্রয়োজনের কারণ হচ্ছে আমরা যা করছি তা থেকে যে পরিণাম আসছে তা সঠিক না ভুল। তাই আসুন প্রথমে জীবনের উদ্দেশ্যকে জানার চেষ্টা করি। তবেই আমরা বুঝতে পারব— যা কিছু আমরা করছি এবং যা কিছু আমাদের দিয়ে করানো হচ্ছে তা সঠিক রয়েছে কিনা। যা পরিণাম আসছে তা উদ্দেশ্য অনুযায়ী আসছে নাকি ভিন্ন কিছু আসছে। এই বিষয়কে আমি আমার দ্বিতীয় পুস্তক ‘সম্পূর্ণ জীবন দর্শনে’ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এখানে আমি তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। তার কারণ এই পুস্তক ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য লিখেছি। যদি আপনি নিজেকে ও অন্যান্য সকল প্রাণীদের পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্ত গতিবিধি অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে জগতের সমস্ত প্রাণীরা কেবলমাত্র সর্বদা সুখী হতে চাইছে। কেউ শুধুমাত্র নিজেকে সুখী দেখতে চায়, কেউ নিজের সাথে নিজের পরিবারকে সুখী দেখতে চায়, কেউ নিজের পরিবারের সাথে সাথে নিজের সমাজকে সুখী দেখতে চায়। আর এমন মানুষও আছেন যারা নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের সমাজের এবং সম্পূর্ণ জগতের সকলকে সুখী দেখতে চায়। অর্থাৎ গভীরভাবে দেখলে আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন যে শুধুমাত্র সুখই হচ্ছে এই জীবনের এবং সংসারের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উদ্দেশ্য। এটিই হচ্ছে সঠিক এবং তর্কের দিক দিয়ে দেখলেও তাই মনে হবে। যদি এই জীবন থেকে সুখকে বের করে দেওয়া যায় তবে এখানে জন্ম নেবার অর্থই বা কি রয়ে যায়? অন্য কারোর জন্যই বা ভিন্নভাবে কি অর্থ থাকতে পারে? এই জগৎ সংসার সৃষ্টির কী অর্থ থাকতে পারে? তাহলে আসুন সর্বপ্রথমে এই সুখ নামক তত্ত্বকে জেনে নিই যে এটি মূলত কী এবং এর প্রয়োজনই বা

কী? সুখ ছাড়া কি আমাদের জীবনের অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? যদি আমরা নিজেদের জীবনকে গভীর দৃষ্টিতে দেখি, সকল গতিবিধিকে পর্যবেক্ষণ করি এবং নিজেদের অতীতের কার্যকলাপকে যদি স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাব যে আমরা কোনো না কোনো সুখ উপভোগের জন্যই সমস্তকিছু করছি। আমরা সুখী হবার জন্য সঠিক বা ভুল যে পথই বেছে নেবার প্রয়োজন হোক না কেন তা গ্রহণ করে থাকি। যদি একথা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি তাহলে তিনিও এই উত্তরই দেবেন যে— 'হ্যাঁ আমিও জীবনে যা কিছু করছি তা নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য অথবা সকলের সুখের জন্যই করছি'। কারোর পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করুন তারা সন্তানদের কেন লেখাপড়া শেখাচ্ছে। অভিভাবকরা এই উত্তরই দেবেন যে লেখাপড়া করে সন্তানরা বুদ্ধিমান হবে, অনেক অর্থ উপার্জন করবে এবং সুখে জীবন-যাপন করবে। অধিকাংশ মাতা-পিতার অভিজ্ঞতা এটিই যে বর্তমান ব্যবস্থায় সাধারণত অশিক্ষিত বা কম লেখাপড়া করলে কেউ অধিক সুখে জীবন-যাপন করতে পারবে না। কেননা তারা অধিক অর্থ রোজগার করতে পারবে না এবং বুদ্ধিও কম হবে। অর্থাৎ যতই আপনি গভীরভাবে জানার চেষ্টা করবেন আপনি বুঝতে পারবেন যে 'সুখ' ছাড়া জীবনের আর কোনো অন্তিম উদ্দেশ্য নেই। মানুষ যাই করুক যেমন ভাবেই করুক আপনি খুঁজে পাবেন যে সুখ প্রাপ্তিই হচ্ছে তার মূল ইচ্ছে। একথা সে জানুক বা না জানুক। এই পুস্তকে আমি নতুন ব্যবস্থার একটি ঝলক দেখাতে চাইছি যা বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করেছি। এই ব্যবস্থা একবার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমাদের সকলের জীবনে আর কোনো সমস্যা উৎপন্নই হবে না। যা বর্তমানে অবিরত হয়ে চলেছে। এই পুস্তক অধ্যয়ন করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে জীবনের সমস্ত প্রকার সুখ উপভোগ খুবই সহজ, অর্থাৎ একেবারেই কঠিন কর্ম নয়। শুধুমাত্র আপনার জেনে নেওয়া অবশিষ্ট। এখনও অবধি এই জ্ঞান আমাদের কাছে ছিল না তাই আমরা সুখ থেকে বঞ্চিত থেকেছি। এবার যখন থেকে এই বিষয়টি আপনি জেনে যাবেন ঠিক তখন থেকেই আপনার সুখ উপভোগ করার পথও তৈরি হয়ে যাবে। পরের অধ্যায়ে আমি একটি নতুন অর্থনীতি সম্পর্কে বর্ণনা করব যার মাধ্যমে আপনি অতি সহজেই বুঝে যাবেন যে এই কর্ম অতি সহজেই করে ফেলা সম্ভব। এই পুস্তক অধ্যয়ন করলেই আপনি জানতে পারবেন এই নতুন ব্যবস্থার নীতিপ্রণালী কি হবে, কীভাবে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হবে, কীভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝে নিতে পারবেন।

***

অধ্যায় ২

অর্থশাস্ত্রের মুখ্য নীতি

একটি নতুন অর্থশাস্ত্রের বহু নীতিসমূহের মধ্যে একটি মুখ্য নীতি আমি নিম্নে বর্ণনা করছি, যার মাধ্যমে এই কঠিন বিষয়টি অতি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন। অধিক জানার জন্য আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলি থেকে বিস্তারিতভাবে বুঝে নেব। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় নীতি এমন রয়েছে যে যতখানি মুদ্রা অথবা অর্থ আপনার কাছে রয়েছে আপনি বাজার থেকে ততখানিই চাহিদা বা ডিমান্ড করতে পারবেন। অর্থাৎ চাহিদা আমাদের অর্থের উপর নির্ভর করছে। এতে বাজার থেকে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডিমান্ড করতে পারি না। এর ফলে বাজারেও চাহিদা অনেক কম থাকে। ডিমান্ড যখন কম থাকে তখন বাজার সেই সামান্য ডিমান্ডের ভিত্তিতেই বস্তু নির্মাণ করে। অর্থাৎ বস্তু নির্মাণ কম হয়। বাজারে যখন বস্তু নির্মাণ কম হয় তখন কর্মসংস্থানও কম উৎপন্ন হয়। যখন কর্মসংস্থান কম উৎপন্ন হয় তখন সমাজে বেকারত্ব অধিক উৎপন্ন হয়। কেননা বর্তমান সমাজে উপার্জন তো কর্মসংস্থানের ভিত্তিতেই তৈরি হয়। যার কাছে কোনো কর্ম নেই তার কাছে আয়ও নেই। অর্থাৎ উপার্জনহীন মানুষ সমাজের ভিক্ষার উপরই নির্ভর করে বেঁচে থাকে। কেননা সে তো বাজার থেকে কিছুই ডিমান্ড করতে পারে না। আবার যার উপার্জন কম সেও বাজার থেকে পর্যাপ্ত মাত্রায় ডিমান্ড করতে পারে না। সামান্য কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে, তারাই কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডিমান্ড করতে পারে। এই প্রকার আর্থিক নীতির কারণেই বাজারে সর্বদা চাহিদার অভাব থেকে যায়। কেননা অধিকাংশ মানুষের আয় কম। আয় কম হবার কারণ কর্মসংস্থানের অভাব। এই কারণে দেশ-দুনিয়ার একটি বড় অংশ সর্বদা দরিদ্র অবস্থায় থাকে। বর্তমান সময়ের অর্থশাস্ত্রীয় নীতির এই হচ্ছে মূল কাহিনী। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র এবং অসহায় জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। যতদিন অবধি এই আর্থিক নীতি বদলাবে না ততদিন অবধি সকলের সুখী হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

একথা তো আপনিও জানেন যে মানুষের কাছে যত পরিমাণ অর্থ রয়েছে তার সবটা তারা কেনাকাটাতে খরচ করে না। কিছু ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করে রাখে। কেননা বর্তমান ব্যবস্থায় সে নিজের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত মনে করে না। সরকারও এই ক্ষেত্রে

সামান্যই উন্নতিসাধন করেছে, যার ফলে মানুষ নিজেদেরকে সুরক্ষিত অনুভব করছে না। ধরুন কেউ যদি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় না করে তাহলেও তো মানুষের কাছে যতটা অর্থ থাকবে সে শুধুমাত্র ততটুকুই বাজার থেকে ডিমান্ড করতে পারবে। ততক্ষণ অবধি সে কখনো সর্বাধিক ডিমান্ড করতে পারবে না যতক্ষণ অবধি তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ না আসে। এমনকি অতীতের ইতিহাস অধ্যয়ন করেও এটি বলা যায় যে আজ পর্যন্ত এমনটি হয়নি যে সকল নাগরিকের কাছে কেনাকাটা করার পর্যাপ্ত অর্থশক্তি এসেছে। আমরা নীচের ছবিটি দেখলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারব। এই নীতিটিকে মনোযোগসহ পর্যবেক্ষণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন— যতক্ষণ অবধি আমাদের চাহিদা অর্থের উপর নির্ভর করবে ততক্ষণ অবধি আমরা পর্যাপ্ত ডিমান্ড করতে পারব না। ফলে বস্তু এবং পরিষেবার পর্যাপ্ত নির্মাণ হবে না, এমনকি পর্যাপ্ত আয়ও উৎপন্ন হতে পারবে না।

বর্তমান সময় অবধি নির্ধন তৈরি করার জন্য যে নীতি
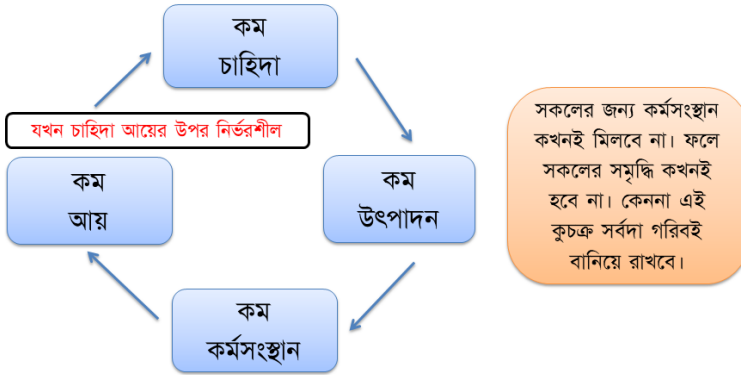
যখন পর্যাপ্ত আয় উৎপন্ন হবে না তখন পর্যাপ্ত ডিমান্ডও উৎপন্ন হবে না। আর এই কুচক্র সর্বদা এমন করেই বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকবে। এই চক্র অধিকাংশ মানুষকে দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত, শোষিত ইত্যাদি অবস্থায় রাখবে, এমনকি বাস্তবে তেমনভাবেই রেখে চলেছে। এই বিষয়টিকে আরেকবার বুঝে নিন। অর্থ আসে কর্মসংস্থান থেকে, কর্মসংস্থান আসে নির্মাণ থেকে, নির্মাণ হয় বস্তু এবং পরিষেবার পর্যাপ্ত ডিমান্ড থেকে, ডিমান্ড আসে পর্যাপ্ত অর্থ থেকে। এবার আপনি বুঝে গিয়েছেন যে সকলের কাছে তো পর্যাপ্ত অর্থ থাকবেই না। তার কারণ সকলের কাছে তো কর্মসংস্থান নেই। সকলের কাছে কর্মসংস্থান এইজন্য নেই কেননা বাজারে পর্যাপ্ত ডিমান্ড নেই। বাজারে যদি ডিমান্ড ন্যুনতম থাকে তাহলে বাজার ন্যুনতম উৎপাদন করবে এবং তা থেকে ন্যুনতম কর্মসংস্থান উৎপন্ন হবে। যার ফলে ন্যুনতম রোজগার উৎপন্ন হবে। এই কুচক্র এভাবেই চলতে থাকবে। যতদিন

অবধি এই নীতি থাকবে, এই কুচক্র এইভাবে অধিকাংশ মানুষকে দরিদ্র বানিয়ে রাখবে। এই নীতির কারণে সকল মানুষ কখনই সমৃদ্ধ হতে পারবে না। এবার আশা করি আপনি বুঝে গিয়েছেন যে, যতদিন এই নীতি থাকবে ততদিন আমরা সকলে দরিদ্র অবস্থাতেই থাকব। যে কজন মানুষ ভোগ্য বস্তু এবং পরিষেবা নির্মাণ করেন কেবলমাত্র তারাই অত্যধিক ধনী হন। এবং তারা সমগ্র জনসংখ্যার কেবলমাত্র ১ শতাংশ। সুতরাং এই নীতি থাকলে অধিকাংশ মানুষের দরিদ্র অবস্থা কেউ দূর করতে পারবে না। তাই এই নতুন নীতিটিকে বুঝুন, যা আমি উপরের নীতি থেকে কিছুটা পরিবর্তন করে রচনা করেছি।

অর্থশাস্ত্রে মুদ্রা নীতির পরিবর্তন

নতুন ব্যবস্থায় আমি মুদ্রা নীতির একটি পরিবর্তন করেছি। ডিমান্ড বা চাহিদার জন্য যে মুদ্রা বা অর্থ অতি আবশ্যক ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ এবার এই নতুন নীতি অনুযায়ী সকলে নিজ নিজ চাহিদা পর্যাপ্ত পরিমাণে করতে পারবে। চাহিদার জন্য এখন আর অর্থের প্রয়োজন থাকবে না। দেখুন এতে আমাদের সমাজে সকল বস্তুর চাহিদা ১০০ শতাংশ হয়ে যাবে। এবার এই ১০০ শতাংশ চাহিদা পূরণ করার জন্য সরকারকে ১০০ শতাংশ বস্তু এবং পরিষেবা উৎপাদন করতে হবে। ১০০ শতাংশ উৎপাদনের কারণে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে যাবে। যার ফলে সরকারকে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থান প্রদান করতে হবে। কেননা ১০০ শতাংশ ডিমান্ড পূরণ করার জন্য ১০০ শতাংশ কারখানা, মেশিন, বিদ্যুৎ, সড়ক, জল, মালবাহক গাড়ি, বহু রকমের বস্তু এবং পরিষেবার প্রয়োজন হবে। আর এতসব কর্ম সম্পাদনের জন্য বহু মানুষেরও প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ সহজভাবে বললে সরকারের কাছে ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থান সর্বদা তৈরি হয়ে থাকবে। তাহলে বিষয়টির অর্থ এই দাঁড়ায় যে সকলের জন্য কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত হবে। অন্যভাবে বললে সকলে সমৃদ্ধ হবে। নীচের চিত্রটি দেখলে ভাল করে বুঝতে পারবেন।

নতুন অর্থশাস্ত্রে সমৃদ্ধশালী তৈরি করার জন্য যে নীতি
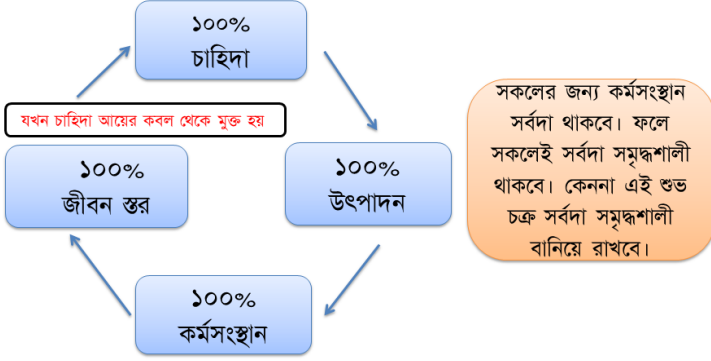
এবার নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন যে নতুন নীতির মাধ্যমে কি পরিবর্তন হতে পারে। আমি শুধুমাত্র আপনার চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতাকে অর্থের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দিয়েছি। অর্থনীতির মধ্যে একটি ছোট পরিবর্তন কতটা আশ্চর্যজনক পরিণাম দিতে পারে তা আমরা উপরের চিত্র থেকে ভাল করে বুঝে নিতে পারি। মানুষ সত্যিকারের স্বাধীনতা তখনই অনুভব করবে যখন সকলে সমানভাবে সমস্ত সুখসুবিধা উপভোগের জন্য স্বতন্ত্র হবে। মানুষ যা শিখতে চাইবে শিখতে পারবে, যা করতে চাইবে করতে পারবে এবং যা ভোগ করতে চাইবে ভোগ করতে পারবে। তখনই সঠিক অর্থে বলা যাবে আমরা স্বাধীন। অর্থাৎ যা করতে চাইছি করতে পারছি। যেভাবে জীবন কাটাতে চাইছি কাটাতে পারছি। যেমন জীবন-যাপনের সুযোগ-সুবিধা চাইছি তেমনটি পেয়ে যাচ্ছি। এরপর নতুন ব্যবস্থায় আমি মুদ্রার অর্থকেও বদলে দিয়েছি। মুদ্রা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করে নেবেন। সরকারের কাছে আপনার একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। সরকার আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ডিমান্ড করবার সীমা নির্ধারণ করতে থাকবে। যার মাধ্যমে সকলে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী যা কিছু বস্তু অথবা পরিষেবা ভোগ করতে চাইবে সেইসব সুবিধা পেতে থাকবে। শুধুমাত্র একটি শর্ত থাকবে। শর্ত এটিই হবে— আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী যে কর্ম আপনাকে প্রদান করা হবে তা সম্পাদন করতে হবে, যদি আপনার বয়স ২৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে থাকে। আপনি যদি এই সহযোগিতা না করেন তবে এই নীতির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। যদি সহযোগিতা করতে থাকেন তবে যে কোনো সময় যে কোনো সুবিধা আপনি সরকারের কাছ থেকে নিতে পারবেন এবং উপভোগ করতে পারবেন। একবার সামঞ্জস্য চলে এলে আর আর্থিক সীমা রাখার প্রয়োজন পড়বে না। কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি তো সরকারের তরফ থেকে থাকবেই। ধরুন—সরকার যদি আপনাকে কর্মসংস্থান দিতে না পারে তাহলেও এই

ব্যবস্থার অন্তর্গত সমস্ত সুখসুবিধা আপনি পেতে থাকবেন। অর্থাৎ কোনোকিছু ডিমান্ড করার এবং গ্রহণ করার অধিকার আপনার থাকবে। কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি প্রদানের পর কোনো কারণে তা প্রদান করতে না পারলেও সরকার আপনাকে সবকিছু ডিমান্ড করবার এবং ব্যবহার করবার পূর্ণ অধিকার দেবে। এই নীতি দ্বারা সকলের প্রয়োজনীয় ডিমান্ড এবং কর্মসংস্থানের সমাধান একসাথে পূরণ হবে। সমাজে যেসব বস্তুর ঘাটতি থাকবে সরকার সেইসব বস্তু ব্যক্তিগত স্তরে নয় বরং সামাজিক স্তরে গ্রহণ অথবা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেবে। এতে যে লাভ হবে তা হচ্ছে এই— যেসব সম্পদের অভাব রয়েছে সেইসব বস্তুও সকলে পর্যাপ্ত পরিমানে ব্যবহার করতে পারবে। এই নীতির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের অপপ্রয়োগও বন্ধ হবে। আসুন দেখি কীভাবে তা সম্ভব হবে। সরকার গঠনের পর সর্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় সরকারি পদে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিযুক্তি হবে। একইসাথে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বড় পরিষদও নিযুক্ত করা হবে যারা দ্রুত ইন্টারনেট এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইট নির্মাণ করবে। যেখানে দেশের সকল নাগরিকের একটি একাউন্ট থাকবে যেখান থেকে সকলে নিজেদের সমস্ত ডিমান্ড করতে পারবে। এবং নিজেদের সমস্ত তথ্য পূরণ করতে পারবে। যেমন— যোগ্যতা, কোন কাজে দক্ষতা রয়েছে, কি ধরণের কাজে আগ্রহ রয়েছে, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পূর্বে ট্রেনিং নিতে পারেনি এমন কোনো কাজের ট্রেনিং বর্তমানে নিতে চায় বা শিখতে চায় ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজেদের পছন্দমত সবকিছু সকলে শিখতে পারবে। সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করবে। যারা ইন্টারনেটের ব্যবহার জানে না তাদের জন্য সরকার আশেপাশে কম্পিউটার অপারেটর নিযুক্ত করবে, যাদের মাধ্যমে মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তুর ডিমান্ড করতে পারবে এবং নিজেদের প্রোফাইল বানাতে পারবে। যেমন— তাদের একমাসে কত পরিমাণ চাল, আটা, ময়দা, চিনি, দুধ, ঘি, কাপড়, তেল, মশলা, সব্জি, ফল, ডাল, শস্যদানা, মিষ্টি, সুগন্ধি ইত্যাদি নিত্যদিনের বস্তুসহ সাপ্তাহিক বস্তু এবং মাসিক বস্তুর প্রয়োজন হয় সেসবের ডিমান্ড বা অর্ডার করতে পারবে। এছাড়াও মোটর সাইকেল, গাড়ি, মোবাইল, কম্পিউটার, টিভি, ওয়াশিং মেশিন, সব ধরনের ফার্নিচার, বসবাস করার ঘর ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর অর্ডারও অনলাইনে করতে পারবে। এরপর অবশিষ্ট সব তথ্য যেমন— এখনো অবধি কোন কোন কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কতটা দক্ষতা রয়েছে, ভবিষ্যতে কে কোন পেশায় কর্ম করতে চায় এবং দক্ষতা অর্জন করতে চায় ইত্যাদি। একথা বলার অর্থ এটিই যে—সফটওয়্যার তৈরি হবার পর কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে চলে আসবে। অর্থাৎ একটি বোতাম টিপলেই সকলের সমস্ত ডিমান্ডসহ সকল তথ্য সরকার দেখতে পারবে। এইভাবে ভবিষ্যতেও সকলের সব তথ্য সর্বদা সরকারের কাছে আসতে থাকবে। সকলের সমস্ত চাহিদা, কত মানব সম্পদ রয়েছে, কর্মসংস্থানের চাহিদা কত রয়েছে, কত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে ইত্যাদি। মোটকথা সরকারের কাছে হিসেব থাকবে

কোন বস্তু কতটা মাত্রায় প্রয়োজন। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মের জন্য কোন বিভাগে কতজন রয়েছে এবং কে কি ধরণের কর্ম করছে, কারা খালি বসে রয়েছে, কোন সম্পদ কতটা মাত্রায় মজুত রয়েছে এবং যেসব সম্পদ স্বল্প মাত্রায় রয়েছে সেসবের বিকল্প কি হতে পারে ইত্যাদি সমস্ত তথ্য সরকারের কাছে থাকবে। মোটকথা সব তথ্য সরকার জানতে পারবে। ওই সফটওয়্যারের মাধ্যমে কে কোন কর্ম সম্পাদনে কুশল অথবা কোন কর্মটি সে করতে চায়, তার জন্য শিক্ষা বা ট্রেনিং কতটা আছে, এইসব তথ্যও জানা যাবে। কোনো না কোনো কারণে শেখা হয়নি এমন কিছু কর্ম যা পূর্বে শিখতে চেয়েছিল এবং পেশা হিসেবে নির্বাচন করতে চেয়েছিল এমনসব বিষয়েও সরকার শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ততদিন অবধি যে কর্ম সে করতে পারে তা চালিয়ে যেতে পারবে। এইভাবে দেশে জনসংখ্যা কত আছে এবং কোন বয়সের নাগরিক কতজন রয়েছে, কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত রয়েছে এমন সব তথ্য সরকারের কাছে থাকবে। অনলাইন সফটওয়্যারের ইউজার ইন্টারফেস দেখতে কেমন হবে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদান করা হয়েছে। এইভাবে সরকার সর্বমোট চাহিদা জানতে পারবে এবং তা পূরণ করার জন্য কতজন মানুষ, কত মেশিন, মালবাহক গাড়ী, কারখানা ইত্যাদি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে যার মাধ্যমে সময়মত যেন সকলের চাহিদা পূরণ করা যায় তার হিসেব সরকার সহজেই করতে পারবে। সরকার সকলের অভাব পূরণ করার জন্য সকলকে তাদের যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী নিযুক্ত করবে যেন সর্বাধিক পাঁচ বছরের মধ্যে সকলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে যাদের বর্তমানে অধিক অভাব রয়েছে। এরপর সকলে অবিরত নিজেদের অর্ডার করতে থাকবে এবং একইরমভাবে সকলের চাহিদাও অবিরত পূরণ হতে থাকবে। কেবলমাত্র পাঁচ বছর অবধি সর্বাধিক চাহিদা থাকবে কেননা বর্তমান সময়ে অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার কাছে কিছুই নেই। তাই শুরুতে চাহিদা এবং কর্ম অধিক পরিমাণে থাকবে। ধীরে ধীরে সকলের চাহিদা স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং ততদিনে আমাদের কাছে উন্নত পরিকাঠামোও নির্মিত হয়ে যাবে। আনুমানিক পাঁচ বছর পর সামঞ্জস্য চলে আসবে। তখন সকলের চাহিদা অতি সহজেই পূরণ হতে থাকবে এবং কর্মও অনেক কমে আসবে। সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থায় নগরীয় জীবনযাপনের ব্যবস্থা থাকবে এবং সকলকেই আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বাড়ি সরকারের তরফ থেকে প্রদান করা হবে। বেশীরভাগ বস্তুর জন্যই কোনো বাজার বা দোকানের প্রয়োজন থাকবে না। কেননা অর্ডার অনুযায়ী সকল বস্তু উল্লেখিত ঠিকানায় ক্যুরিয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। কেবলমাত্র সেইসব বস্তু এবং পরিষেবার জন্যই দোকানের প্রয়োজন হবে যা সরাসরি ঘরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। যেমন হোটেল, রেস্তোরাঁ, জিম, সেলুন, বিউটি পার্লার ইত্যাদি। এতে পথে ভিড়ও কম হবে এবং পার্কিং ব্যবস্থাও অচল হবে না।

আমাদের ইচ্ছেগুলি কি অনন্ত?

১. সমস্ত প্রকার সুবিধাযুক্ত একটি বাড়ির প্রয়োজন হয়।
২. সর্বাধিক ৩০ প্রকারের সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যবর্ধক ভোজন, পাকা ফল, শুকনো ফল, ফলের রস ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।
৩. সর্বাধিক ৩০ প্রকারের পোশাক, জুতো ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।
৪. কিছু প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়, যেমন— মোবাইল, ল্যাপটপ, বাইক, গাড়ি ইত্যাদি।
৫. ইচ্ছে অনুযায়ী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়।
৬. ইচ্ছে অনুযায়ী কর্মসংস্থান প্রয়োজন হয়।
৭. কখনও কখনও পিকনিক, ভ্রমন ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।
৮. সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, পার্ক, স্টেডিয়াম, ক্লাব, পুস্তকালয়, যাতায়াত, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

আমাদের ইচ্ছেগুলি কি অনন্ত?

বিভিন্ন মানুষের সাথে আলোচনা করে আমি বুঝেছি যে, মোটামুটি সকলেই এমনটি মনে করেন যে ‘মানুষের ইচ্ছেগুলি হচ্ছে অনন্ত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে সীমিত’। বহুকাল পূর্ব হতেই এই মতবাদ চলে আসছে। তাহলে আসুন প্রথমে এই দুটি বিষয়ে অনুসন্ধান করি যে মূলত একথা সত্য কিনা অথবা এটি কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উপর নেওয়া সিদ্ধান্ত কিনা। অবশ্যই এই বিষয়ে বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমি এই দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুসন্ধান করে যা পেয়েছি তা হচ্ছে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা হয়েছে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য উঠে এসেছে ঠিক তার বিপরীত মেরু থেকে। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছে অনন্ত নয় এবং অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদও সীমিত নয়। আমি যে সমস্যাগুলি খুঁজে পেয়েছি তা উৎপন্ন হচ্ছে কেবলমাত্র সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে। যদি সঠিক ব্যবস্থা না থাকে তবে অসীম সম্পদও স্বল্প মনে হবে এবং সামান্য ইচ্ছেও অনন্ত বলে অনুভব হবে। আর যদি ব্যবস্থা সঠিক হয় তবে সীমিত সম্পদও পর্যাপ্ত হয়ে যাবে এবং অনন্ত ইচ্ছেও সামান্য মনে হবে। ব্যবস্থা সঠিক হলে আমাদের কাছে যতটুকু প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ রয়েছে সেসবের উপযুক্ত ব্যবহার হতে পারবে। মন্দ ব্যবস্থায় সর্বদা সবকিছুর শুধুমাত্র অভাবই দেখা দেয় এবং সঠিক ব্যবস্থায় সবকিছু পর্যাপ্ত হয়ে যায়। এবার চলুন দেখি এই সিদ্ধান্তে আমি কীভাবে উপনীত হয়েছি তার উপর চিন্তন-মনন করি।

প্রথমে অনন্ত ইচ্ছেগুলি নিয়ে আলোচনা করি। সর্বপ্রথম যখন আমি নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এটি জানার চেষ্টা করেছি যে আমার নিজের ইচ্ছেগুলি কি অনন্ত? যে উত্তর পেয়েছি তাতে সর্বমোট ১০০টির আশেপাশে ইচ্ছে আমি মনে করতে পেরেছি এবং লিখতে পেরেছি। এই ইচ্ছেগুলি আমি বেশ কিছুদিন ধরে স্মরণ করে করে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। মোটামুটি ২৫টি ইচ্ছে আমি খুব তাড়াতাড়িই লিখে ফেলেছিলাম কিন্তু এর অধিক আমি মনে করতে পারছিলাম না। ইচ্ছের সংখ্যা ৪০টির উপরে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছিল। তারপর বেশ কিছু দিনের চেষ্টায় আমি ১০০টির কাছাকাছি ইচ্ছে লিখতে পেরেছিলাম। পরে আমি ভাবলাম— হয়তো আমার ইচ্ছে কমে গিয়েছে। কেননা ততদিনে আমি প্রচুর মাত্রায় ধ্যান, সাধনা ইত্যাদি করেছিলাম। তাই আমি বিভিন্ন প্রকার মানুষদেরকে তাদের ইচ্ছের তালিকা তৈরি করতে বলেছিলাম। পরে এই দেখে আশ্চর্য হয়েছি যে তারা ১০০টির কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি। তাদের মধ্যে অধিকাংশ তো কেবলমাত্র ৪০টি অবধিই পৌঁছাতে পেরেছিল। আরেকটি কথা আপনাদের বলে রাখি যে, তারা সকলে এটিই বিশ্বাস করত যে মানুষের ইচ্ছে হচ্ছে অনন্ত। এরপর কিছুকাল পর যখন আমি তাদের সাথে পুনরায় দেখা করি তখন সকলের বক্তব্য এই ছিল যে— ওই অভিজ্ঞতা তাদের সকলকে অবাক করে দিয়েছে এই ভেবে যে আমাদের ইচ্ছেগুলি তো মূলত অনেক সীমিত। আর এটি সত্যিই এক অদ্ভুত অবস্থা যে আমরা সেইসব সামান্য ইচ্ছেও পূরণ করতে পারিনা। এর কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা সঠিক, এটি পুরোপুরি ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা। বাস্তবে আমরা সকলে নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হই। যে বিষয় নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যতটা গভীর হয় তার দ্বারা আমরা ততটাই অধিক প্রভাবিত হই। আর আমাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই নির্বাচন করে থাকি। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় নিজের মন ও বুদ্ধিকেও সামিল করা উচিত এবং যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পূর্বে অন্যের সাথেও যথেষ্ট চিন্তন-মনন করে নেওয়া উচিত। এই চিন্তন-মনন প্রক্রিয়ার সাথে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং যা কিছু আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি সেইসব বিষয়কে সামিল করা উচিত। অভিজ্ঞতা যেহেতু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই তার ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত ভুলও তো হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা সকলে নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। অর্থাৎ মনে হয় যে আমাদের পৃথিবী হচ্ছে স্থির এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে চলেছে। কিন্তু আপনারা সকলে জানেন যে সত্য হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। তা হচ্ছে সূর্য স্থির এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে। একইভাবে আমরা নিজেদের জীবনেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি যা পরে ভুল হিসেবে পরিগণিত হয়। এই কারণে কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত যে সর্বদা সঠিক হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেইজন্য চিন্তন-মননের সাথে অধিকতর তথ্য,

খবরাখবর, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া উচিত। এতে যেটি হবে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্ত সঠিক হবার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। আর আপনার জীবনও সর্বাধিক সুখী হতে পারবে।

চিন্তন-মনন করার প্রক্রিয়া

বাস্তবে চিন্তন-মননের প্রক্রিয়া কি তা আমাদের বোঝা উচিত। তবেই এর মহত্ত্ব এবং উপযোগিতাকে আমরা নিজেদের সমগ্র জীবনে কাজে লাগাতে পারব। বর্তমানে আমি মানুষকে নিজেদের মধ্যে চিন্তন-মনন করতে দেখে এটিই বুঝেছি যে অধিকাংশ মানুষ জানেই না কীভাবে চিন্তন-মনন করা উচিত এবং কেন করা উচিত। সেইজন্য অধিকাংশ মানুষের মধ্যে চিন্তন-মনন করার সময়ই দ্বন্দ্ব বেধে যায়। এখন তো বেশীরভাগ মানুষ এটিই ভেবে নিয়েছে যে চিন্তন-মনন হচ্ছে একটি ব্যর্থ প্রক্রিয়া, এতে শুধুমাত্রই ঝগড়া-বিবাদ হয়। তারপরও চিন্তন-মননের প্রক্রিয়া ছাড়া আবার কেউ চলতেও পারে না। কেননা এটি ছাড়া কোনো কর্ম হয় না। যদি চিন্তন-মননের সাহায্য না নেওয়া হয় তবে যতটুকু ছোটখাটো সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে থাকি সেটুকুও নিতে পারব না। আবার, এতে জীবনও কিছুটা সহজ হয়। নাহলে তো অধিক নরক যন্ত্রণা ভুগতে হতো। আপনি নিউজ চ্যানেলে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে সেখানে চিন্তন-মনন করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব লেগে থাকে এবং তারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে এমনটি দেখা যায় না। যদিও সেখানে সময় অনেক কম থাকে। আসুন বুঝে নিই ভুলটি মূলত কোথায় হচ্ছে। আমার বিবেচনা অনুযায়ী চিন্তন-মনন করার পূর্বে উদ্দেশ্যকে নিশ্চিত করে নেওয়া উচিত এবং তার নিয়মাবলী সঠিক করে নেওয়া উচিত। চিন্তন-মনন করার সময় সর্বদা একথা মনে রাখা উচিত যে— আমরা নিয়ম ভঙ্গ করছি কিনা অথবা উদ্দেশ্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কিনা। এমন অনেক বিষয় যা আমরা জানিই না। যেমন— এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি। যতক্ষণ আমরা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি তা না জানব অথবা জানলেও ভিন্নভাবে জানব ততক্ষণ অবধি আমরা সঠিক গতিপথে ধাবিত হতে পারব না। যেমন— কেউ কেউ বলে থাকেন জীবনের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ করা। এমনকি মোক্ষলাভেরও আবার বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। কেউ বলেন নির্বাণ, কেউ বলেন পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যাওয়া, কেউ বলেন ভক্তি করা, কেউ বলেন পূজা করা, কেউ বলেন নামাজ বা প্রার্থনা করা, কেউ বলেন এইসব বাজে কথা জীবনের কোনো উদ্দেশ্যই নেই ইত্যাদি। এবার ভাবুন যে সমাজে এত ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে মানুষ কীভাবে একটি নির্দিষ্ট

সীমারেখায় চিন্তন-মনন করতে পারবে? প্রথমে তো জীবনের উদ্দেশ্য কি তা ঠিক করা উচিত। শেষ পর্যন্ত আমরা সকলেই তো মানুষ, তাহলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন-ভিন্ন কি করে হয়? আমাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু সকলের অন্তিম ইচ্ছে আলাদা কি করে হবে? এই বিষয়ে আমি আমার দ্বিতীয় পুস্তক 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শনে' বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। এই পুস্তকে আমি তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। এখানে আমি সকলের জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য যা রেখেছি তা হচ্ছে আমরা যেন আমাদের সম্পূর্ণ জীবন সর্বদা সুখী হয়ে কাটাতে পারি।

এতে যদি কারোর কোনো ভিন্নমত থাকে, যদিও তা থাকবেই, সেইজন্য আমি এই বিষয়ে চিন্তন-মনন করতে চাইব। যারা এই বিষয়ে আমার সাথে চিন্তন-মনন করতে চাইবেন তাদের জন্য সর্বদা আমার তরফ থেকে আমন্ত্রণ রইল। কোনো একটি চিন্তন-মননকে যাচাই করবার জন্য জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মূল মাপকাঠি। উদ্দেশ্য থেকেই দিকদর্শন নির্ধারিত হয়।

চিন্তন মনন করার প্রক্রিয়া
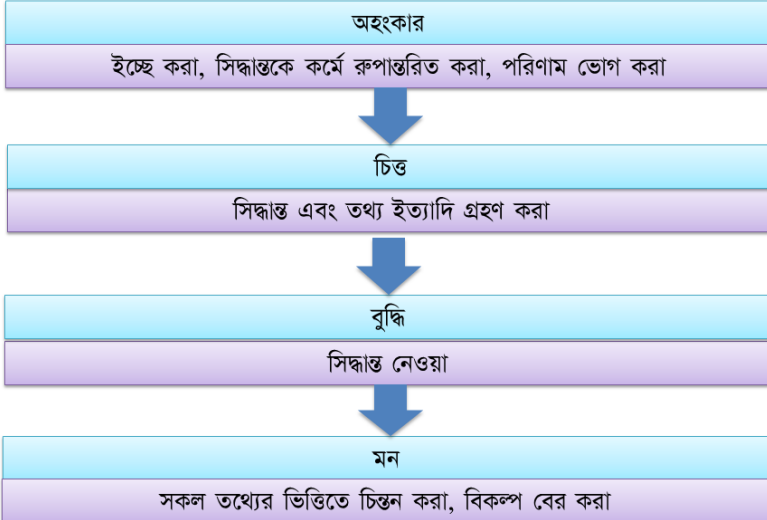
উদ্দেশ্য থেকেই আমরা পরীক্ষা করতে পারি যে আমরা যা করছি তা সঠিক কিনা অথবা আমাদের দিকনির্দেশ সঠিক রয়েছে কিনা। থাকলে কতটা সঠিক রয়েছে এবং কতটা ভুল রয়েছে। এইসব বিষয় আমরা উদ্দেশ্যের মাধ্যমেই নির্ধারণ করে নিতে পারি। এছাড়া অন্য

কোনো মাপকাঠি নেই। এবার যদি উদ্দেশ্য কি তাই না বুঝি তবে তো মাপদন্ডও সঠিক হবে না এবং ফলাফলও সঠিক আসবে না। এইভাবে আপনি নিজেও আপনার ইচ্ছেগুলিকে লিপিবদ্ধ করে দেখে নিতে পারেন এবং জেনে নিতে পারেন যে আমাদের ইচ্ছেগুলি অনন্ত নয় বরং সীমিত। সময়ানুসারে সেগুলি একটি বলয়ের মধ্যে ঘুরতে থাকে। এটি বোঝার জন্য কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া আমি জানালাম। আরও অনেক পদ্ধতি আপনি নানাভাবে জেনে নিতে পারেন। যদিও এই সমস্ত প্রক্রিয়া আমি আমার দ্বিতীয় পুস্তক 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শনে' বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

প্রাকৃতিক সম্পদ কি সীমিত?

এই পৃথিবীর মানুষ ১০০ বছর পূর্বেও বলত যে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। যেখানে সেই সময়েও বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ১৫০ কোটি। সেইসময় জীবন-যাপনের স্তরও অনেক নিম্নমানের ছিল। সেইসময় কোনো কারিগরি প্রযুক্তি তো ছিল না যেখানে মানুষ অধিক পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। এখন যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে এবং মানুষের জীবনযাপনের মান সেই সময়ের তুলনায় বহুগুণ অধিক সমৃদ্ধশালী হয়েছে সেখানে মানুষ কিন্তু এখনও বলতে থাকে যে সমস্ত সম্পদ সীমিত। জনসংখ্যা যেখানে পূর্বের তুলনায় ৫ গুণ বেড়েছে। মাঝে 'সবুজ বিপ্লব' ও 'শ্বেত বিপ্লব' হয়েছে, যার ফলে পূর্বে জনসংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও যে পরিমাণ অভাব ছিল এখন জনসংখ্যা অধিক হবার পরও ততটা অভাব দেখা যায় না। প্রতি বছর যেখানে বিভিন্ন দেশ নিজেদের চাল, গম ইত্যাদি ফসল সমুদ্রে ফেলে দেয় এই ভেবে যে বাজারে যেন সেই ফসলের মূল্য কমে না যায় এবং কৃষকদের যেন লোকসান না হয়। এখন তো অনেক নতুন নতুন বস্তু উৎপাদন হচ্ছে। এবং অনেক বস্তুই অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে যা পূর্বে হতোই না। এমন অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যা এখনও অবধি ব্যবহারই হয়নি। বর্তমানে বিজ্ঞান যেখানে উন্নত হয়েছে সেখানে অনেক সম্পদ তো সরাসরি তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে এমনও হতে পারে যে কোনো বৃক্ষের জিনের ভেতর কিছু পরিবর্তন করে এমন কোনো বৃক্ষ তৈরি করা যাবে যার কাঠ হবে লোহার মত শক্ত এবং তা দিয়ে এমন সব কর্ম করা যাবে যা লোহা দিয়ে করা যায়। এ তো গেল সর্বোত্তম বিজ্ঞান বিকাশের কথা। আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে যে বর্তমানে প্রতিটি বস্তু অনবরত অন্য কোনো বস্তুতে বদলে যাচ্ছে। আপনি তো জানেন এই জগতে প্রতিটি বস্তু একটি চক্রে আবর্তিত হয়ে রয়েছে এবং এর বাইরে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। জলকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। এই উদাহরণটি সকলে অতি সহজেই বুঝতে পারবে। কেননা এই বিষয়ে সকলেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে। চলুন জলচক্রকে বোঝার চেষ্টা করি। আমরা জানি যে জল তরল, গ্যাস এবং কঠিনরূপে পাওয়া যায়। অর্থাৎ জল অবিরত

তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, বাষ্প থেকে বরফে পরিণত হচ্ছে এবং বরফ থেকে আবার তরলে পরিণত হয়ে চলেছে। সরাসরি দেখলে জল পাহাড় থেকে নদী হয়ে সমুদ্রে পতিত হচ্ছে এবং অবিরত বয়ে চলেছে। সমুদ্রে অধিক তাপমাত্রার কারণে জল অবিরত বাষ্পে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং কম তাপমাত্রার কারণে বাষ্প অবিরত বরফে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবার দেখুন জল আপনি ব্যবহার করুন বা না করুন তা অবিরত সমুদ্রের দিকে বইতেই থাকবে। আপনি যদি সমুদ্রে না গিয়ে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চান তাহলেও তা মাঝ পথে বাষ্প হয়েই যাবে। কেননা আপনি তাকে মাঝপথেই ব্যবহার করে নিচ্ছেন এবং বাষ্পে পরিণত হবার যে প্রক্রিয়া সমুদ্রে গিয়ে হতো তা মাঝপথেই সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পার্থক্য শুধুমাত্র এটিই হবে যে এখানে পরীক্ষা করার সময় বাষ্পে পরিণত হবে আর সমুদ্রে পরীক্ষা না করেই বাষ্প হয়ে যাবে। দুটি অবস্থাতেই জলের বাষ্পে রূপান্তরিত হওয়া নিশ্চিত হয়ে রয়েছে যা আপনি বন্ধ করতে পারবেন না। আপনার পরীক্ষা করা বা না করায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে না। সামান্য পার্থক্য যেটুকু হবে তাও স্থান পরিবর্তন করার কারণে। যদি আপনি মাঝ পথে ব্যবহার করে ফেলেন তাহলে জল সেখানেই বাষ্প হয়ে যাবে। যদি ব্যবহার না করেন তাহলে সমুদ্রে গিয়ে বাষ্প হয়ে যাবে। তাহলে বোঝা গেল যে শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তনের পার্থক্য আসবে। যদি আপনি মাঝপথে ব্যবহার করে ফেলেন তাহলে সমুদ্রে কিছুটা জল কমে যাবে কেননা আপনি তাকে মাঝপথেই বাষ্পে রূপান্তরিত করে দিচ্ছেন। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটি হবে, আপনার পরীক্ষার জন্য সমুদ্রের জলস্তরে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। একইভাবে আপনি অন্যান্য খনিজ পদার্থ অথবা ধাতুর ক্ষেত্রেও বুঝে নিতে পারেন। যদি আপনি তা ব্যবহার অথবা পরীক্ষা না করেন তাহলেও তা পরবর্তী বস্তুতে রূপান্তরিত হবেই যা স্বাভাবিকভাবে হয়েই চলেছে। যদি আপনি ব্যবহার করে ফেলেন তাহলেও তা পরবর্তী বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েই যাবে। তাহলে আপনি ব্যবহার করুন বা না করুন সকল বস্তু নিজ নিজ বলয়ে অবিরত পরিবর্তিত হয়েই চলেছে। আবার যারা ঈশ্বরকে মানেন এবং বিশ্বাস করেন তারা এইভাবে বুঝে নিতে পারেন যে এই বিরাট জগতে ঈশ্বর কি কোনো বস্তু স্বল্প পরিমানে তৈরি করতে পারে? অথবা কোনোকিছুর অভাব রাখতে পারে? এখন আমাদের কাছে যে বিজ্ঞান রয়েছে তা কি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারে সে জগতের সমস্ত সম্পদ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে জেনে নিয়েছে, কোন সম্পদ কতটা পরিমানে রয়েছে এবং কোথায় কোথায় রয়েছে? এটি তো আপনি আমি দুজনেই জানি যে বিজ্ঞানের এই জবাব 'না' হবে। সে এটিই বলবে এখন সমস্ত তথ্য তার কাছে নেই। কেননা বিজ্ঞান সর্বদা বর্তমান সময়ের নিরিখেই বলবে, ভাই আজ অবধি আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে এমনটিই হয়ে থাকে এবং সেই হিসেবেই সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। সুতরাং বিজ্ঞান তার মতে ঠিকই বলছে। বিজ্ঞানকে এভাবেই কর্ম করা উচিত। আমাদের ব্যবস্থাতেও বিজ্ঞান যদি বলে যে এই প্রকার সম্পদ স্বল্প পরিমাণে রয়েছে তবে ব্যবস্থাও সেই সিদ্ধান্তকে গম্ভীরভাবে নেবে এবং ততটুকু সম্পদকে কীভাবে সকলের জন্য ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে বিবেচনা করবে এবং কর্ম সম্পাদন করবে। অথবা অন্য কোনো বিকল্প থাকলে তাকে কাজে লাগাবে। এবার অন্য একটি উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি সম্পদ সীমিত অবস্থায়

রয়েছে। এবং এও মেনে নিচ্ছি যে সম্পদ শুধুমাত্র আগামী ১,০০০ বছর অবধিই চলবে। তবে তো ভাই আমাদেরকে ১,০০০ বছর অবধি ভালভাবে কাটানো উচিত। যখন সম্পদ সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন তো আমরাও সকলে সমাপ্ত হয়ে যাব। এতে আর সমস্যা কীসের? দুঃখের সাথে ১০,০০০ বছর বাঁচার চাইতে ১,০০০ বছর সুখের সাথে কাটানো ভাল। কিছু মানুষ আবার বলতে থাকে ১,০০০ বছর পর কোনোপ্রকার সম্পদ ছাড়া সকলে কীভাবে বাঁচবে? এবার আপনি ভাবুন এখন তো সম্পদ রয়েছে, তবুও অধিকাংশ জনগণ সম্পদ ব্যবহার না করে দুঃখের সাথে এই চিন্তায় জীবন কাটাচ্ছে যে আজ থেকে ১,০০০ বছর পর তাদের প্রজন্ম কীভাবে বাঁচবে? অবাক বিষয় নয় কি? যারা এখন বেঁচে রয়েছে তাদের নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে তাদের নিয়ে যারা আজ থেকে ১,০০০ বছর পরে জন্ম নেবে! আরে ভাই যারা বর্তমানে বেঁচে রয়েছে তাদের নিয়ে ভাবা উচিত নাকি যারা এখন নেই তাদের নিয়ে? যদি আমরা ১,০০০ বছর অবধি সুখের সাথে কাটাতে পারি তবে কেন তেমন ব্যবস্থা নির্মাণ করব না? ১,০০০ বছর পর কি হবে তা কেউ জানে? তবে আজকের বিজ্ঞান কিন্তু বলছে— আগামী কয়েক হাজার বছর অবধি আমাদের কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ মজুদ রয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজন হলে জনসংখ্যাও তো কমিয়ে নেওয়া যায় তাই না? সঠিক ব্যবস্থা থাকলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই সহজ হয়ে যাবে। তারপর ততটাই জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখা যেতে পারে যেন কারোর জন্য কোনো সম্পদেরই অভাব না হয়।

উৎসঃ United Nations Population division, World Population Prospect: The 2010 Revision, Medium Variant (2011)
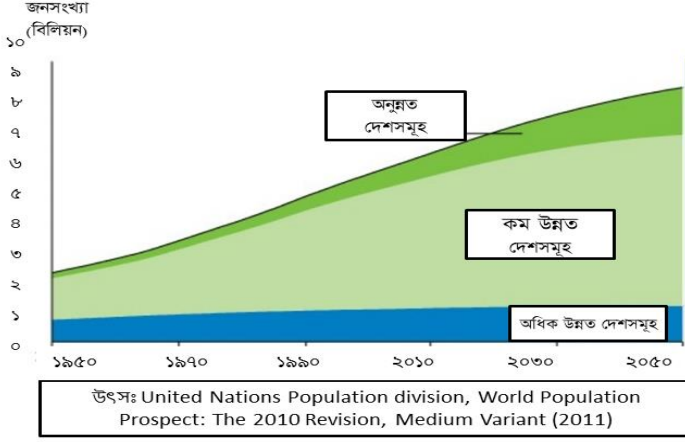
যদিও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জানা যায় দুঃখী মানুষই অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি দেখেই থাকবেন যে ধনীরা অধিক সন্তান নেন না। এবার যদি সকলের জীবনস্তর উন্নত করে দেওয়া যায় তবে জনসংখ্যা আপনিই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আবার, অন্য উপায়েও জনসংখ্যা শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এতে আবার কীসের বিরোধীতা? উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা তো অত দ্রুত বাড়ছে না যতটা দরিদ্র দেশগুলিতে বেড়ে চলেছে। যদি আপনি ইন্টারনেট থেকে ১৯৫০ থেকে ২০১০ সাল অবধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখতে চান তাহলে আপনি পাবেন যে আমেরিকায় বৃদ্ধির হার দিগুণের কম হয়েছে, কিন্তু ভারত এবং চীনে এই হার আড়াই গুণ বেড়েছে। এমনকি দ্রুত বেড়েই চলেছে। যেখানে ভারত এবং চীনের তুলনায় আমেরিকায় সম্পদ অধিক পরিমাণে রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব এবং ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তাজনিত অনভিজ্ঞতা। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কারও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে রয়েছে এবং তা মেনে চলাকে আপনি অশিক্ষার অন্তর্গত বলতে পারেন। এই বিষয়ে উপরের গ্রাফটি দেখে নিতে পারেন।

উপরের গ্রাফটিতে আমরা দেখছি যে উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা অনেক কমেছে যেখানে অন্যান্য দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকগুণ বেড়েছে। অবশ্য এর পেছনে অন্য পরিস্থিতিও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন— যাদের অধিক সন্তান নেই তারা নিজেদের দুর্বল এবং অসহায় মনে করে এই ভেবে যে প্রবীণ বয়সে তাদের মুখাগ্নি কে করবে, বংশরক্ষা কে করবে, বৃদ্ধাবস্থায় কে দেখাশোনা করবে ইত্যাদি। সেই কারণে অনেক সময় না চাইলেও ছেলের আশা করতে করতে পরপর কন্যাসন্তানের জন্ম হতে থাকে। এইসব ছাড়াও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কম বেশি সহায়তা করে। এইসব কারণগুলিকে আপনি ভবিষ্যতের প্রতি নিরাপত্তাহীনতার কারণ হিসেবেই ধরে নিতে পারেন। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা এবং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের ভাবনা তৈরি হয়ে

গেলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি আরও দ্রুত কমাতে হয় তবে প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়ন করে তা হ্রাস করা সম্ভব। একথা মেনে নিচ্ছি যেমন ব্যবস্থার কথা আমি বলছি তাতে প্রাকৃতিক সম্পদ অধিক ব্যয় হবে। যদিও নতুন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কোথায় কতটা সম্পদ ব্যবহার হবে ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ থাকবে। চলুন ধরে নিচ্ছি কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে না। তাহলে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই বর্তমান সময়েই বা নিয়ন্ত্রণ কোথায়? বর্তমান সময়ে কি নিয়ন্ত্রণ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে না? এমনকি পাশাপাশি ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে না। নতুন ব্যবস্থায় যেটি হবে তা হল যেসব সম্পদ কম পরিমানে রয়েছে এমনসব বস্তু সকলে সামাজিক স্তরে ব্যবহার করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে মোটর সাইকেল এবং মোটরগাড়িকে নিচ্ছি। মেনে নিচ্ছি জনসংখ্যা অনুপাতে সকলের জন্য সাইকেল, গাড়ি ইত্যাদি মোটরযান তৈরি করতে যত পরিমাণ লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম প্রয়োজন হবে তা আমাদের কাছে নেই। এই ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থায় যে নিয়ম থাকবে তা হল সরকার এই দুটি বস্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় না দিয়ে সামাজিকভাবে প্রদান করবে। এখানে সামাজিকভাবে ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে— ধরুন কোনো এক অঞ্চলে বা গ্রামে ৫০ হাজার মানুষ বসবাস করে যারা এই দুটি বাহন ব্যবহার করবে, সেক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থায় কিছু সার্বজনিক স্থান তৈরি করা হবে যেখানে সব মিলিয়ে ১০ হাজার মোটর সাইকেল এবং ১০ হাজার গাড়ি রাখা থাকবে। এই বিভাগকে কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে যুক্ত করে দেওয়া হবে। যার যখন প্রয়োজন হবে তৎক্ষণাৎ অনলাইনে বুকিং করে নিয়ে যাবে এবং কর্মশেষে আবার সেখানে জমা করে দেবে। এইভাবে সকলে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাণে কম রয়েছে এমন বস্তুগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনভাবে আরও অনেক বস্তুর ক্ষেত্রে এই নিয়ম কাজে লাগানো যেতে পারে। আবার এমনটিও জরুরী নয় যে সমস্ত গাড়ি লোহা দিয়েই তৈরি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে যেখানে সম্ভব হবে সেখানে কাঠের ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনকি বাড়ির দরজা, জানালা ইত্যাদি স্থানে লোহার পরিবর্তে কাঠের অধিক প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্রও লোহার পরিবর্তে কাঠের তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে মূল ভাবনাটা হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থা নিয়ে। সম্পদ কত পরিমাণে রয়েছে তা নিয়ে কান্নাকাটি করা নয়। যে কোনো সমস্যা সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্ভুল করা যেতে পারে। সেইজন্য পুরো খেলাটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এবার অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদেও কি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? যে কর্ম কাঠ দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব সেখানে লোহা এবং অন্যান্য ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে? বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও যেখানে অন্য সম্পদ ব্যবহার করে কর্ম হতে পারে সেখানে কয়লা এবং পেট্রোল-ডিজেল ব্যবহার করা হচ্ছে। যা পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে যে কোনো সময় আগুন লেগে যাচ্ছে তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনি নিজে দেখুন সঠিক ব্যবস্থা না থাকলে আপনি এইসব সমস্যার কোনো উপায় বের করতে পারবেন না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বদা সরকার এবং ব্যক্তির মধ্যে একপ্রকার সংঘাত থেকেই যায়। এই সমস্যাকে সমাপ্ত করাও

যায় না। এমনকি পুঁজিবাদের ক্ষেত্রেই নয় বরং যে কোনো ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখবেন যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একাধিক কেন্দ্র রয়েছে সেখানে সংঘাত থাকাটা স্বাভাবিক। এই সমস্যাকে মেটানোও সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে ধরে নিন কোনো সংস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যদি একাধিক স্বাধীন কেন্দ্র তৈরি করে দেওয়া যায় তবে কি সেই সংস্থা সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারবে? সকলের উত্তর এটিই হবে যে, করতে পারবে না। কেননা একটি কেন্দ্র যা সিদ্ধান্ত নেবে অপর কেন্দ্র ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে। দ্বিতীয়ত, যাদের নিচু স্তরে কর্ম করতে হয় তারা বুঝতেই পারবে না কাদের সিদ্ধান্তকে কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যবহার করবে? এর থেকে আমরা বুঝতেই পারছি যে ব্যবস্থা একেন্দ্রীকরণ হওয়াই উচিত। আরেকটি বিষয় হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানুষেরই আজীবন অধিকার থাকবে? তারা সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা নেই এবং তাদের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ কমেও যায় না। কিন্তু যখনই সকলের জন্য প্রয়োগের কথা আসে তখনই মানুষ চেঁচামেচি করতে থাকে এই বলে যে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত; সম্পদ কম কম ব্যবহার কর, বিন্দু-বিন্দু জল বাঁচাও ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবে দেখা যায় ধনীরা কখনো জল বাঁচায় না। এই উপদেশ কেবলমাত্র গরীবের জন্যই বরাদ্দ। আর, অবিরত চেঁচামেচি করছে যেসব বৈজ্ঞানিক, সরকারি উচ্চপদে কর্মরত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী এবং কিছু সামাজিক সংগঠন তারা কিন্তু নিজেরা সমস্ত সুখসুবিধা ভোগ করছে। যখনই সকলকে দেবার প্রশ্ন উঠছে তখনই তারা চেঁচামেচি করতে থাকে এই বলে যে সম্পদ কম রয়েছে। প্রিয় বন্ধুরা, হয় এইসব সকলের জন্য করা হোক নাহলে কারোর জন্যই নয়। কমপক্ষে তারা ন্যায় বিচারের মত তো কথা বলুক! বাস্তবে সমস্ত দেশ সর্বাধিক সম্পদ ব্যবহার করেই চলেছে। কে কার কথায় থেমে রয়েছে? যত বিকশিত দেশ রয়েছে কেউ কি তাদের থামিয়ে রেখেছে? তারা তো অন্য দেশের সম্পদও ভোগ-দখল করে নিচ্ছে। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদই নয় মানব সম্পদও ভোগ করে চলেছে। এটি কি তারা সঠিক কর্ম করছে? যারা পরিবেশ দূষণের মিটিং করছে তারা কি সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করছে না? নিঃসন্দেহে করছে। তাহলে এটি কি শুধুমাত্র দরিদ্রদের দায়িত্ব সম্পদ যেন সমাপ্ত না হয়? ধনীদের কি কোনো দায়িত্ব নেই? আর যুদ্ধ সামগ্রীর ক্ষেত্রে কি প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হয় না? যা সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। যুদ্ধ সামগ্রীর ক্ষেত্রে তো প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদের ১০০ শতাংশ অপপ্রয়োগই হচ্ছে। যা থেকে কোনো সুখসুবিধা প্রাপ্তি হয় না। তাহলে সঠিক ব্যবস্থা এনে কমপক্ষে যুদ্ধ সামগ্রী তৈরি করা তো বন্ধ করা যেতে পারে, তাই নয় কি? এর বদলে সেইসব সম্পদকে মানুষের সুখসুবিধার প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাই ব্যবস্থাই হচ্ছে মুখ্য সমস্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের সীমিত হওয়াটা নয়। ১৯৬০ সালের পূর্বে যখন 'সবুজ বিপ্লব' এবং 'শ্বেত বিপ্লব' ঘটেনি, যখন নালা তৈরি হয়নি, যখন ভারতে বিদ্যুতের সুবিধাও ছিল নামমাত্র; সেইসময় এমনটি মনে হয়েছিল, যে হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে সেই হিসেবে মানুষের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো আশা নেই। তখন এমনটি ভাবা হয়েছিল যে ভারতের অবস্থা খুবই করুণ হতে চলেছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা তখন সঠিক অনুমানই করেছিল। যদি 'সবুজ বিপ্লব' এবং 'শ্বেত বিপ্লব' না হতো তবে ভারতকে খুবই সমস্যার

মধ্যে পড়তে হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বর্তমান বিশ্বে ভারতের অর্থনীতি উন্নয়নশীল। সুতরাং সমস্যা হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থা না থাকার জন্য, সীমিত সম্পদের জন্য নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত থাকার সমস্যা থাকলেও তা খুবই স্বল্প। এছাড়াও অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে খুবই বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হয়েছে। আপনি দেখে থাকবেন যে একজন অপরজনের কারণে নিরাপত্তাহীন মনে করে, একটি পরিবার অপর একটি পরিবারের কাছে নিরাপত্তাহীন মনে করে, এক সমাজ অন্য সমাজের কাছে নিরাপত্তাহীন মনে করে। এক রাজ্য অন্য রাজ্যের কাছে নিরাপত্তাহীন মনে করে। এইভাবে এক দেশ অন্য দেশের কাছে নিরাপত্তাহীন মনে করে। এই নিরাপত্তাহীনতার কারণেই সমস্ত দেশ কত যুদ্ধ-সামগ্রী তৈরি করে বসে রয়েছে। ভারত প্রত্যেক বছর মোট সম্পদের একটি বিরাট অংশ কেবলমাত্র সেনাবাহিনী এবং পুলিশের জন্য ব্যয় করে থাকে। যা কিনা শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে করতে হয়। এটি কি ভাল নয় যে সম্পূর্ণ বিশ্বে এমন এক ব্যবস্থা আসুক যার ফলে নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা উদয়ই হবে না? এবং যে সম্পদ নিরাপত্তার জন্য ব্যয় হচ্ছে তা মানুষের জীবন-যাপনের স্তরকে উন্নত করার কাজে ব্যবহার হোক? এর জন্য অবশ্যই একটি কর্ম করতে হবে। সর্বপ্রথমে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে যেন একটি বিশ্ব সরকার গঠনের সম্ভাবনা তৈরি হয়। যদিও এই কর্মটি আমি সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। এবার শুধুমাত্র একটিই কর্ম অবশিষ্ট রয়েছে তা হল এই বিষয়টিকে সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সকলে যেন একসাথে বসে নিজেদের মধ্যে চিন্তন-মনন করতে পারে এই ভেবে যে, এমনি করে সকলে একে অপরের সাথে লড়াই করে থাকতে চায় নাকি একে অপরের সাথে সুখ উপভোগ করে কাটাতে চায়। যদি সুখী হয়ে থাকতে চায় তবে এই ব্যবস্থাকে আপন করে নিক। নাহলে দ্রুত যুদ্ধ ঘোষণা করুক এবং একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলুক। এরপর না কেউ বেঁচে থাকবে, না কোনো সমস্যা থাকবে। সকলের যা পছন্দ হয় সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিক।

সন্ত্রাসবাদের ফলেও একটি গভীর সমস্যা তৈরি হয়ে রয়েছে। এর মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করলে আপনি যা পাবেন তা হচ্ছে ‘সুখসুবিধার অসম বণ্টন’ যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পর্যাপ্ত সুখসুবিধা না থাকার কারণে সকলে অধিকতর ক্ষেত্রে সুবিধাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে চায়। এটিও এক বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। একদিকে এমনিতেই জনসংখ্যা অনুপাতে সুখসুবিধা পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই অপরদিকে ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখার কারণে অধিক স্বল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ মানুষ বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ মিলিয়ে সর্বদাই দুঃখী জীবন অতিবাহিত করে এবং সুখসুবিধার টানাটানি, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধের পথে চলতে শুরু করে। ফলে অন্যান্য বহু সমস্যা উৎপন্ন হতে শুরু করে। যাদের দেখে আমরা সাধারণত বলে থাকি, এরা তো অসাধু হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এমন অবস্থা দেখতে দেখতে এমনই মনে হয় যে কিছু মানুষ ভাল হয় এবং কিছু মানুষ মন্দ হয়। এরপর মানুষকে শোধরানোর আয়োজন শুরু হয় একথা না জেনেই যে সর্বপ্রথমে কারণের নিবারণ করা উচিত, ফলাফলের তো আর নিবারণ করা সম্ভব নয়। মানুষ ফলাফলের কারণে মন্দ হয় না। এই বিষয়ে একবার গভীরভাবে চিন্তন-মনন করার প্রয়োজন রয়েছে। একে অপরের প্রতি

অভিযোগ করে কোনো সমাধানে আসা সম্ভব নয় বরং এতে শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিস্থিতিই তৈরি হবে। এরপর আপনি যেভাবে ইচ্ছে দেখতে পারেন অথবা ভাবতে পারেন। আমি বলব ব্যবস্থা সঠিক না করা ছাড়া অন্য কোনো সমাধান নেই। সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক ব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এই জগতে কেবলমাত্র একটিই সমস্যা রয়েছে তা হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থা না থাকা।

আর্থিক সমতা

এই বিষয়টিকে যে কারণে ভাল করে বুঝে নেবার প্রয়োজন রয়েছে তা হল যতদিন সমাজে সকলের মধ্যে 'আর্থিক সামঞ্জস্য' না আসবে ততদিন অবধি অন্যান্য সমতাগুলির কোনো গুরুত্ব থাকবে না। এবং সেসব বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাও পাবে না। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি ভারতে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং এমনটি সংবিধানেই উল্লেখিত রয়েছে। এমনকি সকল নেতা-নেত্রীদেরকেও প্রতিদিন বলতে শোনা যায় যে আমাদের দেশে নিজেদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে স্বাধীনতা তো

সকলের জন্য জীবনস্তর কিভাবে
সমান থাকবে তা বুঝে নিন

- এই ব্যবস্থায় সকল প্রকার কর্মের গুরুত্ব একসমান থাকবে। সমস্ত কর্ম থেকেই মূলত আমরা সুখ পেয়ে থাকি।
- যদি কিছু মানুষের জীবনস্তর উচ্চমানের করে দেওয়া যায় তবে যাদের জীবনস্তর নিম্ন থাকবে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।
- এমনকি আর্থিক ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন প্রকার বর্গ সৃষ্টি হতে থাকবে। এরপর সেই সব সমস্যা উৎপন্ন হতে থাকবে যা বর্তমানে ঘটে চলেছে। যেমন— অহিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লুট, মিথ্যা, যুদ্ধ ইত্যাদি।
- মানুষ নিজের মত করে যেন তেন প্রকারে জীবন স্তর বরাবর করার রেষারেষিতে লেগে পড়বে। সরকার যতই ক্ষমতা প্রয়োগ করুক না কেন এসব বন্ধ করতে পারবে না। এরপর দুর্নীতি, চুরি, তোলাবাজি, পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অপরাধ উৎপন্ন হতে থাকবে।
- সমাজে যদি আপনার অসমান জীবনস্তর থাকে তবে এই প্রকার সমস্যাগুলি উৎপন্ন হতে থাকে কেননা অধিকাংশ সমস্যা উৎপত্তির বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে এই অসমান অবস্থা।

রয়েছে; কিন্তু বাস্তবিক দিক দিয়ে দেখতে চাইলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, সত্যিই কি আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে? তবেই আপনি জানতে পারবেন যে তা নেই। এখানে যাদের কাছে অধিক সম্পদ রয়েছে তাদেরকেই অধিক স্বাধীন হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। আর যাদের কাছে কিছুই নেই তারা না কিছু বলতে পারে না কিছু করতে পারে। তারা যদি কিছু বলার প্রচেষ্টাও করে তবে সরকারই সর্বপ্রথমে তাদের জেলের ভেতর

আবদ্ধ করে রাখে। এমনকি বন্দীদশার পূর্বেই যা ঘটবে তা হচ্ছে যাদের কাছে সম্পদ রয়েছে তারা ওদের মুখ খুলতেই দেবে না। পুলিশ প্রশাসনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থবানদের কথাই শুনবে। এইসব আমরা স্বাভাবিক বিষয় বলেই জানি। এক্ষেত্রে আপনি আর্থিক সমতা ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। এবং ততদিন অবধি এই অবস্থা এমনিই থাকবে। আপনি যতই কড়া আইন প্রণয়ন করুণ না কেন। দেখুন আইন প্রণয়নকারীরা তো মানুষই হবেন তাই না? যেহেতু অর্থের মাধ্যমেই সকল সুখসুবিধা উপভোগ করা যায় সেখানে পুলিশ কেন অর্থবানদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে নিজেরা বিত্তশালী হতে চাইবে না? কেন তারা সকল সুখসুবিধা উপভোগ করতে চাইবে না? আপনিই বলুন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি নির্ধন হয়ে জীবন কাটাতে চাইবে? তাদের আপনি যতই বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন তোমার দরিদ্রতার কারণ হচ্ছে তোমার পূর্বজন্মের ফল, সরকার এইজন্য দায়ী নয় ইত্যাদি। বাস্তবে আপনি এই বিষয়টি দেখে নিতে পারেন যে আর্থিক সমতা ছাড়া অন্যান্য সমতাগুলির কোনো গুরুত্ব থাকে না। আর্থিক সমতার ভিত্তিতেই অবশিষ্ট সমতাগুলি গুরুত্ব এবং মূল্য বহন করে। আপনি যদি অন্যান্য সমতাগুলি সকলকে প্রদান করে আর্থিক দিকটি বাদ রাখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আর্থিক সামঞ্জস্য ছাড়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো সমতা বাস্তবে রুপায়িত হবে না। যদি আর্থিক সমতা থাকে তবেই অন্য সকল সমতা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে জীবনে আর্থিক সমতাই প্রথম এবং প্রধান। সর্বপ্রথমে এই বিষয়েই কথা বলা উচিত। ধনবান ব্যক্তি নিজ স্বাধীনতায় যে কোনো পেশায় প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু একজন দরিদ্র ব্যক্তির কাছে কি সেই স্বাধীনতা রয়েছে? সে কি নিজের ইচ্ছেমত যে কোনো পেশা নির্বাচন করতে পারে? আপনি বলবেন সংবিধানে তো উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে বিত্তশালী ব্যক্তিদের মত ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো পেশা নির্বাচন করার স্বাধীনতা দরিদ্রদের কাছে রয়েছে? আপনি এবার বলবেন নেই। আশা করি এটুকু আপনি বুঝে গিয়েছেন যে আর্থিক সমতা ছাড়া অন্য কোনো সমতা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। আপনি সংবিধানে যতই লিখুন না কেন, যতই সকাল-সন্ধ্যা ঐক্যতার সঙ্গীত শোনান না কেন। সংগঠন করুন, কবিতা শোনান, ধর্মঘট করুন, উপদেশ দিন, মানে যা ইচ্ছে করুন এতে কোনো সমাধান আসবে না। শুধুমাত্র আর্থিক সমতা প্রদান করে দিন, দেখবেন অন্য সমতাগুলি আপনিই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। অন্যান্য সমতাগুলি হচ্ছে আর্থিক সমতারই পরিণাম। অন্যান্য সমতাগুলি উৎপন্ন হবার মূল শর্তই হচ্ছে আর্থিক সমতা। বলতে গেলে অবশিষ্ট সব সমতাগুলির জননী হচ্ছে আর্থিক সমতা। আর্থিক স্বাধীনতাই সকল স্বাধীনতাগুলিকে জন্ম দেয় এবং সক্রিয় রাখে। আর্থিক স্বাধীনতা না থাকার অর্থ হচ্ছে অবশিষ্ট সব স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আসুন এবার এই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রেখে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাই। যেন আর্থিক সমতা বা একতা চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ ধরে নিন বর্তমান সময়ে জীবন-যাপনের সকল সুখসুবিধাসমেত একজন ব্যক্তির ২০ লাখ টাকায় হয়ে যায়। তাহলে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ২০ লাখ টাকা অবধি সীমা সরকার নির্ধারণ করে দেবে। এই সীমা অনুযায়ী মানুষ প্রয়োজনীয় বস্তু অর্ডার করতে থাকবে। সরকার তা উৎপাদন করতে থাকবে এবং পৌঁছে দিতে থাকবে। এর ফলে সকল মানুষের জীবনস্তর সমান থাকবে।

জীবনযাপনের সমস্তরকম সুখ উপভোগের জন্য প্রথমে অর্থ উপার্জন করে নিই তারপর ভোগ করব– এমনতর অপেক্ষার কি প্রয়োজন? বন্ধুরা, উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থাকে যদি আমরা গ্রহণ করে নিই তাহলে কোনোপ্রকার অপেক্ষা ছাড়াই আমরা সমস্ত রকমের ঈপ্সিত সুখ উপভোগ করতে পারব। সকল প্রকার আরামদায়ক জীবন প্রথম দিন থেকেই উপভোগ করতে পারব। এতে আমাদের কাছে অর্থ থাকুক বা না থাকুক। অর্থাৎ আপনার কাছে অর্থ আছে কি নেই তার জন্য সুখ উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য আসবে না। অবিরত আপনার ইচ্ছেপূরণ হতে থাকবে। অর্থাৎ আপনি সর্বদা সুখী অবস্থায় থাকবেন। এই প্রকার নীতির ফলে সকলেই সমস্তরকমের সুখসুবিধা সর্বদা পেতে থাকবে। ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে সকলের অর্ডার অনুযায়ী ভোগ বিষয়ক বস্তু এবং পরিষেবা তাদের ঠিকানায় পৌঁছে যেতে থাকবে।

এমন ব্যবস্থা শুরু হবার পর আর কাউকে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। কেননা তার বর্তমান এবং অতীত সুখময় হয়েই থাকবে। সকলের বর্তমান সুখময় হলে অতীত অর্থাৎ সকল স্মৃতি সুখময় হবে এবং যখন তাদের সকল স্মৃতি সুখময় হবে তখন ভবিষ্যতেও তারা সুখের কল্পনাই করবে। কেননা অতীতের মন্দ স্মৃতির কারণেই ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়। যার ফলে মানুষ সর্বদা দুশ্চিন্তায় থাকে। বর্তমানে যদি তার কাছে সুখ থেকেও থাকে ভবিষ্যতের প্রতি দুশ্চিন্তার কারণে তা সঠিকভাবে ভোগ করতে পারে না। মানুষ ভবিষ্যতের চিন্তা করবে নাকি বর্তমান সময়ের সুখ উপভোগ করবে? কেননা বেঁচে থাকতে হবে তো বর্তমান সময়কে কেন্দ্র করেই তাই না? আবার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা বর্তমান সময়কে নিয়েই তো ঘিরে রয়েছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি বর্তমান সময়েও সঠিকভাবে জীবন-যাপন করতে পারে না। তাই নতুন ব্যবস্থা এলে ভবিষ্যতের জন্য আর দুশ্চিন্তা উৎপন্নই হবে না। যার ফলে সকলে বর্তমান সময়ে সুখের সাথে জীবন-যাপন করতে থাকবে। এরপর কাউকে বর্তমান সময়ে সুখী হয়ে জীবন-যাপন করার জন্য ধ্যান, সাধনা, সমাধি ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার কবলে পড়ে মানুষ সর্বদা ভাবতে থাকে অর্থ এইভাবে রোজগার করব নাকি অন্যভাবে রোজগার করব; তার জন্য আইন ভঙ্গ করতেও বাধ্য হয়ে যায় এবং অপরাধী হয়ে যায়। এরপর দুর্দশাগ্রস্ত হবার এক অনন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনেক সময় মানুষ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। অথবা তথাকথিত আধ্যাত্মিক পথে চলাচলের চেষ্টা করতে থাকে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ত্যাগ, তপস্যা, স্বর্গ লাভের কল্পনা, এই সাধনা সেই সাধনা, এই ধর্ম সেই ধর্ম ইত্যাদি পথে জীবন-যাপন করার চেষ্টা করতে থাকে। যেখানে সে অধিক হতাশার সম্মুখীন হয়। সমস্যা যেখানে বাইরের জগতে রয়েছে সেখানে সমাধানের চেষ্টা করছে ভেতরে। এতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ের নির্বোধ আধাত্ম বলছে বাহ্যিক জগতে তো আমরা কিছু করতে পারব না। তার কারণ বাহ্যিক জগতে কি করব তা তো মূলত বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ জগতে কিছু একটি করে কমপক্ষে আশার তো সঞ্চার হবে এই ভেবে যে হয়তো বা এই জীবনে নয় পরবর্তী কোনো জীবনে যদি সমাধান পেয়ে যাই। এই জগতে না হোক স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, জান্নাত ইত্যাদির আশা তো উৎপন্ন হয়ই তাই না? সুতরাং নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আর কাউকে তার পরিবারের

ভরণ পোষণের দুশ্চিন্তায় আত্মহত্যা করতে হবে না। কাউকে চুরি করার জন্য বাধ্য হতে হবে না অথবা কারোর সন্তানকে অপহরণের জন্য ভাবতে হবে না। এমনকি সন্তান অপহরণ নিয়ে যাদের ভয় রয়েছে সেই ভয়ও দূর হয়ে যাবে। অন্য কিছু চুরি হবার আশঙ্কাও অর্থহীন হয়ে যাবে। আবার সুখসুবিধা নিয়েও তো মানুষ একে অপরের সাথে লড়াই-সংঘাত করে থাকে। এসবেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তাহলে লড়াই, দাঙ্গা, সংঘাতের ভয়ও আমাদের জীবন থেকে পাকাপাকিভাবে বিদায় নেবে। সকলের জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। কাউকে কোনো মিথ্যে কথা বলতে হবে না। নিজের সুখ-শান্তির জন্য কোনো পূজা করতে হবে না, কোনো ধ্যান করতে হবে না, দরজার উপরে লেবু-লঙ্কা ইত্যাদি ঝোলাতে হবে না, নামাজ পড়তে হবে না, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারে গিয়ে প্রার্থনা বা উপাসনা করতে হবে না। এরপর সমাজে আপনি কোনো ভিখিরিও খুঁজে পাবেন না। কাউকে দান-দক্ষিণা দেবার বা নেবার প্রয়োজন পড়বে না। সকলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এমনকি সমাজের সকল মানুষ সে শিশু হোক বা বৃদ্ধ, স্ত্রী হোক বা পুরুষ, সকলেই স্বাবলম্বী হবে এবং সকলের জীবন-যাপনের স্তর সমান থাকবে। কেউ কারোর উপর ঋণী থাকবে না। কারোরই কোনোপ্রকার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। যার ফলে সকলের জীবনে স্বাভাবিকভাবে সত্যতা থাকবে, প্রেম থাকবে, ন্যায় থাকবে, পুণ্যতা থাকবে। এমনকি লড়াই বা দাঙ্গারও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সকলে তখন সত্য কথাই বলবে কেননা মিথ্যে বলার কোনো কারণ বা অর্থ আর থাকবে না। সকলে নিজেদের মধ্যে প্রেমপূর্ণ মনোভাবই বজায় রাখবে কেননা কাউকে হিংসা করার তো কোনো কারণ থাকবে না। আর কাউকে বলে দিতে হবে না সর্বদা সত্য কথা বল, সকলেকে প্রেম কর, দীন-দুঃখীকে দয়া কর ইত্যাদি। এরপর সকলে আপনিই নৈতিকতার সাথে জীবন-যাপন করতে থাকবে কেননা যেসব কারণে মানুষ অনৈতিক জীবন-যাপন করে সেইসব কারণ তো আর উৎপন্নই হবে না। সকলে মূলত মানুষ হিসেবে ভালই হয়। কোনো কারণে বাধ্য হয়ে বা ফেঁসে গিয়ে অথবা পরম্পরাগতভাবে ভুল কর্ম করে থাকে। যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন যে জগতের সমস্ত সন্ত্রাসবাদ এবং সকল প্রকার অনৈতিক পথ বেছে নেবার অথবা একে অপরকে দুঃখী করার কারণ হচ্ছে মানুষের কাছে সুখী হবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। মানুষকে সেইসব সম্পদ অপরের কাছে থেকে লুণ্ঠন করে দুঃখ দেবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয়। দুঃখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে আপনি আর কিই বা আশা করতে পারেন। মানুষ যেখানে স্বয়ং অসুখী সেখানে কীভাবে সে অন্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি করবে? তা করতে পারে না। যার কাছে দুঃখ থাকবে সে তো অন্যকে দুঃখই ভাগ করে দেবে। সুখ ভাগ করে দেবার জন্য প্রথমে নিজের কাছে সুখ থাকা তো জরুরী। নতুন সরকার যেখানে সমস্তরকম ব্যবস্থা সহজভাবে সকলের জন্য প্রদান করে দেবে যেমনটি আমি উপরে বর্ণনা করেছি। সেখানে কাউকে দুঃখ দেবার আর কোনো কারণ থাকবে না। একথা আপনারা সহজেই বুঝে নিতে পারেন।

মানুষ কি ভাল অথবা মন্দ হয়?

যদি আমরা নিজের ভেতরে উঁকি দিই তাহলে দেখব যে কখন আমরা অপরকে দুঃখ দিয়েছি বা দুঃখ দেবার কথা ভেবেছি। যখন সোজা পথে সুখ আসে না তখনই কেবলমাত্র আমরা বাঁকা পথ ধরে নিয়েছি। একটি কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে 'সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করে নিতে হয়'। এর অর্থ হচ্ছে প্রথমে মানুষ সোজা আঙ্গুলে ঘি বের করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে যদি সফল না হয় তখন সংবিধানের বিপরীত পথ ধরে নেয়। সমাজে এইসব বিষয়কে আমরা বিভিন্ন অপরাধের নামে জেনে থাকি। যে কোনো দেশে এবং যে কোনো কালে মানুষ এভাবেই জীবন কাটিয়ে এসেছে। প্রথমে মানুষ সংবিধান অনুযায়ী জীবন কাটানোর সাধ্যমত চেষ্টা করে। এমনকি সংবিধানে যদি কোনো কঠোর নিয়মও থাকে তাহলেও মানুষ প্রথমে সেইমত চলাচলের চেষ্টা করে থাকে। সেখানে তাকে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতারও সম্মুখীন হতে হয়। তারপরও মানুষ চেষ্টা করে যায়। যখন অসম্ভব মনে হয় তখন অপরাধের পথ গ্রহণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। যেখানে ১,০০০ মানুষের সুখ প্রয়োজন সেখানে সুখ রয়েছে কেবলমাত্র ১০ জন মানুষের জন্য। যেখানে ১,০০০ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান প্রয়োজন সেখানে কর্মসংস্থান রয়েছে কেবলমাত্র ১০ জন মানুষের জন্য। সরকার ১০ জনকে তো কর্মসংস্থান দিয়েছে কিন্তু অবশিষ্ট ৯৯০ জনকে ছেড়ে দিয়েছে তাদের নিজেদের পরিস্থিতির উপর। একবারও খেয়াল করেনি যে কোন বাড়িতে চাল আছে কোন বাড়িতে নেই। অথবা কারোর বাড়িতে কোনো শিশু অসুস্থ্য রয়েছে কিনা, কারোর পিতামাতা কোথাও অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিনা ইত্যাদি। দুর্দশায় জর্জরিত মানুষ তারপরও যেমন তেমন করে দরিদ্রতার সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু দরিদ্র অবস্থায়, অসহায় অবস্থায় কে কতদিন আর সৎ হয়ে থাকতে পারে? প্রেমপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চলতে পারে? সততা বজায় রেখে চলতে পারে? হয়তো বা হাতে গোনা কিছু মানুষ জর্জরিত অবস্থাতেও অন্যকে প্রতারণা করে না। যদিও বেশীরভাগ মানুষ অসহায় অবস্থায় একটা সময় পর ভুল পথ ধরে নিতে বাধ্য হয়। এরপর আমরা আবার তাদেরকেই দোষারোপ করে থাকি। এটি তো কোনো সুবিচার হল না। কয়েকজন লোক মিলে তো সমাজ তৈরি হয় না। সমাজ সকলে মিলে তৈরি হয়। সেখানে শক্তিশালীরা থাকে, দুর্বলরা থাকে, শিশুরা থাকে, মহিলারা থাকে। বলার অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের মানুষজন থাকে। তাই সঠিক ব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প উপায়। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় সকলের কাছে নৈতিকতা আশা করা উচিত নয়। ইতিহাসেও এই প্রকার অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে। নৈতিকতাকে 'একটি সঠিক ব্যবস্থার পরিণাম' হিসেবে বুঝে নেওয়া উচিত। অথবা সঠিক ব্যবস্থার মাপকাঠি হিসেবে বুঝে নেওয়া উচিত। যদি সমস্ত সততা বা নৈতিকতা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্যবস্থা সঠিক রয়েছে। নাহলে বুঝতে হবে ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও ত্রুটি রয়েছে। তাই প্রথমে ব্যবস্থাকেই সঠিক করে নেওয়া উচিত। যখনই ব্যবস্থা সঠিক হয়ে যাবে তার পরিণামস্বরূপ নৈতিকতাও আপনিই চলে আসবে। কেননা নৈতিকতা

বা অনৈতিকতা কোনো না কোনো ব্যবস্থারই পরিণাম। তাকে জোর করে নিয়ে আসতে হয় না। সে আনন্দের সাথে আপনিই চলে আসে। বর্তমান ব্যবস্থায় এটি নিশ্চিত যে ৯৯০ জন সুখ থেকে সর্বদা বঞ্চিতই থাকবে।

১০ জন সম্পদশালীর মধ্যে নিজের নম্বর চলে আসবে এমনটি অসম্ভবই মনে হয় সকলের কাছে। আর যদি এসেও যায় তবে অবশিষ্ট ৯৯০ জন থেকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে এই ভেবে— যে কোনো সময় তারা দল বেঁধে আমার সম্পদ লুণ্ঠন করে নিতে পারে। এবার বন্ধুরা বুঝে নিন যে, কোনোকিছু পেয়ে গেলেও তা চলে যাবার ভয় সর্বদা থেকেই যায়। কঠোর পরিশ্রমের পর, অসৎ পথে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যে ১০ জন যা কিছু সুখসুবিধা পেয়েছে, সমাজের চোখে এইসব সফল মানুষও তাদের অর্জিত সুখসুবিধা ঠিকমত উপভোগ করতে পারে না। কেননা তারা এই ভেবে সর্বদা দুশ্চিন্তায় থাকে যে কি জানি এই সুখসুবিধা কতদিন আমাদের কাছে থাকবে। কবে কেউ এসে এইসব ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে কে জানে। কেননা বহু মানুষ লুণ্ঠনের চেষ্টায় লেগে রয়েছে। কি জানি কখন তারা সফল হয়ে যায়। আত্মীয় বন্ধুদের উপরও সর্বদা সন্দেহ লেগেই থাকে এই ভেবে যে, কি জানি কে কখন প্রতারণা করে ফেলে। এই কারণে তাদের সাথেও সম্পর্ক এক সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলে। ফলে যেটুকু সুখসুবিধা তাদের কাছে থাকে সেটুকুও ভয়ে ভয়ে উপভোগ করে। এমন অবস্থায় মানুষ অনেক সময় বলে থাকে যে সুখ নিজের সাথে দুঃখও বয়ে নিয়ে আসে। যদিও একথা সত্য নয়। শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কারণে এইসব ঘটে চলেছে। এইভাবে কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। আরেকটি কথা হচ্ছে কিছু মানুষ ভালভাবে কাটাবে এবং অবশিষ্ট সকলে দিনহীনভাবে কাতরাতে থাকবে এমনটিও তো কারোর ভাল লাগবে না। শেষপর্যন্ত আমরা সকলে তো মানুষ তাই না? জন্ম থেকে কোনো মানুষ অসৎ হয় না। পরিস্থিতিই মানুষকে বাধিত করে অসৎ পথে ঠেলে দেয়। যদিও একথা সত্য যে কিছু মানুষ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও অনৈতিক পথ গ্রহণ করে না। তারা সমস্ত দুঃখ সহ্য করে চলে। বাস্তবে সামান্য কিছু মানুষই এমনভাবে চলতে পারে। এটি নিশ্চিত যে তাদেরকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় যা তারা চায় না। এমনকি তাদের পরিবারের সদস্যরাও এমন কষ্টের জীবন চায় না। নীতিবান মানুষদের বাড়ি গিয়ে দেখলে জানা যাবে তাদের পরিবার কত না দুঃখে রয়েছে। তাদের নিজেদের আত্মীয় পরিজনরাও এইসব নীতিবান মানুষদের তিরস্কার করতে থাকে। যদিও এইসব স্বল্প মানুষদের দ্বারা জগৎ চলে না। তাহলে তো ঈশ্বর অল্প কিছু মানুষদের তৈরি করেই থেমে যেত। এখানে সকলকে নিয়েই ভাবতে হবে। অধিকাংশই তো সাধারণ মানুষ যারা পরিস্থিতির ভিত্তিতে সোজা অথবা বাঁকা পথ গ্রহণ করে থাকে।

সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে সমস্ত প্রকার সুখ উপভোগ করার জন্য যদি কোনো সহজ পথ আমাদের কাছে থাকতো তাহলে কেউ কখনো অনৈতিক পথ নির্বাচন করতো না। কারোর কিছু হারানোর ভয়ও থাকতো না এবং আমাদের সকলের কাছে সমস্তরকম সুখসুবিধা থাকতো। আমরা সকলে একে অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে সুখী জীবন উপভোগ করতাম। আপনাদের এই বন্ধু এমন একটি নীতি এবং এমন একটি ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে নিয়েছে যার দ্বারা সকল সুখসুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় হবে। এবার শুধুমাত্র একটিই কর্ম অবশিষ্ট রয়ে যায় তা হল দ্রুত এই ব্যবস্থাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সকলে মিলে তা সরকারি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। বর্তমানে যেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা জানি জনগণ যে নীতিকে চাইবে তাই প্রতিষ্ঠিত হবে। তাকে কেউ বাধা দেবে না। এই নতুন ব্যবস্থানীতি ছাড়াও ভবিষ্যতে আমি যেসব নীতিপ্রণালী রচনা করব সেসবের প্রতিও যদি কোনো প্রশ্ন উদয় হয়, যেমন— এটি কি করে সম্ভব হবে, এটি তো অসম্ভব, এটির তো এইস্থানে সমস্যা রয়েছে তবে এমন ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ আপনারা প্রথমে আমার সাথে আলোচনা করুন কোথায় সমস্যা রয়েছে। যদি কোনো ভ্রান্তি বেরিয়ে আসে তবে প্রথমে তা সঠিক করে নিয়ে তারপর সমাজের কাছে উপস্থাপন করা হবে। আপনার এই মূল্যবান সাহায্য এবং সংযুক্তি সমাজের সুখের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই ভুল বের করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন না বরং আমার সাথে বসে তার প্রকৃত সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করুন। যিনি ভুল বের করতে পারেন তিনি সমাধানও বের করতে পারেন। এই ব্যবস্থাকে যে দেশ গ্রহণ করবে সেই দেশ ৫ বছরের মধ্যে সকল প্রকার সুখসুবিধা দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। সেই দেশের সকল নাগরিক সমস্ত প্রকার সুখের অধিকারী হবে এবং অবিরত সকল প্রকার সুখ পেতে থাকবে। সকলে শিক্ষিত হবে, সকলের কর্মসংস্থান হবে, সকলের কাছে সমস্ত রকমের সুখসুবিধাযুক্ত বড় বাড়ি থাকবে, সকল প্রকার নিরাপত্তা থাকবে। এইভাবে সমস্ত জগৎ এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে সকল প্রকার সুখসুবিধা সহজেই উপভোগ করতে পারবে। সুখসুবিধা পেতে আর অর্থের প্রয়োজন থাকবে না। এই ব্যবস্থা চলে আসার পর আপনার কাছে অর্থ না থাকলেও আপনি দ্রুত সবকিছু পেয়ে যাবেন। আমি যেসব নীতিপ্রণালী এই পুস্তকে উল্লেখ করেছি সেসবের ভিত্তি কি তা বোঝার জন্য এই জগৎ সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে। এই জগৎ কি এবং কেন তৈরি হয়েছে এসব বুঝতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে যা কিছু লিখব সেসব শুধুমাত্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝার জন্য রয়েছে। ফলে কেউ ভুল বুঝবেন না। এই বিষয় নিয়ে এমন কোনো অর্থ করে বসবেন না যে ইনি আমার ধর্মমত অনুসারে বলছে কি বলছে না— এসব কথায় জড়াবেন না। এটি কেবলমাত্র ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য রয়েছে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে নয়। আসুন এবার এই জগৎকে বোঝার চেষ্টা করি যে এই জগৎ কী এবং কেন নির্মিত হয়েছে। আমি এটিকে মূল সিদ্ধান্ত বা মূল স্তম্ভ এইজন্যই বলছি

কারণ এই ব্যবস্থাসহ সকল নীতিপ্রণালী প্রণয়ন করার সময় এই উদ্দেশ্যকে ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে ধরে নিয়েই এগিয়ে গিয়েছি। আসুন এবার সকলে মিলে তা বোঝার চেষ্টা করি।

***

অধ্যায় ৩

মূল সিদ্ধান্ত

সমগ্র পৃথিবীতে আপনি যেদিকেই তাকান না কেন দেখতে পাবেন যে সমস্ত প্রাণী প্রতি মুহূর্তে কেবলমাত্র সুখী হতে চাইছে। প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয়দিকেই আপনি লক্ষ্য করবেন যে সমস্ত প্রকার প্রাণী কেবলমাত্র সুখের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সুখী হবার জন্যই তারা সমস্তরকম প্রয়াস করে চলেছে। মূলত সুখই হচ্ছে বিস্তার লাভ করার একমাত্র কারণ। এমনকি বৃক্ষ-বনস্পতিও এই একই কারণে বিস্তার লাভ করে চলেছে। তবে বনস্পতির ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায় হয়ে থাকে, কেননা তাদের মধ্যে সংবেদনশীলতা ন্যূনতম মাত্রায় থাকে। অর্থাৎ মুখ্য বিষয় হচ্ছে এই জগৎ উৎপত্তির মূল কারণ এটিই যে সকলে যেন সর্বদা আপন আপন সুখ উপভোগ করতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো কারণ চোখে পড়ে না। প্রতিটি অবস্থায় সুখ উপভোগই হচ্ছে জীবের পরম লক্ষ্য। এমনটিই আমি দেখেছি এবং বুঝেছি। আপনিও আশা করি এমনটিই দেখেছেন। দেখা যাচ্ছে সুখী হতে চাওয়াই এই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। সুতরাং এটিই হচ্ছে মূল তথ্য এবং সত্য। প্রথমত, ব্যবস্থা নির্মাণ করার সময়ও আমাদের এই তথ্য এবং এই সত্যকে সর্বদা মনে রাখতে হবে এই ভেবে যে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি অবস্থায় যেন সুখ উৎপন্ন হতে থাকে। এটি স্মরণ রাখতে হবে যে নতুন ব্যবস্থা আসার পরও যদি কোথাও কোনো দুঃখ দেখা দেয় তবে ব্যবস্থার মধ্যেই দোষ-ত্রুটি রয়েছে এমনটি ধরা হবে। তাই প্রথমে ব্যবস্থাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া উচিত। তারপর অন্যান্য বিষয় দেখা উচিত। একটি কথা তো পরিষ্কার সকলেই যেন সর্বদা সুখে থাকে। এই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির হিসেব কষলে দাঁড়ায় কয়েকশো কোটি এবং একজন মানুষ অপরজনের থেকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে ভিন্ন। এমনকি অন্যান্য জীব জগতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে সর্বত্র সমস্তকিছুর মধ্যেই ভিন্নতা রয়েছে। স্বভাবে ভিন্নতা, স্পর্শে ভিন্নতা, রং-রূপে ভিন্নতা, স্বাদে ভিন্নতা, গন্ধে ভিন্নতা ইত্যাদি। এ তো গেল প্রাকৃতিক ভিন্নতা। এরপর রয়েছে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা যা আমরা নিজেরা তৈরি করে থাকি। তাহলে আমরা দেখলাম জগতে কত বড় মাত্রায় বিভিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমরা সংখ্যায় বহু এবং বিভিন্ন। অর্থাৎ মূল সত্য এবং তথ্য হচ্ছে এই ‘বিভিন্নতা’।

পরমাত্মা থেকে মনুষ্যে অবতরণ
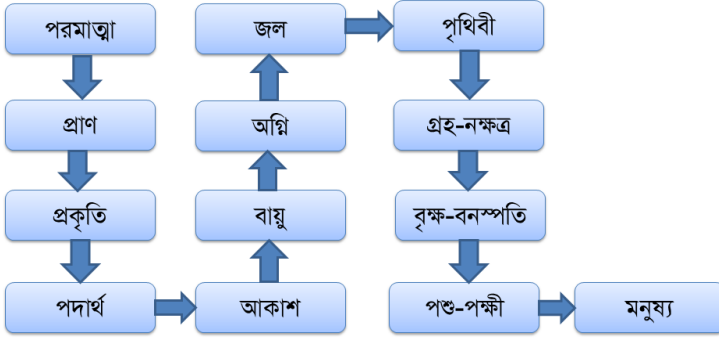
তৃতীয়ত, এত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও একটি সত্য এই যে আমরা সকলেই একই তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ। বৈজ্ঞানিকরাও বলেন যে এইসব হচ্ছে শক্তিরই রূপান্তর। এই দিয়েই আমরা সকলে তৈরি হয়েছি। আমরা সকলে একই মালার পুঁতিগুলির মত একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমরা সকলে একই আকাশের মধ্যে অবস্থান করি এবং একই বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বাস গ্রহণ করি। আমরা সকলে একই সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করি। আমরা সকলে একই সমুদ্র থেকে জল গ্রহণ করি। আমরা সকলে একই পৃথিবীতে বসবাস করি। আমরা সকলে একই প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বসবাস করি। তাহলে আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে দেখতে পাবেন যে আমরা সকলে কীভাবে একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে আমাদের সকলের বিনাশ অনিবার্য। কেননা আমাদের শরীর এই পঞ্চতত্ত্ব দিয়েই তৈরি হয়েছে এবং এই পঞ্চতত্ত্বের ভিত্তিতেই অবস্থান করে রয়েছে। এদের মধ্যে কোনো একটির ভারসাম্যহীনতা আমাদের বিনাশ করার জন্য যথেষ্ট। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে একটি তত্ত্বই প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণ সংসারে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি এই সংসারের সাথে কোনো একটি বিশাল বৃক্ষের তুলনা করা যায় তবে আমরা এমন করে বলতে পারি যে আমরা সকলে একটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা, পাতা, ফুল এবং বীজ। এমনটি মনে হবে যেন আমরা সকলে একে অপরের সাথে কোনো না কোনো দিক দিয়ে জুড়ে রয়েছি এবং যদি মূল শিকড়ের খোঁজ করা যায় তবে জানা যাবে যে আমরা সকলে মূলত একই। তাহলে এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে মূল গোঁড়াতে আমরা সকলে এক এবং উপরের দিকে আমরা বিভিন্ন। যেহেতু মূল গোঁড়ায় আমরা সকলে এক তাহলে আমাদের সকলের মূল ইচ্ছে তো একই হবে। দ্বিতীয় কিছু তো হতে পারে না। আর সেই ইচ্ছেটি হচ্ছে সর্বদা সুখী অবস্থায় থাকা। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে তৃতীয় তথ্য এবং সত্য হচ্ছে মূল গোঁড়ায় অথবা আদিতে আমরা সকলে এক। কোনো একটি তত্ত্বই বহুত্বে বিস্তার লাভ করেছে। যেমনটি একটি বীজ থেকে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। স্রষ্টাই সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

চতুর্থত, বহুত্ব এবং বিভিন্নতা থাকার কারণে আমাদের সকলের সুখ ও তার কারণও আলাদা আলাদা। এটি জরুরী নয় যে কোনো একপ্রকার বস্তু থেকে সকলে সমানভাবে সুখ উপভোগ করবে। তা থেকে কারোর দুঃখও অনুভব হতে পারে। আবার একই বস্তু থেকে কেউ সুখ-দুঃখ দুটোই অনুভব করতে পারে। এই বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নিন যে যখন আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন অগ্রসর হয় এবং তা যদি প্রকৃতির বিপরীত না হয় তবে তা থেকে আমরা সুখ অনুভব করি। আমাদের ইচ্ছের বিপরীত এবং প্রকৃতির বিপরীত হলে তা থেকে আমরা দুঃখ অনুভব করি। তাহলে এই অনুচ্ছেদ থেকে যে তথ্য বেরিয়ে এল তা হচ্ছে আমাদের সুখ এই দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ইচ্ছে অনুসারে এবং প্রকৃতি অনুসারে। উপরের আলোচনা থেকে যা কিছু যুক্তিপূর্ণ কথা বেরিয়ে এল তা এখানে আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। প্রথমত, আদিতে আমরা সকলে এক। দ্বিতীয়ত, উপরে আমরা অনেক এবং বিভিন্ন। তৃতীয়ত, আমাদের সকলের মূল ইচ্ছে এক এবং তা হচ্ছে সর্বদা সুখে থাকা। চতুর্থত, ইচ্ছে এবং প্রকৃতি অনুসারে জীবন-যাপন। এরপর আপনারা দেখতে পাবেন যে এইসব মূল তথ্যকেই আধার হিসেবে ধরে নিয়ে আমি এই নতুন ব্যবস্থাকে নির্মাণ করেছি।

কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি?

এবার নতুন ব্যবস্থাকে নিয়ে আসার পূর্বেই পর্যবেক্ষণ করে নিই যে সত্যিই আমাদের কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। নাকি ব্যবস্থা ছাড়াই সবকিছু ঠিকঠাক থাকতে পারে। কেননা, আমি বহু মানুষকে এমনটি বলতে শুনেছি যে সকল দুঃখের মূল কারণই হচ্ছে এই ব্যবস্থা। তারা এও বলেন যে জগতে যদি কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে সকলেই সর্বাধিক সুখে থাকবে। এর অর্থ এই যে আমরা সকলে দু'ভাবে জীবন-যাপন করতে পারি। প্রথমত, একা একা। অর্থাৎ, না ভাই আমার কোনোপ্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। সকলে নিজেদের খেয়াল নিজেরা রাখুন এবং যার যেমনভাবে জীবন কাটাতে ইচ্ছে হয় কাটাতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সকলে মিলে। অর্থাৎ ব্যবস্থা ছাড়া সুখী জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এই দুটি সম্ভাবনাই তো হতে পারে। ব্যবস্থাবিহীন জীবন এবং ব্যবস্থাযুক্ত জীবন। দুটোকেই প্রথমে ভাল করে বুঝে নিই। তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। ব্যবস্থাবিহীন সম্ভাবনাকে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করে নিই। প্রথমেই যদি বুঝে যাই ব্যবস্থার প্রয়োজনই নেই তবে এ পথেই পা বাড়াব। আর যদি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় তবে একটি সঠিক ব্যবস্থা নির্মাণ করে নিজেদের জীবন যাপনে পালন করব। পূর্বে আমার সাথে যেসব ব্যক্তির আলোচনা চলছিল তারা একথাই বলেছিল যে আমাদের দুঃখের উৎস হচ্ছে এই ব্যবস্থা; আমি তাদের প্রশ্ন করেছিলাম ধরুন যদি সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত করে দেওয়া যায় তবে আমাদের জীবন কেমন হবে? তাদের উত্তর ছিল তবে সকলে নিজেদের মত করে জীবন কাটাতে পারবে। এরপর আমি প্রশ্ন করি যদি কোনো পালোয়ান এসে কারোর সমস্ত সম্পদ

ছিনিয়ে নেয় তবে কী হবে? তখন তো কোনো ব্যবস্থা থাকবে না যে কোথাও গিয়ে কেউ অভিযোগ দায়ের করবে। এমন করেই যদি কোনো বলশালী ব্যক্তি প্রতিদিন কোনো না কোনো দুর্বল ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে জীবন-যাপন করতে থাকে? এমন পরিস্থিতিতে কোনো দুর্বল ব্যক্তি সুখের সাথে জীবন-যাপন করতে পারবে? তাকে কি সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না এই ভেবে যে কখন সেই পালোয়ান এসে আবার সবকিছু ছিনিয়ে না নিয়ে যায়? তখন সেই ব্যক্তিরা উত্তরে বলেছিলেন হ্যাঁ ভয় তো থাকবে। এরপর আমি বলি, ধরে নিন সেই ব্যক্তি ৫০ জনকে বলে দিল তাদের আয়ের ১০ শতাংশ যেন প্রতি সপ্তাহে তার কাছে পৌঁছে যায়। তখন সেই ৫০ জন কি করবে? তারা কি রোজগারের ১০ শতাংশ পৌঁছে দেবে নাকি অন্য কোনো পদক্ষেপ নেবে? তখন তারা বলেন সেই ৫০ জন মিলে একটি দল বানিয়ে নেবে যেন কোনো পালোয়ান একা তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে না পারে। আমি বললাম তারা যে দল তৈরি করবে সেই দলের জন্য কিছু নিয়ম নীতিও কি তৈরি করবে? তারা বলেন হ্যাঁ তা তো বানাতেই হবে, নাহলে দলের সকলে নিজেদের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করবে। তখন আমি জানালাম দল তৈরি করা এবং নীতিনিয়ম প্রণয়ন করাকেই তো ব্যবস্থা বলে। একেই তো কোনো ব্যবস্থার প্রারম্ভকাল বলে। এরপর তারা বলেন আপনি এমন কিছু উপায় বলুন যাতে দলও না বানাতে হয় আবার নীতিনিয়মও যেন না থাকে। এমনকি পালোয়ানের সমস্যাও যেন সমাপ্ত হয়ে যায়। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই সিদ্ধান্ত হল যে অন্যের সাহায্য ছাড়া একা পালোয়ানের সাথে লড়াই করার অর্থ মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো। আর যদি কারোর সাহায্য নেওয়া হয় তবে তো একটি ব্যবস্থার প্রারম্ভ হয়েই যাবে। চলুন এবার অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করি। যদিও এমনটি সম্ভব নয় তবুও ধরে নিই কেউ কাউকে কোনো উপদ্রব করবে না। তাহলে মানুষের জীবন-যাপন কেমন হবে? একজন একা নিজের চেষ্টায় কতটা সুখে থাকতে পারবে? তখন সকলে বলেন যে তারা চাষবাস করবে এবং জীবন-যাপন করবে। আমি বললাম সে তো একা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো পশু ইত্যাদির সাহায্য সে নিতে পারবে না। সাথে সাথে তারা বলেন পশুর সাহায্য কেন নিতে পারবে না? তাহলে একা একা লাঙ্গল কীভাবে টানবে? এমন হলে তো কর্ম করা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তারপর আমি বললাম আপনারা যদি পশুর সাহায্য নিতে পারেন তবে মানুষের সাহায্য নিতে বাধা দিচ্ছেন কেন? পশুর সাহায্যই নিন বা মানুষের সে তো একই কথা তাই না? যে কোনো সাহায্যই নিন না কেন সেখানে ব্যবস্থা এসেই যাবে। ওই ব্যক্তিকে সেইসব পশুর জন্যও তো সবরকম ব্যবস্থা করতে হবে? নাকি সাহায্য নিয়েই যাবে। তারপর জঙ্গলে পাঠিয়ে দেবে এই বলে, যখন প্রয়োজন হবে যেন চলে আসে। তখন তারা বলেন তবে তো একা একা কৃষিকর্ম করা কঠিন হয়ে পড়বে। উত্তরে আমি বলি সামান্য একটু কঠিনই তো হবে, এই ভেবে মেনে নিন যে কষ্টকর অবস্থার সাথেই নিজের জীবন মানিয়ে নেব। তারপর আমি বলি ওই জীবন যাপনে তো পরিবার থাকবে না, তাহলে পারিবারিক সুখ কীভাবে উপভোগ করবেন? খুব বড়জোর সম্ভোগ করতে পারবেন, কেননা পরিবার গঠন করলে তো পারিবারিক ব্যবস্থা প্রারম্ভ হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক ব্যবস্থাও চলে আসবে। সম্ভোগ সুখের পর স্ত্রীকে বলে দিতে

হবে আমি তৃপ্ত হয়েছি এখন তুমি চলে যাও? আবার যখন আমার ইচ্ছে জাগবে তোমাকে জানাব? দ্বিতীয়ত, সম্ভোগ সুখ উপভোগের জন্যও তো আমাদেরকে একে অপরের সহযোগিতা নিতেই হবে। এতেও তো ব্যবস্থা প্রারম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং, তাৎপর্য এটিই দাঁড়ায় আমরা যদি কোনো জীবিত প্রাণীর দ্বারা সাহায্য নিয়ে থাকি তা মূলত ব্যবস্থাকেই প্রারম্ভ করে দেয়। ব্যবস্থা ছাড়া এ আর অন্য কি হতে পারে? এটিই তো মূলত ব্যবস্থা। একেই তো ব্যবস্থা বলা হয়। আমরা এমনটিও দেখেছি যে কারোর থেকে সাহায্য নিলে সেই কর্ম সহজ হয়ে যায়, নাহলে তো আমাদের জীবন-যাপন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যভাবে বললে— পরিপূর্ণ দুঃখের জীবন হয়ে উঠবে। সংঘর্ষের অপর নামই তো দুঃখ। আমরা দেখেছি যে মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে কত অসম্ভবকে সহজ করে নিয়েছে। ক্রমানুযায়ী সুখসুবিধা প্রদান করার বহু বস্তু বিকশিত করে নিয়েছে। যা একা একা সম্পাদন করা অসম্ভব ছিল। তাহলে এমনটি ভাবা ঠিক নয় যে ব্যবস্থা থেকে সুখ উৎপন্ন হয় না। তবে এটি বলতে পারেন ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয় আর সঠিক ব্যবস্থা থেকে সুখ উৎপন্ন হয়। মিশ্র প্রকারের ব্যবস্থা থেকে সুখ-দুঃখ উভয়ই উৎপন্ন হয়। তাহলে প্রয়োজন রয়েছে একটি সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার, নষ্ট করে দেবার নয়। যদিও তা সম্ভব নয় কারণ ব্যবস্থাকে নষ্ট করার জন্যও আরেকটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। তখন প্রশ্ন উদয় হয় কে ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে এবং কীভাবে করবে? এই প্রশ্ন-উত্তরের মধ্য দিয়েই মূলত ব্যবস্থার উদয় হয়। যিনিই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইবেন তাকে কোনো একটি ব্যবস্থাকে সাথে নিয়েই খুঁজতে হবে। তাহলে সিদ্ধান্ত এটিই বেরিয়ে এল ব্যবস্থা ব্যতীত জীবনের কল্পনা করাও মানুষের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার করবে। ব্যবস্থাবিহীন সম্ভাবনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলা যাবে না। প্রথমত, তা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত, কোনোভাবে সম্ভব হয়ে গেলেও তা অধিক দুঃখই প্রদান করবে। সুখের আশা তো ভুলেই যান।

সুখদুঃখ- উভয়ই কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ?

এবার দ্বিতীয় বিকল্প নিয়ে আলোচনা করি। এমন একটি ব্যবস্থা কি তৈরি করা যেতে পারে যার দ্বারা শুধুমাত্র সুখই থাকবে, দুঃখ একেবারেই থাকবে না? যখন অনেকের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছিলাম তখন অধিকাংশ ব্যক্তি এটিই বলেছেন যে এমন কোনো ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়। সুখের সাথে দুঃখ এসেই যাবে, তা আপনি যা ইচ্ছে করুন না কেন। সুখের সাথে দুঃখ কেন আসবে? যখন আমি তাদের কাছে এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর জানতে চাইলাম তখন তারা কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। শুধুমাত্র এটিই বারবার বলেছেন যে সাধু-সন্তরা তো এটিই বলেন যে সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটি নিয়ে আসার চেষ্টা করলে আরেকটি আপনিই চলে আসে। তাকে আটকানো যায় না। তখন আমি প্রশ্ন করলাম সুখ চাইলে যদি দুঃখ চলে আসে তাহলে তো দুঃখ

নিয়ে আসার চেষ্টা করলে সুখ আপনিই চলে আসবে? এই প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু সকলে মৌন রইলেন। কেউ এটি বলেননি যে, হ্যাঁ এমনটিই তো হওয়া উচিত যদি সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হয়। তাদের মধ্যে একজন বলেন, এমনটি মূলত হয় না। তখন আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে কীভাবে হয়? উত্তরে তিনি বলেন, দুঃখকে আহ্বান করলে দুঃখই আসে আবার সুখকে আহ্বান করলেও দুঃখ নিয়ে আসে। এরপর আমি বলি, তাহলে কেন বলছেন সুখ-দুঃখ দুটোই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ? জবাবে তারা বলেন, তা তো জানিনা কিন্তু সাধু সন্তদের থেকে এমনটিই শুনে আসছি তাই বলেছি। এবার আপনার কথা অনুযায়ী তো মনে হচ্ছে এখনও অবধি তারা আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুরূপে যা কিছু বলেছেন সবই মিথ্যে এবং আপনি যা বলছেন তা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি। সাধু-সন্তরা দেখছি কিছুই বোঝেন না, তারা নিজেদের সম্পূর্ণ জীবন এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই অতিবাহিত করেছেন বলে সবকিছু ঠিকই বলছেন বলে আমরা মেনে নিই। আপনার কথা অনুযায়ী মনে হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু হিসেবে তারা যা কিছু বলছেন সেসবের মধ্যে বহু গণ্ডগোল রয়েছে। আপনি কি আমাদের স্পষ্ট করে সবকিছু জানাবেন? আমি তখন বললাম, চেষ্টা করে দেখছি। আমার গবেষণা অনুযায়ী সাধু-সন্তদের কথা সত্য নয়। সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়। বরং দুটি ভিন্ন মুদ্রা এবং ভিন্ন ঘটনা। এবার বোঝার চেষ্টা করুন যে সুখ-দুঃখের ঘটনা মূলত কীভাবে ঘটে থাকে। মনে করুন একজন আপনাকে সম্মানজনক কিছু বললেন এবং অপরজন আপনাকে অপমানজনক কিছু বললেন। দুটি ঘটনাই আপনার সাথে ঘটল। প্রথম ঘটনা থেকে সুখ প্রাপ্তি হল এবং দ্বিতীয় ঘটনা থেকে দুঃখ প্রাপ্তি হল। এবার দেখুন সুখ-দুঃখ দুটি কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনা থেকে আসছে। একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। আরেকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টিকে বুঝে নিই। ধরে নিন রসগোল্লা আপনার খুব পছন্দ। অর্থাৎ রসগোল্লা খেয়ে আপনি অনেক সুখ পেয়ে থাকেন। কিন্তু রসগোল্লা যদি আপনাকে ভরা পেটে খেতে দেওয়া হয় তবে কেমন হবে? রসগোল্লা খুব সুস্বাদু বলে খাবার সময় আপনি সুখ পেয়ে থাকেন কিন্তু পেটে জায়গা না থাকার ফলে ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। সুতরাং পেটের জন্য দুঃখ অনুভব করে থাকেন। অর্থাৎ জিভ দ্বারা সুখ অনুভব হচ্ছে কিন্তু পেটের জন্য দুঃখ অনুভব হচ্ছে। দুটি ঘটনাই মোটামুটি একইসাথে ঘটছে। এবার যদি আমরা এই ঘটনাকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে বুঝতে পারব যে এটি একটি ঘটনা নয় বরং ভিন্ন-ভিন্ন ঘটনা। কেননা রসগোল্লা সুস্বাদু বলে সুখ দিচ্ছে এবং পেটে যেহেতু স্থান নেই সেই কারণে রসগোল্লা যাবার পর পেটকে অনেক প্রসারিত হতে হচ্ছে বলে ব্যথা অনুভব হচ্ছে অর্থাৎ দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি যে সুখ-দুঃখ দুটি ভিন্ন ঘটনার কারণে উৎপন্ন হচ্ছে। কেননা রসগোল্লা নিজে থেকে কোনো সুখও নয় আবার দুঃখও নয়। সে তো একটি বস্তু যা বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের সুখ-দুঃখরূপে পরিণাম প্রদান করে থাকে। এইরকমের আরেকটি উদাহরণ নিচ্ছি। যেমন ধরুন রসগোল্লা আপনার খুব পছন্দ এবং আপনাকে ১০ কিলো রসগোল্লা খেতে দেওয়া হল। আপনি রসগোল্লা খেতে শুরু করলেন যা থেকে আপনি সুখ পেয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পর আপনার রসগোল্লা খেতে আর ইচ্ছে করবে না। অর্থাৎ খেতে চাইবেন না। তারপরও যদি বাধ্য করা হয় এই বলে যে অবশিষ্ট রসগোল্লা

আপনাকে খেতেই হবে, যেহেতু রসগোল্লা আপনি খুব ভালবাসেন। এরপর যা হবে— একই বস্তু আপনাকে দুঃখ প্রদান করবে যা একসময় অবধি আপনাকে অনেক সুখ-সন্তুষ্টি প্রদান করছিল। এই ঘটনা অনুযায়ী মানুষ বলবে, দেখুন একই বস্তু আপনাকে কখনো সুখ আবার কখনো দুঃখ দিয়ে থাকে। সেইজন্য সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এখানে বোঝার চেষ্টা করি যে উক্ত ঘটনা অনুসারে কি তাই মনে হচ্ছে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো অর্থ রয়েছে? যা ঘটেছে তা হল, যতক্ষণ রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে ছিল ততক্ষণ সুখ আসছিল, এরপর একটি সময় পর যখন আর অতিরিক্ত রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে থাকে না। যদি ইচ্ছে ব্যতীত কারোর চাপে আরও রসগোল্লা খেতে হয় তাতে দুঃখ উৎপন্ন হবে। এবার এই ঘটনার মাধ্যমে কিছু লোক বলবে দেখুন একই বস্তু কখনো সুখ কখনো দুঃখ দিয়ে থাকে। এইজন্য সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যদিও বাস্তবে এমনটি ঘটছে না। ঘটনা হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার খাবার ইচ্ছে ছিল ততক্ষণ অবধি সুখ অনুভব হচ্ছিল। যখন ইচ্ছের বিপরীত কারোর চাপে বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছিল তখন দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছিল। তাহলে তো দুটিই ভিন্ন ঘটনা। একটিতে সে ইচ্ছে অনুযায়ী খাচ্ছিল এবং অপরটিতে সে ইচ্ছের বিপরীতে কারোর চাপে বাধ্য হয়ে খাচ্ছিল। তাই এখানে সুখের কারণ ভিন্ন এবং দুঃখের কারণও ভিন্ন। এমনটি তো দেখা যাচ্ছে না যে সুখ দুঃখের কারণ অথবা দুঃখ সুখের কারণ। সুখ-দুঃখ তো পরিণামমাত্র, একে অপরের কারণ তো নয়। কিছু মানুষ এমনও বলেন যে কোনো দুঃখের অনুভব ছাড়া আমরা সুখের অনুভব করতে পারব না। অর্থাৎ এই কথাকে অন্যভাবে বললে এমনটিই মনে হয়ে যে কোনো সুখ অনুভব করার জন্য দুঃখই হচ্ছে মূল আধার। উপরের আলোচনা থেকে আপনি চিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। দুঃখ ছাড়া আমরা সুখ অনুভব করতে পারব না একথা অত্যন্ত শিশুসুলভ। যা বাস্তবে ঘটছে তা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আপনি কোনোকিছু অনুভব করে থাকেন এবং যদি তা রুচিকর মনে হয় তবে তাকে আমরা সুখ বলে থাকি, যদি কষ্টকর মনে হলে দুঃখ বলে থাকি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক প্রথম ব্যক্তি রসগোল্লা খুব পছন্দ করেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পছন্দ করেন না। এবার দুজনকে একসাথে রসগোল্লা খেতে দেওয়া হলে তা থেকে একজন সুখ পাবে এবং অপরজন দুঃখ পাবে। এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দুঃখ সুখের আধার নয় বরং রুচিকর অনুভবই হচ্ছে সুখের মূল আধার। প্রথমত, যখন আমরা কোনো ভোগের সংস্পর্শে এসে রুচিকর অনুভব করি তখন সুখ উপভোগ করি। এইজন্য নয় যে আমরা দুঃখ অনুভব করি বলে সুখ অনুভব করে থাকি। দ্বিতীয়ত, যখন আমরা কোনো ভোগের সংস্পর্শে এসে রুচিকর অনুভব করি না তখন দুঃখ অনুভব করি। যদি দুঃখ সুখ বয়ে আনত তবে তবে দরিদ্র মানুষ অধিক সুখী হতে পারত। কেননা দরিদ্র মানুষ সারা জীবন সর্বাধিক দুঃখ অনুভব করে থাকে। এমন নিয়মের সুফল তো তাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বিত্তশালীদের কম সুখী হওয়া উচিত কেননা তাদের জীবনে তো গভীর দুঃখ থাকে না। সুতরাং সুখ অনুভব করার জন্য দুঃখকে অনুভব করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা সরাসরি সুখ-দুঃখ দুটোই অনুভব করতে পারি। এর জন্য কেবলমাত্র অনুভব করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, যা জন্মগতভাবে সকলের মধ্যে থাকেই। বিভিন্ন প্রকার অনুভবের জন্য আমাদের পাঁচ

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ই হচ্ছে মূল অঙ্গ। একটির অনুভব অন্যটির উপর নির্ভরশীল নয়। তবে হ্যাঁ, মানসিক দিক দিয়ে তুলনা করলে দেখা যাবে অনেক সময় কোনো দুঃখের পর যখন সুখ আসে তখন এমনটি মনে হয় যে এটি অনেক বড় সুখ। অন্যদিকে সুখ যখন কোনো সাধারণ পরিস্থিতিতে আসে তখন তাকে বড় সুখ বলে মনে হয় না। তাহলে বিষয়টি এমন শিশুদের ক্লাসে যেমন করে কালো বোর্ডের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেন সাদা চকের লেখা সঠিকভাবে দেখা যায়। যদি সেই একই চক দিয়ে সাদা বোর্ডের উপর লেখা হয় তবে লেখা তো থাকবে কিন্তু আমাদের চোখ দিয়ে তা ঠিকমত দেখা যাবে না। তাহলে বৈপ্যরিত্যের কারণে কোনো অভিজ্ঞতা কম অথবা অধিক হতে পারে। তাহলেও কিন্তু কোনো ব্যক্তি চাইবে না কোনো কারণে তার জীবনে দুঃখ উৎপন্ন হোক। সামান্য থেকে সামান্যতম দুঃখও নিজের জীবনে থাকুক এমনটি কেউ পছন্দ করে না। এর থেকে বোঝা যায় মানুষ কেবলমাত্র সুখই চেয়ে থাকে। যখন কোনো এক ব্যক্তি আমায় বলেছিল, দেখুন সুখ অনুভবের জন্য জীবনে দুঃখ আসাটা অতি আবশ্যক, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন আপনার সর্দি-কাশি হয় তখন কি আপনি চিকিৎসা করেন? তিনি সাথে সাথে বলেছিলেন, হ্যাঁ করি। আমি তখন উত্তর দিয়েছিলাম এই বলে যে, সে তো সাধারণ দুঃখ, কেন আপনি তার চিকিৎসা করেন? সেই দুঃখের সাথে জীবন-যাপন করলে তবে তো আপনার সুখ বেড়ে যাবে? তখন তিনি স্বীকার করে করেন যে, আমি সঠিক কথাই বলেছি। এর অর্থ এটিই যে আমাদের শুধুমাত্র মনে হয় যে সুখ বেড়ে গেছে। যেখানে আমরা সকলে জানি যে এটি কেবলমাত্র মনে হওয়া মাত্র বাস্তবিকতা নয়। সেইজন্য আমরা ছোটো খাটো দুঃখকেও সর্বদা দূর করার প্রয়াস করে থাকি। এতে অনেকবার সফলও হই। আবার কখনো কখনো তা সাধ্যের বাইরে হওয়ায় অসফলও হয়ে থাকি। তাহলে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে এল যে সুখ-দুঃখ দুটোই ভিন্ন ঘটনা। এদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এই দুটি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ নয়। এত আলোচনার পরও যদি কেউ এই কথায় অনড় থাকেন যে তা একই মুদ্রার দু-পিঠ তাহলে আমাদেরকে সেই ব্যক্তির জীবনকে পর্যালোচনা করা উচিত এই জন্য যে— সেই ব্যক্তি নিজের জীবনে এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জীবন-যাপন করছে কিনা। অর্থাৎ সেই ব্যক্তির নিজস্ব জীবনে কোনোপ্রকার সুখের ইচ্ছে থাকা একেবারেই উচিত নয়। এমনকি তাকে এমন কোনো কার্যকলাপ করতে যেন দেখা না যায় যার দ্বারা সুখ প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে। এবার আপনি বলুন যার সুখী হবার ইচ্ছে নেই এবং দুঃখও চায় না তবে এই জগতে সে কেন জীবিত থাকবে? তার আত্মহত্যা করে ফেলা উচিত নয় কি? কেননা সুখ-দুঃখ ব্যতীত এই জগৎ সংসারে বেঁচে থাকার অন্য উদ্দেশ্য কি হতে পারে? উপরের সমস্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের সুখী জীবন-যাপন সম্ভব নয়। সর্বদাই আমাদের একটি সঠিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। আর আমরা পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমেই সর্বাধিক সুখী হতে পারি। যেখানে কোনোপ্রকার সহযোগিতা থাকবে না সেখানে বহু রকমের দুঃখ ভোগ করতে হবে। এর তাৎপর্য এটিই যে আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন যেখানে স্বাভাবিকভাবেই সকলের জন্য সমস্ত প্রকার সহযোগিতা করা সম্ভব হবে। যেখানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা থাকবে না।

কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা সম্ভবপর হবে। আপনি জেনে খুশি হবেন— যেমন ব্যবস্থার কথা আমি বলছি সেখানে এমনটিই রয়েছে। সেখানে কেবলমাত্র সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতার না প্রয়োজন পড়বে এবং না কোনো সম্ভাবনা থাকবে। আসুন বুঝে নিই এমনটি কীভাবে সম্ভব হবে? উপরের আলোচনায় যা কিছু আমি আলোচনা করেছি এবং যে পরিণামে পৌঁছেছি, সেইসব তথ্যকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নিতে পারেন। সেই সকল পরিণামগুলিকে এখানে আবার একসাথে উল্লেখ করছি। প্রথমত, আদিতে আমরা সকলে এক। দ্বিতীয়ত, বাইরে আমরা সকলে অনেক এবং বিভিন্ন। তৃতীয়ত, আমাদের সকলের মূল ইচ্ছে এক তা হচ্ছে সর্বদা সুখে থাকা। চতুর্থত, সুখ নির্ভর করে ইচ্ছে অনুযায়ী এবং প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার উপর। পঞ্চমত, সিদ্ধান্ত এটিই নিশ্চিত হয়েছে যে একটি সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। আমি এই সকল তথ্যকেই ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে নতুন ব্যবস্থার নির্মাণ করেছি।

***

অধ্যায় ৪

সুখের প্রকারভেদ

এবার আমাদের এটি বুঝতে হবে যে নতুন ব্যবস্থার অন্তর্গত এই সুখ মূলত কী, কত প্রকার এবং আমরা তা কীভাবে উপভোগ করতে পারি? যে সকল অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের তৃপ্তি অনুভব হয় এবং প্রকৃতির কোনো নিয়মকে লঙ্ঘন করে না সেইসব বিষয়কেই আমরা 'সুখ' বলতে পারি। বুঝে নেবার সুবিধার দিক থেকে আমরা সুখকে চার ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১। জ্ঞানের সুখ
২। কর্মের সুখ
৩। ভোগের সুখ
৪। বিশ্রামের সুখ

জ্ঞান সুখের অভিপ্রায় এটিই থাকে যে আমরা সারা জীবন জানতে, পড়তে ও শিখতে চাই। কর্ম সুখের অভিপ্রায় এটিই থাকে যে আমরা যোগ্যতা ও ইচ্ছে অনুযায়ী কর্ম করতে চাই। এর বাইরে আরও কিছু কর্ম রয়েছে যা আমরা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত স্তরে সম্পন্ন করতে চাই। যা থেকে প্রকৃতির মধ্যে যেন কোনো দোষ উৎপন্ন না হয়।

ভোগ সুখের অভিপ্রায় এটিই থাকে— যা কিছু ভোগ্য বস্তু ও সুখসুবিধা রয়েছে সেইসব নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যখন চাইব ভোগ করতে পারব। বিভিন্ন প্রকার খেলায় অংশ নিতে চাওয়া অথবা অন্য কারোর খেলা দেখতে চাওয়াও হতে পারে। যেমন— নৃত্য, সংগীত ইত্যাদিতে অংশ নিতে চাওয়া বা অন্যের পারফর্মেন্স দেখতে চাওয়া। আর বিশ্রাম সুখের অভিপ্রায় এটিই যে আমরা কাজের পর আরাম করতে চাই। অথবা স্বপ্ন সুখের আনন্দ নিতে চাই। এটি বিশ্রাম অবস্থাতেই সম্ভব। তাহলে মুখ্যরূপে এই চার প্রকারের সুখ হয়ে থাকে এবং এদের অধিক সরলভাবে বোঝার জন্য একে অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে আরও বিভাজিত করে নিতে পারি—

ক) ব্যক্তিগত সুখ
খ) পারিবারিক সুখ
গ) সামাজিক সুখ
ঘ) সমষ্টিগত সুখ

ক. ব্যক্তিগত সুখ

এখানে ব্যক্তিগত সুখের অর্থ বলতে বোঝায় কোনো জীবের নিজের ব্যক্তিগত সুখ। যেমন তার কি ভাল লাগে, কি খেতে পছন্দ করে, কেমন যায়গায় থাকতে পছন্দ করে, কোন খেলা দেখতে এবং খেলতে পছন্দ করে, সারাদিনের রুটিন কেমন রাখতে পছন্দ করে, কেমন কাপড় পরতে পছন্দ করে, কেমন প্রকার সম্পর্ক পছন্দ করে, কি কি বিষয় জানতে ইচ্ছে হয় ইত্যাদি। এই যে এত রকম ইচ্ছে যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির সাথেই সম্পর্কযুক্ত— এসবই ব্যক্তিগত সুখের অন্তর্গত। কেননা মানুষ পৃথিবীর সর্বাধিক বুদ্ধিমান প্রাণী তাই আমাদের তাদের দিয়েই শুরু করা উচিত। কারণ মানুষ যদি সঠিক ভাবে জীবন-যাপন করতে পারে তবে তাদের অন্যান্য সমস্তকিছু এই ব্যবস্থায় যুক্ত করতে সুবিধা হবে। এমনকি মানুষকেই তো সমস্ত কিছুকে ব্যবস্থাযুক্ত করতে হবে, আর তো কেউ আসবে না সেসব ব্যবস্থানুকূল করার জন্য। তাহলে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি যে মানুষের সুখ কীসের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত সুখকে বোঝার জন্য এটিকেও আমরা চারভাগে বিভক্ত করতে পারি। তাহলে বোঝার পথ অধিক সুগম হয়ে যাবে। অবশিষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একইরকমভাবে বুঝে নিতে হবে। যদিও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে শারীরিক সুখই হচ্ছে প্রমুখ অবশিষ্ট সুখগুলি গৌণ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত সুখকে আমরা চারভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১। শারীরিক স্তরের সুখ
২। মানসিক স্তরের সুখ
৩। ভাবনাত্মক স্তরের সুখ
৪। চেতনাত্মক স্তরের সুখ

শারীরিক স্তরের সুখ

আমাদের সকলের শরীর আহার-বিহারের কারণেই সুখী অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ সুস্থ থাকে। আমাদের সকলের শরীর একই প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি। আবার এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে পরিবেশ অনুযায়ী আহাররূপে গ্রহণ করলে শরীর জীবিত থাকে। সঠিক নিয়মে ঘুমোলে, বিশ্রাম নিলে, বসলে, চললে, দৌড়লে, ওজন তুললে, মালিশ করলে, ব্যায়াম করলে, স্নান করলে, ঋতু অনুসারে বস্ত্র চয়ন ইত্যাদির কারণে সুস্থ থাকা যায়। প্রথমত, আহার এমন হতে হবে যেন তা সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হয়। দ্বিতীয়ত, সেই আহার গ্রহণ করার পর শরীর যেন কোনো ভাবে অসুস্থ না হয়। অথবা বাসি ভোজন যেন গ্রহণ না করা হয় ইত্যাদি। যদি এইসব কথার খেয়াল রাখা যায় তবে আমরা সকলে শারীরিক স্তরে সুখী থাকবে পারব। এভাবে বিহারের ক্ষেত্রেও আমরা একইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি। যদি আমাদের ব্যায়াম, ওঠাবসা ইত্যাদি আরামদায়ক এবং সুন্দর হয় তবে এইসব থেকেও আমরা শারীরিকভাবে সুখী হতে পারি।

মানসিক স্তরের সুখ

মনের স্তরে নিজস্ব একরকম সুখ থাকে। যেমন— জ্ঞান আহরণ করা, কল্পনা করা, গল্প/কবিতা/উপন্যাস ইত্যাদি পড়ে আনন্দ আহরণ করা, কৌতুক বা হাস্যরস উপভোগ করা ইত্যাদি। এই কল্পনা শক্তির কারণেই আমাদেরকে মানুষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। মানসিক বিকাশের জন্যই মানসিক সুখের ইচ্ছে উদয় হতে থাকে। সমস্তরকম বিষয়ের সুখকেই মানসিক সুখ বলা হয়। যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ প্রকার বিষয় মনের অন্তর্গত এবং এই সকল বিষয় নিয়ে তার জ্ঞান হতে শুরু করে। এই পাঁচ বিষয়ের সাহায্য নিয়ে সে বিভিন্ন কল্পনা করতে শুরু করে। আবার এই পাঁচটি বিষয় শুধুমাত্র শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, তা বিকশিত হয়ে কল্পনার ডানা জুড়ে অন্তর আকাশে যাত্রা করে। বহিরাকাশে তেমন করেই কার্যকলাপের চেষ্টা করতে থাকে। অন্তরাকাশ জ্ঞানের আধারে মনুষ্য নানা কিছুর নির্মাণ করতে থাকে। কেননা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো তার কাছে স্বল্প বলে মনে হয়। তখন সে অধিক রুচিকর শব্দ ও রুচিকর সঙ্গীত শুনতে চায়। রুচিকর স্পর্শ অনুভব করতে ও রুচিকর পোশাক পরিধান করতে চায়। সে চারিদিকে রুচিকর সৌন্দর্য ও রুচিকর নৃত্য দেখতে চায়। রুচিকর রস পান করতে চায়, রুচিকর ভোজন গ্রহণ করতে চায় এবং রুচিকর গন্ধ অনুভব করতে চায়। এইভাবে সে এই পাঁচপ্রকার বিষয়গুলোকে নিজের রুচি অনুযায়ী রস আস্বাদন করে সুখী হতে চায়। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী সে এইসবকে তৈরিও করে নিতে পারে কেননা

প্রকৃতি থেকে এইসব বিষয় সহজে গ্রহণ করা যায় না। নিজের জ্ঞান অনুযায়ী নানারকম কল্পনা করে বিভিন্ন প্রকার বিষয়ের সাথে প্রাকৃতিক উপাদানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে তা বানিয়ে নেয়। বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলো তৈরি করে নেয়, নিজে অংশগ্রহণ করে অথবা অন্যের খেলা দেখেও সুখ অনুভব করে। সুতরাং মানসিক স্তরের সুখ এই পাঁচটি বিষয়ের উপর সম্পর্কিত। মানসিক স্তরের সুখ অনুভবকে আমরা সঠিক তখনই বলব যখন উপরিউক্ত বিষয়গুলো আপনার শরীর ও মনের জন্য সবদিক দিয়ে উপকারী ও রুচিকর হবে।

ভাবনাত্মক স্তরের সুখ

ভাবনাত্মক সুখ হল আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা নির্মিত সুখ। নানারকম সম্পর্ক থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকারের সুখ অনুভব করে থাকি। যেমন মায়ের কাছ থেকে মাতৃসুখ, পিতার কাছ থেকে পিতৃসুখ, ভাইয়ের কাছ থেকে ভিন্ন সুখ, বোনের কাছ থেকে ভিন্ন সুখ, দাদু-দিদিমা এবং যাদের সাথে আমাদের যেমন সম্পর্ক তাদের থেকে সেইরূপ সুখের প্রাপ্তি হয়ে থাকে। আমরা বিভিন্ন মানুষজনদের সাথে সম্পর্ক অনুযায়ী সেইরূপ ব্যবহার করে থাকি। এইভাবে সেই সম্পর্কের মাধ্যমে একটি বিশ্বাস তৈরি হতে থাকে। তার ফলে আমাদের ভেতরে সেই প্রকার প্রেমের উদয় হতে থাকে। এর ফলস্বরূপ আমাদের জীবনে সুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমাদের সম্পর্কের বিস্তার যত বেশী হতে থাকবে সুখের মাত্রাও ততধিক হতে থাকবে। জগতে আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, সমষ্টিগত সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কগুলি পেয়ে থাকি। যে ব্যক্তি যেমন সম্পর্কের ভেতর যতটা গভীরে প্রবেশ করতে পারে সেই ব্যক্তি সেইরূপ স্তরের ভাবনাত্মক সুখ পেয়ে থাকে এবং অনুভব করতে থাকে। সম্পর্কের সুখ ততক্ষণ অবধি থাকে যতক্ষণ অবধি সেই লোকজন আমাদের পছন্দ অনুযায়ী হয় ও দুপক্ষই সুখ অনুভব করে। এবং এদের উপর কোনো সম্পর্ক চাপিয়ে দেওয়া হয় না। যখন কোনো সম্পর্ক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বাধ্য হয়ে তৈরি হয় তখন এমনতর সম্পর্ক মূলত দাসত্ব এবং বন্ধন তৈরি করে। সন্তুষ্টি প্রদান করে না। এটি মানুষকেই নিশ্চিত করতে হবে সে কার সাথে, কেমনভাবে, কতটুকু এবং কতদিন সম্পর্ক রাখতে চায়। যেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কেউ কারোর উপর বাধ্য না থাকে। এতটুকু জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। যদি কোনো সম্পর্ক থেকে কেউ কখনো বেরিয়ে যেতে চায় তবে অপরপক্ষ যেন স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে নিতে পারে। নাহলে সে অপরকে দুঃখী করে তুলবে অথবা নিজেও সুখী হতে পারবে না। তবেই আমাদের সম্পর্কগুলি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য

হবে। এইভাবে সকলের জন্য ভাবনাত্মক স্তরের সুখ সর্বদা অবস্থান করতে পারে। সঠিক ব্যবস্থা থাকলে এইসব অতি সহজেই প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা সঠিক ব্যবস্থায় নতুন নতুন সম্পর্কও খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে। একটি সম্পর্ক সমাপ্ত হয়ে গেলে সেইরূপ অনেক সম্পর্ক আপনার কাছে সর্বদা বিকল্প হিসেবে থাকবে যাদের থেকে আপনি নিজের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ সহজেই নির্বাচন করতে পারবেন। এমনকি সম্বন্ধ শুরু করার জন্যও অপরের কাছে নিবেদন করতে পারবেন। কোনো একটি সম্বন্ধ সমাপ্ত করতে অসুবিধে তখনই হয় যখন আমাদের কাছে অন্য কোনো বিকল্প থাকে না। যেহেতু এই পরিবর্তনশীল সংসারে আমাদের রুচি প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে সেইজন্য সবকিছুই যদি পরিবর্তনশীল রাখা যায় তবেই অধিক সুখময় হবে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ও যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে ক্রমাগত জুড়ে থাকে তবে তাদের সংবেদনশীলতা সেইরকম থাকে না যেমনটি শুরুতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি কোনো সুগন্ধি প্রতিদিন ব্যবহার করেন তবে সময়ের সাথে ধীরে ধীরে সেই সুগন্ধ কম অনুভব হতে থাকে এবং একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়। যদি আপনি নিরন্তর সুগন্ধিকে বদল না করেন। এর অর্থ এটিই হবে যে আপনি নিজের সুখের বিষয়টিকে কমিয়ে দিচ্ছেন এবং যে সম্পর্ক একসময় আপনাকে অপার সুখ দিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে তা দুঃখ দিতে শুরু করবে এবং আপনার জীবনকে নরকের থেকেও ভয়ানক বানিয়ে দেবে। তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিবর্তনশীল থাকা উচিত। বিশেষ করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো অধিক সংবেদনশীল থাকা উচিত যেন একে অপরের প্রতি উদাসীনতা পরিলক্ষিত না হয়। উদাসীন থেকেও যদি আমরা সম্পর্ক ধরে রাখি অথবা অপরজনকে বাধ্য করে থাকি তবে এটিই বুঝে নিতে হবে আমরা মূলত দুঃখকেই নিমন্ত্রণ করছি।

চেতনাত্মক স্তরের সুখ

কিছু উদ্ভাবন করা অথবা কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার বুঝে নিলে চেতনাত্মক সুখের অনুভব হয়। স্থুল ভাবে বলতে গেলে অধ্যাপনা, গবেষণা, অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সম্পর্কে অন্বেষণ করা, বহির্মুখী প্রকৃতিকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কোনোকিছুর পর্যালোচনা করা ইত্যাদি। রুচি অনুযায়ী যদি এইসব প্রাপ্তির সুযোগ পাওয়া যায় তবে তা থেকে চেতনার সুখ অনুভব হয় এবং তা থেকে আত্মিক সুখ প্রাপ্তি হতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনায় আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে ব্যক্তিগত সুখ প্রাকৃতিক তথ্য এবং সংস্কৃতিক তথ্য এই দুটির মেলবন্ধনে নির্মিত। সেইজন্য ব্যক্তিগত সুখ সত্যের

উপর অধিষ্ঠিত। সত্য এইজন্য যে প্রকৃতি কোনো এক উপাদানকে আধার করে নিয়ে বহুত্বে রুপান্তরিত হয়েছে। সেটিও সকল প্রকার সুখী হবার ইচ্ছে নিয়েই। তাহলে প্রকৃতিই এই অনৈক্যের মূল কারণ এবং আমাদের শরীর যেহেতু পুরোপুরি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এবং প্রকৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকতে হয় সেইজন্য প্রকৃতিই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখের আধার। সুতরাং সত্যের ভিত্তিতেই একটি সঠিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদেরকে বক্তিগত সুখ এবং ব্যক্তিত্ব নির্মাণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

খ. পারিবারিক সুখ

ব্যক্তিগত সুখের পর আমরা পারিবারিক সুখকে বোঝার চেষ্টা করি। এটি এমন একটি সুখ যা ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করা যায় না। সেজন্য অন্যের সান্নিধ্য দীর্ঘ সময় অবধি প্রয়োজন হয় এবং তা প্রাপ্তির জন্য পারিবারিক কাঠামো নির্মাণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রকৃতিগতভাবে দেখা যায় সকল প্রাণী দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। এদের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে সাংস্কৃতিকভাবেও সেইরূপ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত ছোট দলের নাম পরিবার দেওয়া হয়েছে। পরিবারের অর্থ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একে অপরের সাথে সবকিছু ভাগ করে নেওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ আমার যা কিছু আছে সেসব তোমারও। এইরকম মানুষজন মিলেমিশে এক স্থানে থাকতে শুরু করলে সেই দলকে আমরা পরিবার বলে জানি। অর্থাৎ যাদের মধ্যে প্রেম থাকে এবং তারা একসাথে থাকতে পছন্দ করে। শিশুদের পরিবারের অংশ ততদিন অবধি ধরা হবে যতদিন অবধি তারা প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। যদি কোনো পরিবার সন্তানকে রাখতে না চায় অথবা সন্তানরা কিছুটা বড় হলে মাতাপিতা যদি অন্য কারোর সাথে থাকতে চায় এমন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা সেই বাচ্চাকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেবে। প্রেমপূর্ণভাবে একে অপরের সাথে বসবাস করে যে সুখ প্রাপ্তি হয় তাকে পারিপারিক সুখের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সমস্ত পারিবারিক সিদ্ধান্ত প্রেমের আধারেই গ্রহণ করা উচিত। সত্যের আধারে নয়। কেননা পরিবারের মধ্যে সমস্তরকম ব্যবহার প্রেমের উপরেই নির্ভর করে থাকে। এখানে প্রেমের অর্থ একে অপরের প্রতি আকর্ষণ এবং ফলস্বরূপ একে অপরের সাথে বসবাস করার ইচ্ছেকেই ধরা উচিত। যদি কখনো সন্তানরা তাদের মাতাপিতার সাথে থাকতে না চায় তবে সরকার সমস্ত সুখসুবিধাসহ তাদের আলাদা বসবাসের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করবে। যদিও ২৫ বছর বয়স অবধি বাচ্চাদের সমস্ত খরচ সরকার থেকেই প্রদান করা হবে। কারোর সাথে দীর্ঘ সময় বসবাসের ফলে যে সুখ পাওয়া যায় তাকে পারিবারিক সুখ বলে। যা ব্যক্তিগতভাবে কখনই সম্ভব নয়।

গ. সামাজিক সুখ

এমন সুখ যা ব্যক্তিগতভাবে বা পারিবারিকভাবে উপভোগ করা সম্ভব নয়। যা প্রাপ্তির জন্য একটি বড় গোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজন হয়। এই সুখ প্রাপ্তির জন্য সামাজিক কাঠামো নির্মাণ করার প্রয়োজন হয়। অনেক পরিবার মিলে একটি সমাজ গঠিত হয়। সমাজের অর্থ হচ্ছে— সম্ + অজ। 'সম্'-এর অর্থ সমান। আর 'অজ' এর অর্থ হচ্ছে গোষ্ঠী বা দল। অর্থাৎ যেসব পরিবার একইরকম মতামত পোষণ করে। এর অর্থ যখন কিছু পরিবার মিলে একটি সমাজের নির্মাণ করে তখন তা পরিচালনার জন্য একটি নিয়মাবলী তৈরি করা হয়। যার প্রতি সকল পরিবার সহমত হয়। এখন আমরা এটির সঠিক ব্যখ্যা করব। কোনো একটি নিয়য়মাবলীকে কিছু পরিবার মেনে নিয়ে একটি সমাজ গঠন করে। যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পারিবারিক স্বাধীনতা থাকে। তা এমনভাবে গঠন করা হয় যেন কারোর সামাজিক স্বাধীনতা ব্যাহত না হয়। এইপ্রকার একটি গ্রামকে আমরা একটি সমাজ বলতে পারি। যারা একে অপরের সাথে বসবাস করাটা স্বীকার করে নেয়। এমন অনেক কর্ম রয়েছে যেসব আমরা ব্যক্তিগতভাবে নির্মাণ বা দায়িত্ব পালন করতে পারি না। যেমন— সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, জ্ঞানবিজ্ঞান, কলাকৌশল নির্মাণ, উন্নত ঘরবাড়ি নির্মাণ, বিভিন্ন রকমের খাদ্য পদার্থ উৎপাদন ইত্যাদি। যতক্ষণ পর্যন্ত এইসবের নির্মাণ হবে না ততক্ষন পর্যন্ত এইসবের ভোগ থেকে সুখ প্রাপ্তি হবে না। এমন সুখকে সামাজিক সুখের শ্রেণীতে রাখা হয়। অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে যে সমস্ত সুখ আমাদের প্রদান করা হয় সেই সকল সুখ সামাজিক সুখের শ্রেণীতে পড়ে। এইরকম সুখ দেখতে সাধারণত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুখের মত মনে হয় কিন্তু তার নির্মাণ সরকার ছাড়া সম্ভব নয়। এভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুখেরও বৃদ্ধি হয় যদি সামাজিক সুখ আমাদের জীবনে প্রবেশ করে।

সমাজের আধার হবে 'ন্যায়' প্রেম অথবা সত্য নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ন্যায় কী? পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে অবস্থান করছে এমন সমস্তকিছুর উপর সকলের সমান অধিকার হবে। একজন ব্যক্তি বা পরিবারের যতটা অধিকার অন্য একটি ব্যক্তি বা পরিবারেরও ঠিক ততটাই অধিকার থাকবে। ঠিক এই মান্যতাকে অথবা এইপ্রকার ব্যবস্থিত নিয়মকেই ন্যায় বলা হয়। সবরকম সুখ উপভোগ করার জন্য সমাজে সকলের একসমান অধিকার থাকবে। আর তা শুধুমাত্র এমন হলে হবে না যে সংবিধানে তো লেখা থাকবে সকলের একসমান অধিকার কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর হতে দেখা যাবে না। যদি তাই হয় তবে

একে ন্যায় বলা যাবে না। সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করার সময় ন্যায়কেই আধার হিসেবে ধরে নিয়ে সমস্ত নীতিনিয়মের নির্ণয় করা উচিত।

ঘ. সমষ্টিগত সুখ

সমষ্টিগত সুখের অর্থ হচ্ছে সমস্ত সমাজের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ছন্দ থাকা। সমষ্টির মধ্যে সকলের জীবন চক্র যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। এটি তখনই সম্ভব যখন সমস্ত সৃষ্টিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যেন সবকিছু সঠিকভাবে ব্যবস্থিত হয়ে যায়। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন বিশ্ব ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত প্রদান করার জন্য একটি কেন্দ্র থাকবে এবং সবকিছু বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকবে। সকলের কল্যানের জন্য যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হবে সেটি সঠিক হবে এবং বাস্তবায়িত করা যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের একটি বিশ্ব সরকারের প্রয়োজন। যেমনভাবে কোনো দেশের ভেতর একটি সরকার থাকে সেইমত বিশ্বেরও একটি সরকার প্রয়োজন। সমষ্টির অন্তর্গত মনুষ্য, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-বনস্পতি এবং জড় পদার্থ ইত্যদির মধ্যে ভারসাম্য থাকা অন্ত্যন্ত আবশ্যক। কোনো একটি শ্রেণীর ভারসাম্যহীনতা অন্য একটি শ্রেণীকে ভারসাম্যহীন করার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা এখানে সবকিছু একে অপরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে একজনের প্রভাবে অন্যজনও প্রভাবিত হয়। কেননা একের থেকেই তো অনেকের সৃষ্টি হয়। কোথাও কিছু ঘটলে তার প্রভাব সকলের উপর পড়ে। এর শুরুটা মনুষ্য দিয়ে করা যেতে পারে। প্রথমে মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য আসুক তারপর অবশিষ্ট তিন শ্রেণীর কথা আসবে। কেননা সকলের থেকে মানুষের মধ্যেই উন্নতমানের চেতনা রয়েছে। তাহলে প্রথমে মানুষ নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেবে তারপর অবশিষ্টদের করবে। এইজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহার আবশ্যক হবে কেননা এর অভাবে আমরা কিছুই ব্যবস্থিত করতে পারব না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে কি করলে কোনো সমষ্টির মধ্যে কেমন পার্থক্য আসবে। যে পার্থক্য আসবে তা অবশিষ্ট সকলের জন্য হিতকর হবে কিনা। এইজন্য একটি সঠিক ব্যবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরন্তর গবেষণা সঠিক দিশা অনুযায়ী হওয়া উচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্মিত ব্যবস্থাই আমাদের সুখী করে রাখতে পারে। আর মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা এই পৃথিবীতে নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকশিত করে সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে পারে আবার নরকে পরিণত করতে পারে। সমস্ত সৃষ্টির ব্যবস্থা মানুষের উপরেই নির্ভর করছে। সে চাইলে সবকিছু সঠিকভাবে নির্মাণ করতে পারে অথবা সবকিছু নষ্ট করে নরকে রূপান্তরিত করতে পারে। অথবা কিছুটা সঠিক করে স্বর্গ এবং কিছুটা ভুল করে নরক নির্মাণ করতে পারে। সবকিছু তার ইচ্ছে, জ্ঞান এবং কর্মের উপর নির্ভর করছে। সে

চাইলে পশু-পক্ষীর মত প্রাকৃতিকভাবে জঙ্গলে থাকতে পারে অথবা চাইলে সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক ব্যবস্থা নির্মাণ করে সমস্ত সুখ উপভোগ করতে পারে যা এই সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। নির্ণয় করা মনুষ্যের হাতে রয়েছে। সমষ্টিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য এমন কিছু কর্ম করার প্রয়োজন পড়ে যার মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যক্ষরূপে কিছু প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সৃষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে। এই প্রকার কর্মকে পুণ্য বলা হয়। প্রকৃতিকে সুন্দর এবং ব্যবস্থিত রাখার জন্য যেসব কর্ম করা হয় তাকেই পুণ্য বলা হয়ে থাকে। তাহলে সমষ্টিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য পুণ্যকে আধার হিসেবে ধরা যাক। আবার মাথায় রাখতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানও একপ্রকার সুখের বিষয়। তবে চার প্রকার সুখের জন্য চার প্রকার আধারই যেন আমাদের প্রাপ্ত হয়। যেমন—

১। ব্যক্তিগত সুখের আধার সত্য। অর্থাৎ যিনি সত্যের উপর নির্মিত জীবন-যাপন করবেন তিনি ভরপুর ব্যক্তিগত সুখ উপভোগ করবেন। ফলে অন্যরাও ব্যক্তিগত সুখের প্রেরণা পাবেন। তাকে জীবন-যাপন করার জন্য কখনই ব্যক্তিগত দুঃখের মুখোমুখি হতে হবে না। এমনকি অন্য কেউ তার দ্বারা ব্যক্তিগত দুঃখের কারণও হবে না। একটি সঠিক ব্যবস্থায় এটি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ব্যক্তিগতভাবে কোনোপ্রকার দুঃখ আসে তবে ব্যবস্থার মধ্যে সত্যের অবস্থানকে যাচাই করতে হবে। আর যদি তা সত্য হয় তবে সেই ব্যক্তিকে দেখতে হবে যে সত্যকে নিয়ে তার দ্বারা কিছু ভুল হয়ে গিয়েছে কিনা বা অজ্ঞানবশত তিনি সত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন কিনা অথবা কিছু এদিক সেদিক হয়ে গিয়েছে কিনা। সেই কারণকে বুঝে নিয়ে জীবনে তা প্রয়োগ করে সর্বদা সে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ কোনো ভোজন খুব পছন্দ করে এবং সে তা যদি প্রতিদিন গ্রহণ করে থাকে তবে দেখা যাবে প্রথমে কিছুদিন খুব সুস্বাদু মনে হবে কিন্তু ধীরে ধীরে সেই স্বাদে ভিন্নতা আসতে শুরু করবে। তারপরও সে যদি ওই ভোজন একইরকমভাবে গ্রহণ করতে থাকে তবে কিছুকাল পর থেকে সে দুঃখের সম্মুখীন হতে থাকবে। এমনটি হলে তা হবে ব্যক্তিগত দুঃখ। এইজন্য তাকে সত্যের উপর যে জ্ঞান রয়েছে তা যাচাই করা উচিত। বোঝা উচিত যে কোথাও না কোথাও সে সত্যের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। আমি এবার এইস্থানে উল্লেখ করছি এই বলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি যে সংসার হচ্ছে পরিবর্তনশীল এবং আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও পরিবর্তনশীল। যদি আমরা নিজেদের বিষয়গুলিকে নিরন্তর পরিবর্তন না করি তবে ধীরে ধীরে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিও সংবেদনহীন অনুভব হতে থাকবে এবং এটিই সত্য। তাহলে আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝে নিয়ে সঠিক সময়ে নিজেদের রুচিগুলিকেও বদল করে নেওয়া প্রয়োজন। এমনটি করলে আমাদের ব্যক্তিগত সুখ অধিক পরিমাণে থাকবে। এইভাবে সকল প্রকার ব্যক্তিগত সুখকে বুঝে নিতে হবে।

২। পারিবারিক সুখের আধার হচ্ছে প্রেম। প্রেমের মাধ্যমে কারোর সাথে দীর্ঘ সময় ব্যতীত করলে আমাদের বিভিন্ন প্রকার সুখ প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ পারিবারিক সুখ উপভোগের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন একে অপরের সাথে থাকতে চায়। যখনই পরিবারের কোনো সদস্যের মধ্যে কিছু সমস্যা উৎপন্ন হবে তা সমাধান করার জন্য সত্যের সাথে প্রেমের অবস্থার নিরীক্ষণও করে নেওয়া উচিত। কেননা কোনো সমস্যা তখনই উৎপন্ন হয় যখন সত্যের নিয়ম ভঙ্গ হয় অথবা যখন তাদের মধ্যে প্রেমের ঘাটতি দেখা দেয়। তাই সত্যের সমাধান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই করা সম্ভব। যদি প্রেমের ঘাটতি হয়ে যায় তবে আলাদা হওয়া ছাড়া সমাধানের অন্য কোনো উপায় নেই। সেইজন্য যদি পরস্পরের মধ্যে প্রেম থাকে তবেই পরিবারের সদস্য হিসেবে একসাথে থাকা উচিত। অন্যথায় সেই স্থান থেকে প্রস্থান করা উচিত এবং তাকে অন্য কোনো নতুন পরিবারের খোঁজ করা উচিত। সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থায় এটি স্বাভাবিকভাবেই হবে। কেননা সঠিক শিক্ষা থাকলে এবং সঠিক ব্যবস্থা থাকলে সকলেই সত্য ও প্রেমের আধারে নেওয়া সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করবে। আর অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলিও এমন হবে যে ওই স্থান থেকে প্রস্থান করা। ব্যাস! এই প্রকার প্রেমের ভাবকে এভাবে যাচাই করে জানতে হবে যে প্রেমের অবস্থাটি ঠিক কেমন রয়েছে। অর্থাৎ একসাথে থাকার ইচ্ছে রয়েছে না পূরণ হয়ে গেছে। উত্তর যদি প্রথমটি হয় তবে সাথে থাকুন। যদি পূর্ণ হয়ে যায় তবে আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত। এইজন্য প্রেমই হবে পরিবারের আধার। যতক্ষণ অবধি প্রেম থাকবে ততক্ষণ অবধিই পরিবার থাকবে। প্রেমের সমাপ্তি ঘটলে তো একসাথে থাকার কোনো অর্থ নেই। যদি কোনো কারণে থাকতে হয় তবে তা দুঃখদায়ী হবে।

৩। সামাজিক সুখের আধার হচ্ছে ন্যায়। ন্যায়ের অর্থ হচ্ছে এই পৃথিবীতে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সকলের জন্য সমান থাকবে এবং সামাজিক হবে। অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সরকারের অধীন থাকবে। যেন সরকার ন্যায়পূর্ণভাবে সব সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন করতে পারে। ন্যায় বলুন আর সমতা বলুন দুটো একই কথা। সমতার মাধ্যমেই ন্যায় সম্ভব। অসমান সমাজে অপরাধকে কেউ দমন করতে পারবে না। আর সমতাযুক্ত সমাজে অপরাধের কোনো অর্থই থাকে না। সেইজন্য যদি সামাজিক সুখ উপভোগ করতে হয় তাহলে সমতা এবং ন্যায়কে বুঝুন। এতে সকলের জন্য সুখ অধিকতর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সমাজে ন্যায়ের উপর নির্মিত জীবন-যাপন করবে সেই নাগরিকের কাছে সামাজিক সুখ ভরপুর থাকবে। আর এই সামাজিক সুখ প্রাপ্তির কারণেই বাস্তবে পারিবারিক সুখ এবং ব্যক্তিগত সুখ প্রাপ্ত হয়। যে সমাজে সমতা থাকে না সেই সমাজে পারিবারিক সুখ ও ব্যক্তিগত সুখ সঠিকভাবে প্রাপ্ত হতে পারে না। আর সুখ যদিওবা আসে তা দুঃখ সঙ্গে নিয়ে আসে। আবার তারাই বলতে থাকে যে সুখ আর দুঃখ একই মুদ্রার দুটো পিঠ। যা

কিনা ভূল ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপন্ন অবস্থা। এটি সঠিক সমতাযুক্ত অবস্থা নয়। সঠিক ব্যবস্থায় তা স্বাভাবিকরূপেই হবে।

৪। সমষ্টিগত সুখের আধার হচ্ছে পুণ্য। অর্থাৎ সমাজের সকল সমষ্টি যদি পুণ্যের উপর নির্মিত জীবন-যাপন করে তবে সমষ্টিগত সুখ ভরপুর থাকবে। সমাজকে কোনোপ্রকার সমষ্টিগত দুঃখের মুখোমুখি হতে হবে না। আবার এক সমষ্টিতে অন্য কোনো সমষ্টির কারণে দুঃখ বা অসমতার সৃষ্টি হবে না। আর সঠিক ব্যবস্থায় তা স্বাভাবিকরূপেই হবে।
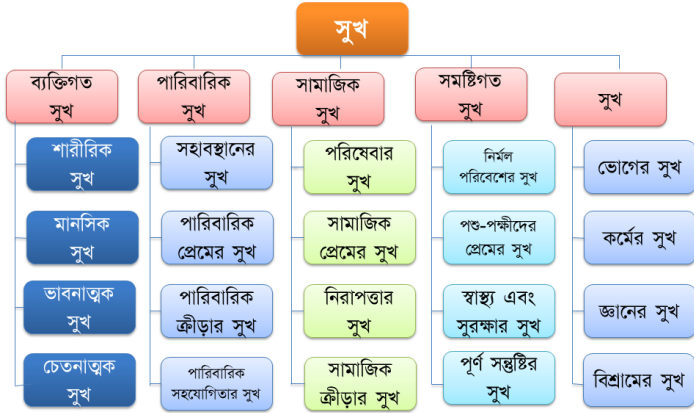
এই চার প্রকার সুখও একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যদি সামাজিক ব্যবস্থা সঠিক হয় তবে তা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে বড় প্রভাব ফেলে। এইজন্য আমাদের একটি সঠিক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার উপরই কর্ম করা উচিত। আসুন এবার এই নতুন ব্যবস্থার আধারকে এক এক করে বোঝার চেষ্টা করি।

***

অধ্যায় ৫

সুখের আধার

সত্য

সত্য এটিই যে আমরা সকলে একই মূল তত্ত্ব থেকে বিস্তৃত হয়েছি। বাহ্যিক দিক দিয়ে ভিন্ন মনে হলেও আমরা সকলে মূলত একটি বৃহৎ মালার পুঁতির মতই গেঁথে রয়েছি। সাধারণ চোখে দেখলে মনে হবে আমরা সকলে ভিন্ন এবং একে অপরের থেকে পৃথক। যদি জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখা যায় তবে জানা যাবে এটি মূলত অর্ধসত্য। সম্পূর্ণ সত্য এই যে আমরা পৃথক হয়েও মূলত একই। সাংসারিক চোখে আমাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় কিন্তু জ্ঞানের চোখ দিয়ে দেখলে মনে হবে তা একীভূত। আমরা সকলে সেই বৃক্ষের মত যার শাখা অনেক কিন্তু মূল এক। আমাদের সকলের উদ্দেশ্যও এক, সেটি হচ্ছে আমাদের ইপ্সিত সুখকে নিরন্তর গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত সুখ সকলের ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। সকলের পছন্দ-অপছন্দও ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। সকলের প্রবৃত্তি ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। একই বস্তু দ্বারা কেউ সুখ এবং কেউ দুঃখ পেতে পারে। আবার একই বস্তু থেকে কেউ ভিন্ন-ভিন্ন সময় কখনো সুখ এবং কখনো দুঃখ পেতে পারে। এই পরিবর্তনশীল সংসারে সমস্তকিছুই পরিবর্তনশীল এটিও তো সত্য। আর প্রকৃতির মধ্যে যত জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আবিষ্কার হবে সবই সত্যের অধীনে আসবে। এই সত্যকে কখনো অবহেলা করা উচিত নয়। তাহলে পরিণাম হিসেবে জীবনে দুঃখই আসবে। তখন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে বেড়াতে হবে। তারপরও সেই পথ মিলবে না, কারণ এমন কিছু তো বাস্তবে হয় না। কেননা সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রেম

সত্যের জ্ঞান থেকেই প্রেমের উৎপত্তি হয়। প্রেম হচ্ছে একে অপরের প্রতি সম্বন্ধ। আর সম্বন্ধ নির্ভর করে এই বিষয়ের উপর যে দুজনের সম্পর্ক একে অপরের প্রতি কতটা উপযোগী। যে যার প্রতি যতটা উপযোগী হবে তাদের মধ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ এবং ততটুকুই সম্বন্ধ থাকবে। এই সম্বন্ধকেই প্রেম অথবা প্রেমের আকর্ষণ বলা হয়ে থাকে। যখন আমরা একে অপরের উপযোগিতার তাৎপর্য বুঝতে পারি এই ভেবে যে আমাদের সুখ পরস্পরের যোগদান ছাড়া সম্ভব নয় তখনই অন্যের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয়। এই আকর্ষণকেই প্রেম বলা হয়। এই উপলব্ধি যে স্তরের হবে তার ভেতর সেই স্তরের প্রেম উৎপন্ন হবে। ব্যক্তিগত স্তরে যেহেতু আমরা একা সেহেতু সেখানে সম্পর্ক তৈরির জন্য অন্য কেউ থাকে না। তবে পারিবারিক স্তরের প্রেমকে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যখন স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী সুখ পেতে থাকে তখন তার প্রেম হতে থাকে। তখন সে বুঝে যায়, স্ত্রীর কাছ থেকে যেমন সুখ পাচ্ছি সেই প্রকার সুখ স্ত্রী ব্যতীত উপভোগ করতে পারব না। সামাজিক স্তরের সুখকেও আমরা একইভাবে বুঝে নিতে পারি। যদিও সামাজিক স্তরের সুখকে অনুভব করা একটু কঠিন হয়ে যায় কেননা বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে সমাজের ভিন্ন-ভিন্ন যোগদান থাকে। যিনি বুঝতে পারেন তিনিই তা অনুভব করতে পারেন। এইজন্য বলা হয় বাস্তবিক জ্ঞান থেকেই প্রেম উৎপন্ন হয়। যখন আমাদের ভেতর প্রেম উৎপন্ন হবে কেবলমাত্র তখনই তা অনুভব করতে পারব তার পূর্বে নয়। যেমন কোনো একটি অনুভব তখনই হয় যখন সেই বিষয় সম্পর্কিত কোনো ঘটনা ঘটে থাকে। অর্থাৎ অপরের যোগদান ছাড়া আমরা সামান্য সুখই উপভোগ করতে পারি। তাও বহু সংঘর্ষের পর। সুতরাং পারস্পরিক নির্ভরতার জ্ঞান থেকে একে অপরের প্রতি প্রেমের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সে বুঝতে পারে অপরের সান্নিধ্য ছাড়া সম্পূর্ণরূপে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। আর তখন অপরের গুরুত্বও অনুভব করতে পারে। যার ফলে তার সাথে অপরের প্রেম হয়ে যায়। যেমন বৃক্ষের মূল এবং শাখার সাথে যে সম্বন্ধ সেটিই প্রেমের সম্বন্ধ। পারিবারিক সুখ প্রাপ্তির জন্য প্রেমই হচ্ছে আধার। পরিবারের অর্থ হচ্ছে দুই বা অধিক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় অবধি একসাথে থাকতে চায়। দীর্ঘ সময় অবধি থাকার ফলেই পারিবারিক সুখের উদয় হয়। এইজন্য পরিবার নামক কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রেমকে বুঝতে হলে এইভাবে জানতে হবে যে কারোর সান্নিধ্য পেয়ে যখন সুখ প্রাপ্তি হতে থাকে এবং তার সাথে ক্রমাগত বসবাস করার ইচ্ছে তৈরি হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছে থাকবে ততক্ষন অবধি সেই সুখও যেন প্রাপ্তি হতে থাকে। এই রকম আকর্ষণকেই প্রেম বলা হয়। মূলত এটিই হচ্ছে প্রেমের সাধারণ পরিভাষা। কিছুদিন

পর সেই সামান্য প্রেম গভীর হতে থাকে। তখন কেবলমাত্র নিজের সুখ প্রাধান্য পায় না বরং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সুখও প্রাধান্য পেতে থাকে। একেই পারিবারিক প্রেম বলে। এরপর প্রেমের বোধ আরো প্রসারিত হলে তা সামাজিক হতে থাকে এবং তারপর সমষ্টিগত হতে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রেম, পারিবারিক প্রেম, সামাজিক প্রেম এবং সমষ্টিগত প্রেম। প্রেমের এই চারটি স্তর রয়েছে। প্রথমত— নিজের প্রতি প্রেম, দ্বিতীয়ত—পরিবারের প্রতি প্রেম, তৃতীয়ত— সমাজের প্রতি প্রেম এবং চতুর্থত— সমষ্টির প্রতি প্রেম। যে স্তরের জ্ঞান ও বোধ হবে সেই স্তরের প্রেম হবে। যে স্তরের প্রেম হবে সেই স্তরের কর্ম হবে। যে স্তরের কর্ম হবে সেই স্তরের পরিণাম আসবে। এর মাধ্যমেই কারোর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হবে।

ন্যায়

ন্যায়বান মনুষ্যের অর্থ হচ্ছে যিনি সক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত করেছেন। অর্থাৎ যার মধ্যে চিন্তন-মনন করার সামর্থ্য তৈরি হয়েছে। যিনি কোনোকিছুর অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। মন দ্বারা সঠিক অর্থ অনুধাবন করে আমরা ন্যায়কেও বুঝে নিতে পারব। ন্যায়ের অর্থ হচ্ছে সকলে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সমস্তকিছু পেয়ে যাবে যার দ্বারা তারা সুখী হতে চায়। সম্পূর্ণরূপে সুখী হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। আর যে ব্যবস্থা থেকে সকলে নিজেদের অভীষ্ট সুখ পেয়ে যাবে এবং নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে তাকেই ন্যায়কারী ব্যবস্থা বলা যাবে। সেই ব্যবস্থাকেই আমরা ন্যায়কারী ব্যবস্থা বলব যার মাধ্যমে সমাজে 'ন্যায়' স্থাপিত হবে। এখানে যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে সেসবের উপর সকলের সমান অধিকার রয়েছে। এবার সকলে এই সমান অধিকার কীভাবে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য অধিকার এবং কর্তব্যের নির্ধারণ করতে হবে। এইজন্য ন্যায়কেই আধার হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত। এবার এইকথা বুঝে গিয়েছেন যে ব্যক্তিগত সামর্থ্য দ্বারা সংসারের সমস্ত রকমের সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি পরিবার দ্বারাও সমস্তরকম সুখ উপভোগ করা সম্ভব নয়। তখন তিনি সকলের সহযোগিতার অভাব অনুভব করেন এবং চান সকলে একসাথে থাকুক। এমন অবস্থা হলে বুঝতে হবে তিনি সামাজিক হয়ে গিয়েছেন এবং সমাজের অর্থ বুঝতে পেরেছেন। এই সমস্ত জ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা উচিত যেন সকলে একটি ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। তা অবশ্যই হবে একটি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী ২৫ বছর বয়স পূর্ণ হবার পূর্বেই।

যদি কেউ নীতিনিয়মকে জানে না কিংবা বোঝে না তখন তার কাছে এমন আশা কীভাবে করা যায় যে এটিকে সে পালন করবে? বিশেষ করে আমরা এখানে যেমন সরকারের কথা বলছি তেমন সরকারি ব্যবস্থা সামাজিক স্তর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। এই সরকারের উচিত কর্ম হবে ন্যায় ব্যবস্থাকে স্থাপন করা এবং পরিচালিত করা। তবেই সকল কর্ম এবং অধিকারের ন্যায়পূর্ণ সমাধান হতে পারে। যদি আমরা এই প্রকার ন্যায় ব্যবস্থা নির্মাণ না করি তবে দুঃখী জীবন কাটানোর জন্য তৈরি থাকা উচিত। আর ন্যায় নিয়ে শুধুমাত্র বাক্য বিনিময় করলে অথবা সংবিধানে লিখে দিলেই বাস্তবায়িত হয়ে যায় না। তার জন্য এমন কিছু বিধান তৈরি করতে হয় যার দ্বারা ন্যায় ব্যবস্থা যেন বাস্তবে রূপায়িত হয় এবং সকলে সুখী হতে পারে। যে মানুষের যতটা জ্ঞান অর্জনের রুচি থাকবে সে ততটা জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারবে, যতটা কর্ম করার ইচ্ছে থাকবে ততটা কর্ম সে পেয়ে যাবে, যতটা ভোগ করার ইচ্ছে থাকবে ততটা ভোগ তার প্রাপ্তি হবে, যতটা বিশ্রাম করার ইচ্ছে থাকবে ততটা বিশ্রাম সে পেয়ে যাবে। ব্যস এটিই হচ্ছে ন্যায়। আর তা সকলের জন্য সম্ভব হয়ে গেলে তবেই সঠিক সমতা রয়েছে এমনটি বলা যাবে। যদি প্রাথমিক স্তরেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যায় অর্থাৎ সরকারের সবকিছু ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে আদালত ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ন্যুনতম হয়ে যাবে। যে ব্যবস্থায় আদালত ইত্যাদির অধিক প্রয়োজন হয়ে থাকে বুঝে নিতে হবে সেই ব্যবস্থা ততটাই অন্যায়পূর্ণ। কোনো ব্যবস্থাকে পরিমাপের জন্য এটি হচ্ছে একপ্রকার মাপকাঠি। যদি সকলে সবকিছু পেয়ে যায় তবে কেনই বা কেউ চুরি-ছিনতাই ইত্যাদি করবে? কেননা সমস্ত অপরাধ মূলত সুখী হবার জন্যই করা হয়ে থাকে। এমন ব্যবস্থা থাকলে আদালতের প্রয়োজন পড়বে কেন? তাহলে তো সকলেই সুখ-শান্তি এবং আরামের জীবন উপভোগ করত। ন্যায়ের মূলত এটিই হচ্ছে অর্থ।

পুণ্য

যেহেতু আমরা সকলে নিজেদের মত করে জীবন-যাপন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি সেহেতু আমাদের আজ্ঞাতসারে এমন অনেক কর্মের সম্ভাবনা রয়ে যায় যার ফলে সৃষ্টির বিভিন্ন চক্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাহলে এমন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই বর্তমান থাকুক। যেন ক্ষতিও ন্যুনতম থেকে ন্যুনতম হয়। দ্বিতীয়ত, তারপরও যদি ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ সেসবের সমাধান করে নেওয়া উচিত। এমনতর উপায়কেই পুণ্য কর্ম বলা হয়। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থা থেকে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো জনগণের মাধ্যমেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা হতে

পারে। তবে হ্যাঁ, প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে এমন প্রয়াস সকলেকে করা উচিত যেন প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট না হয়। তবে এটিই বোঝা গেল যে সমষ্টির আধার পুণ্যই হওয়া উচিত।

সঠিক ব্যবস্থার মাপকাঠি

সুখের এই সকল পুষ্প যা সত্য, প্রেম, ন্যায় এবং পূণ্যের মাধ্যমে তখনই প্রস্ফুটিত হবে যখন এই সংসারে একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে। পরিপূর্ণ ব্যবস্থার অভাবের ফলে তা বিকশিত হতে পারে না। আর মন্দ ব্যবস্থায় যদি কেউ তাকে বিকশিত করার চেষ্টা করে তবে সমাজ অধিক দুষিত হতে থাকে, যার ফলে দুঃখ অধিক বেড়ে যায়। এইজন্য যারা নিজের জীবনে বা অন্যের জীবনে বলপূর্বক নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তারা আজ্ঞাতসারে দুঃখকে অধিক বাড়িয়ে তোলেন। আর এমন লোকদের পরিবারবর্গও অনেক প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হয়। সাধারণভাবে দেখলে এমন মনে হবে তারা অনেক মহান ব্যক্তি। কিন্তু বলপূর্বক নিয়ে আসা এই মহানুভবতার পরিণাম কেবলমাত্র দুঃখই বয়ে নিয়ে আসে। তাহলে খেয়াল রাখতে হবে এই চার ধরনের পুষ্প কেবলমাত্র একটি সঠিক ব্যবস্থারই পরিণাম হতে পারে। যেমন ব্যবস্থা হবে তেমন আমাদের অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে। নৈতিকতার এই চার পুষ্প একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থার সঠিক অবস্থা। এখনো অবধি যদি তা প্রস্ফুটিত না হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা এখনো আসেনি। এই পুষ্পদেরকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত। যে ব্যবস্থায় এই পুষ্পগুলি বিকশিত হবে সেই ব্যবস্থাকেই পরিপূর্ণ ব্যবস্থা বলা হবে। নাহলে ততক্ষন অবধি আমাদের বর্তমান ব্যবস্থাকে বদলে ও শুধরে নেওয়া উচিত। আর এই শোধরানো বা বদলের প্রক্রিয়া ততক্ষন পর্যন্ত বন্ধ করা উচিত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই চার প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত না হয়। সঠিক শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। সত্যের আধারেই কোনো জ্ঞানী মানুষ সঠিক ব্যবস্থার নির্মাণ করেন এবং সকলের অনুমতি নিয়ে তা বাস্তবায়িত করেন। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা এক সঠিক অবস্থার নির্মাণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ যার মাধ্যমে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে সুখ, শান্তি, সন্তুষ্টি ও মোক্ষ প্রাপ্তি হতে থাকে। সমাজেও তখন ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই কারণে আমাদের মধ্যে সঠিক আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে প্রেম উৎপন্ন হতে থাকে। ন্যায় স্থাপিত হলে পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সে বুঝে যায় এখানে যে সমতা রয়েছে তার মুলে রয়েছে সমষ্টি। তখন সে সমষ্টির ভারসাম্যের খেয়াল রাখে যা পূণ্যের প্রক্রিয়া দ্বারাই সম্ভব। সমষ্টির ভারসাম্যহীনতাকে সঠিক সমতায় নিয়ে আসার জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে পুণ্য বলা হয়। যেমন আপনি এমনভাবে জীবন-যাপন করুন যেন অসুস্থই না হন। তখন এমন জীবনকে পুণ্যময় জীবন বলা যাবে। অথবা আমাদের শরীর যখন অসুস্থ্য হয় তখন সুস্থ্য

হবার জন্য আমরা চিকিৎসা ইত্যাদি গ্রহণ করি তখন তাকে পূণ্যের শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে জঙ্গলের উদ্ভিদ শুকিয়ে গেলে পশু-পক্ষীরা দুঃখী হয়ে গেল। তখন তাদের দুঃখ দূর করার জন্য জঙ্গলে একটি নালা তৈরি করে জল সেঁচের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ব্যস এটিকেই পুণ্য বলা হয়। অথবা বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে জঙ্গলে বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। দেখতে হবে কোনোপ্রকার দূষণ যেন না হয়। যদি কোনো কারণে হয়ে যায় তাকে অতিশীঘ্র দূর করার উপায় করে নেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে যেন দূষিত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে পুণ্য। চলুন অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই চার বিষয়কে বুঝে নিই।

ওটি যা এটিও হচ্ছে তাই। অর্থাৎ যা ব্রহ্ম তাই ব্রহ্মাণ্ড। যা স্রষ্টা তাই সৃষ্টি। যিনি প্রভু তিনিই বিভু। এক মূল থেকেই সমস্ত সংসার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমস্ত প্রকার সুখ উপভোগের জন্যই এক থেকে অনেক হয়েছে। প্রভু থেকে বিভু হয়েছে, স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে। এটিই মূল সত্য। মূল জ্ঞান থেকে শুরু করে সমস্ত বিজ্ঞান সবই সত্যের শ্রেণীতে আসে।

যে হৃদয়ে সাত্ত্বিক, ইতিবাচক বা শুভ ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে তাকে সৎভাব বলা হয়। যার মাধ্যমে সকলে সুখ পেয়ে থাকে। প্রচলিত ভাষায় সৎভাবকেই প্রেম বলা হয়।

যে মানব মস্তিস্কে সমতাবোধ রয়েছে সেই সমদর্শীতার উপর নির্ভরশীল সম্যক নির্ণয়শক্তিই হচ্ছে সৎবুদ্ধি। যার দ্বারা সকলে কেবলমাত্র সুখীই হয়। প্রচলিত ভাষায় সৎবুদ্ধিকেই ন্যায় বলা হয়।

সত্য, প্রেম এবং ন্যায়ের উপর নির্মিত যে একনিষ্ঠতা তাকে সৎকর্ম বলে। প্রচলিত ভাষায় সৎকর্মকেই পুণ্য বলা হয়। এর দ্বারা সমস্ত সমষ্টিতে ভারসাম্য থাকে এবং সকলে পরস্পরের কাছে থেকে সুখ পেতে থাকে। আসুন এবার প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলীর অর্থ কী তা বোঝার চেষ্টা করি।

প্রাকৃতিক কথার অর্থ

মনুষ্য জন্ম হবার পূর্বেই প্রাকৃতিকভাবে যা কিছু তত্ত্ব দিয়ে সংসার রচিত হয়েছে এবং যার নির্মাণ মনুষ্য দ্বারা হয়নি। অর্থাৎ মনুষ্য জন্মের পূর্বেই যা নির্মিত হয়ে রয়েছে তাকে আমরা

প্রাকৃতিক বলব। উদাহরণস্বরূপ যেমন গঙ্গা নদী প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। তাই একে প্রাকৃতিক বলব। আর যদি মানুষ তা থেকে কোনো উপনদী তৈরি করে নেয় তাহলে সেটি হবে মনুষ্যকৃত। যদি সঠিকভাবে তৈরি করা হয়ে থাকে তবে তাকে আমরা সাংস্কৃতিক বলব।

সাংস্কৃতিক কথার অর্থ

মনুষ্য দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে সঠিক চিন্তা ও বোধের সমন্বয়ে উৎকৃষ্টতা অর্থাৎ সকলের সুখের জন্য ভোগসামগ্রী যা প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রাপ্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হওয়া শস্য দানা চিবিয়ে খাওয়ার সুখকে বলা হবে প্রাকৃতিক। সঠিক চিন্তা ও বোধের মাধ্যমে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে শস্য দানা সঠিক প্রকারে মজুত করে রেখে দেওয়া এবং সময় ও প্রয়োজন অনুসারে সেই শস্য দানা থেকে চাল বা আটা তৈরি করে ভাত, রুটি, পরোটা, পিঠে-পুলি ইত্যাদি বানিয়ে নিয়ে অথবা অন্য কোনো ভোজন বানিয়ে তার সুখ উপভোগ করাকে সাংস্কৃতিক বলা হবে। আপনি পুরো প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন যে প্রকৃতিতে অধিকাংশ সম্পদ কাঁচা মালের অবস্থায় থাকে। তা সরাসরি ব্যবহার করে আমরা সুখী হতে পারব না। অবশ্য কিছু খাওয়া ও পান করার বস্তু ছাড়া। অবশিষ্ট সমস্ত বস্তুদের মাটি থেকে তুলে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী তৈরি করে নিতে হয়। সঠিক অর্থে দেখলে বোঝা যাবে যে মানুষ প্রাকৃতিকভাবে স্বর্গসম জীবন প্রাপ্ত করতে পারবে না। তারপরও যদি চেষ্টা করে তবে প্রাকৃতিকভাবে সে পশুতুল্য জীবনই পাবে। যেখানে সুখ রয়েছে ন্যুনতম। আর বিকশিত মানুষ তেমন জীবন কখনো চাইবে না। যদি তারপরও কোনো মানুষ প্রাকৃতিকভাবে থাকতে চায় তবে সে জঙ্গলে গিয়ে থাকতে পারে। কারণ প্রকৃতির উপস্থিতি তো সর্বদা রয়েছেই, এইজন্য ভিন্নভাবে কিছু করার তো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যিনি সাংস্কৃতিকভাবে জীবন-যাপন করতে চান তার জন্য তো সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা থাকতেই হবে। দুরকম ব্যবস্থাই থাকতে হবে। যে যেমনভাবে থাকতে চায় সে যেন নিজের ইচ্ছেমত থাকতে পারে এবং সুখ উপভোগ করতে পারে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তো শুরু থেকেই রয়েছে। এখন শুধুমাত্র সঠিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। যে কর্মে আমি প্রচেষ্টারত রয়েছি। পরিশেষে— যারা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সুখী জীবন উপভোগ করতে চান তারা এই অত্যাবশ্যক কাজে যেভাবে পারবেন আমাকে সহযোগিতা করুন। কেননা কোনো একজন ব্যক্তি দ্বারা এ কর্ম কখনো সম্ভব হবে না। কারণ এটি একটি সামাজিক কর্ম এবং সকলের সমর্থনের মাধ্যমে সম্পাদনের কর্ম। আর যিনি প্রাকৃতিকভাবে জীবন-যাপন করতে চান তিনি এখন থেকেই

সেইভাবে জীবন-যাপন করতে পারেন। তার জন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই এবং কখনো তা হবেও না।

***

অধ্যায় ৬

ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থা

এবার ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থাকে কিছুটা বুঝে নিই। কারণ সমস্তকিছুর মূলে রয়েছে অর্থব্যবস্থা। যে কোনো দেশের সমস্ত কর্ম অর্থের উপর নির্ভরশীল থাকে। কোনো কার্যই অর্থ ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। যদি অর্থব্যবস্থা ন্যায়শীল হয় তবে দেশের সমস্ত কর্মও ন্যায়পূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। নাহলে তা সঠিকভাবে সম্পন্ন হতে পারবে না অথবা সম্পন্নই হবে না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ অথবা সমষ্টির কর্ম সেই প্রকার সম্পন্ন হবে যে প্রকার অর্থব্যবস্থা সেখানে থাকবে। সংবিধানে যা লেখা রয়েছে তা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে কিনা তা অর্থব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করে। যদি আমরা ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রস্তাবনাগুলো পাঠ করি তবে জানতে পারব সংবিধান অনুযায়ী সকল জনগণের অধিকার সমান। কিন্তু বাস্তবে এমনটি রূপায়িত হয়েছে তা দেখা যায় না। আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজ ভিন্ন-ভিন্ন বর্গে বিভাজিত হয়ে গেছে যেখানে একেবারে নির্ধন থেকে বিরাট ধনী বর্গ পর্যন্ত দেখতে পাবেন। যেখানে নির্ধন ও ধনী বর্গের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু সামান্য নয় বরং এই দুই বর্গের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আমরা দেখতে পাব। দেখব যে মাত্র এক শতাংশেরও কম জনগণ ৭০ শতাংশ সম্পদের উপর দখল করে রয়েছে। আর তা সত্ত্বেও আমরা এমন ভূল বিধানকে সংবিধান বলে আসছি। যেখানে সমান বলে কিছুই দেখা যায় না। আবার এমনটিও নয় যে কোনো সরকার চেষ্টা করেনি। সকলেকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সমস্ত সরকার সাধ্যমত চেষ্টাও করে থাকে। কিন্তু ভুল অর্থশাস্ত্রের কারণে তারা অধিকাংশ জনতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এই কারণেই সরকার বার বার বদলাতে থাকে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল জনতার আবেগকে কাজে লাগিয়ে দলে যুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও অসন্তুষ্ট জনতাকে কোনো দল বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। কেননা প্রতিটি ব্যক্তি ভালোভাবে জীবন-যাপন করতে চায়। উপরের আলোচনা থেকে আমরা এটি বুঝতে পেরেছি যে কোনো কর্মকে ন্যায়শীলভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থা ছাড়া আর্থিক সমতা সম্ভব নয়। আর আর্থিক সমতার অভাবে অন্যান্য স্বাধীনতাও সম্ভব হতে পারে না। যে কারণে জনগণের একটি বড় অংশ অসন্তুষ্ট থাকে। তাই সব ধরনের অপরাধ ঘটতে থাকে। ছোট বড় যুদ্ধ চলতে থাকে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতাও অবিরত চলতে থাকে। নিরন্তর মানুষের ভেতরে এবং বাইরে অশান্তি লেগে থাকে। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে নিরন্তর সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। মোট কথা নির্ধন বর্গ অত্যন্ত দুঃখে জীবন-যাপন করতে বাধ্য থাকে। অপরদিকে ধনী বর্গও অনেক প্রকার সমস্যার মধ্যে ঘিরে থাকে। সেইজন্য চলুন একটি ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থা স্থাপন করার চেষ্টা করি। যার নির্মাণ আমি করে দিয়েছি। আপনারা সকলে এই পুস্তক অধ্যয়ন করলেই তা বুঝতে পারবেন। এখন এই ব্যবস্থাটিকে প্রতিষ্ঠিত করাই কেবলমাত্র অবশিষ্ট কর্ম হিসেবে রয়েছে যা নির্ভর করছে জনগণের উপর। যদি সমস্যাবিহীন সুখসম্পন্ন জীবন উপভোগ করতে হয় তবে এই নতুন ব্যবস্থাকে নিয়ে আসুন, অন্যথা যেমন আছেন তেমন থাকুন। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা জনগণের উপর। তবে হ্যাঁ এখন আর বলতে পারবেন না কোনো সমাধান আমাদের কাছে নেই তাই কিছু করার নেই। আসুন এই ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থাকে বুঝে নিই।

অর্থের পরিভাষা

যেসব বস্তু বা পরিষেবার মাধ্যমে আমরা সুখ অনুভব করি তাদের অর্থের শ্রেণীতে রাখব। আর যেসব বস্তু বা পরিষেবার মাধ্যমে দুঃখ অনুভব করি তাদের অনর্থের শ্রেণীতে রাখব।

জ্ঞান থেকে যে সুখ প্রাপ্তি হয় তা যেমন আমাদের কাছে অর্থ; তেমনি কর্ম থেকে যে সুখ পাওয়া যায়, ভোগ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় এবং বিশ্রাম থেকে যে সুখ পাওয়া যায় সেটিও আমাদের জন্য অর্থ। বিশ্রাম করার জন্য যে পরিবেশ ও পরিষেবার প্রয়োজন হয় যেখানে আমরা ভালোভাবে বিশ্রাম করতে পারব সেইরকম সুখসুবিধাও আমাদের জন্য অর্থ। আর এর বিপরীতে যা কিছু থেকে দুঃখ অনুভব হয় সেইসব আমাদের জন্য অনর্থ। এইবার প্রথম কথা হল এই 'অর্থ' নির্মাণের ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় যা ন্যায়শীল হবে। অর্থাৎ অর্থের নির্মাণ হবে শুধুমাত্র সুখের জন্য। এমনটি নয় যেমন করে অতীতে রাজা-বাদশারা বলপূর্বক প্রাসাদ বা মহল ইত্যাদি নির্মাণ করাতো। ওইসব নির্মাণ অন্যায়পূর্ণ ছিল। এখন তো মূল কষ্টিপাথর আমাদের কাছে রয়েছে তা হল সুখ। যদি ওইসব নির্মাণ সকল মানুষের সুখের জন্য হতো তবে তাকে ন্যায়কারী নির্মাণ বলা যেত। এইজন্য আমাদের জানতে হবে কতপ্রকার পদার্থ বা পরিষেবা আমাদের কাজে লাগে যা থেকে আমরা সুখ পেয়ে থাকি এবং যাকে আমরা অর্থ বলতে পারি। এদের মোট চার প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। কৃষির মাধ্যমে প্রস্তুত করা বস্তু অথবা প্রদান করা পরিষেবা, শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রস্তুত করা বস্তু অথবা প্রদান করা পরিষেবা, প্রশাসনের মাধ্যমে প্রস্তুত

করা বস্তু অথবা প্রদান করা পরিষেবা এবং নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রস্তুত করা বস্তু অথবা প্রদান করা পরিষেবা। এই চার প্রকার অর্থকে সুখপূর্বক কীভাবে নির্মাণ করা যেতে পারে তা আমরা এই পুস্তক থেকে জানব। দ্বিতীয় কথা যেটি জানব তা হল সুখপূর্ণভাবে অর্থের বণ্টন কীভাবে হবে যেন তা সকলের ইচ্ছে অনুযায়ী তাদের কাছে পৌঁছে যায়। এইসব বিষয়ও অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত। যা পরবর্তী অধ্যায়ে এই পুস্তক থেকে আপনারা জানতে পারবেন।

কৃষিক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছে ও যোগ্যতা অনুযায়ী যারা কর্ম করবে এবং যা কিছু উৎপাদন করবে তার সব তথ্য প্রশাসনের কাছে থাকবে। কেননা চাহিদা সংক্রান্ত সকল তথ্য সরকারের কম্পিউটারে থাকবে। কোন কোন বিভাগ থেকে সমাজের জন্য কোন বস্তুর কতটা চাহিদা রয়েছে এইসব তথ্যও সরকারের কাছে থাকবে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতেই সরকার চাহিদা, নির্মাণ এবং বিতরণের কর্ম পরিচালনা করবে। এই নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত রকমের চাহিদা সরকার সরাসরি জানতে পারবে। সরকার এই চাহিদার ভিত্তিতে নির্মাণ কর্ম সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করবে। একইভাবে উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রেও কোনো বস্তু ও পরিষেবা কোনো বিভাগ থেকে কতটা চাহিদা রয়েছে সেই মত সরকার বস্তু ও পরিষেবার নির্মাণ এবং বিতরণ করবে। সরকারের এই প্রকার নীতি থাকার ফলে কোনো বস্তু ও পরিষেবা কমও পড়বে না আবার প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্তও হবে না। সর্বদা সমতা বজায় থাকবে। কেননা চাহিদার আধারে বস্তু এবং পরিষেবা নির্মাণ করা হবে। মূল্যবৃদ্ধি নামক সমস্যা থেকে চিরকালীন মুক্তি মিলবে। কৃষিক্ষেত্রের জন্য চাষি ভাইদেরকে যেহেতু ঋতু বা পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয় তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন করা হবে। কেননা বর্তমানে দেখা যায় কোথাও খরা বা অন্য কোনো দুর্যোগ দেখা দিলে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের জন্য সরকারের কাছে কোনো সমাধান থাকে না। এই সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেলে কৃষিক্ষেত্রে অধিক উৎপাদন করার প্রয়োজন পড়বে না। এইভাবে অন্যান্য বিভাগেও সরকার সমতা বজায় রাখতে পারবে। প্রথমে যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা জানাবে তাকেই প্রথমে বিতরণ করা হবে। ধারাবাহিক নম্বরের ভিত্তিতে বিতরণ করা হবে। প্রশাসনিক সুখসুবিধা তো রাজনৈতিক ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে এমনিতে সকলে পেয়েই যাবে। যেমন— সড়ক, আবাস, বিদ্যুৎ, জল ইত্যাদি। শিক্ষণ-প্রশিক্ষণও সকলে তাদের রুচি ও ইচ্ছে অনুযায়ী পেয়ে যাবে। সংরক্ষণও সকলে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পেয়ে যাবে। মূল সম্পদ বা প্রাকৃতিক সম্পদ যাই বলুন সে তো সকলের জন্য সমানভাবেই থাকবে। যার কোনো মূল্য নির্ধারণ করা থাকবে না। কেননা তার জন্য তো ভিন্নভাবে কেউ শ্রম ব্যয় করেনি। সকল প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার। সে মনুষ্য হোক বা অন্য জীবজন্তু। অর্থাৎ এইসবের তো কোনো মূল্য হয় না। কিন্তু কোনো মনুষ্য দ্বারা যখন

কোনো বস্তু এবং পরিষেবা নির্মাণ করা হয় তখন সেখানে মনুষ্যের শ্রমের প্রয়োজন হয়। তার শক্তি ও সময় ব্যয় হয়। এতে প্রতিটি নির্মিত বস্তু ও পরিষেবার একটি মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এর অর্থ পরিশ্রমই হচ্ছে একমাত্র পুঁজি যার মাধ্যমে নির্মিত বস্তু বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারিত হয়। এছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। তাৎপর্য এই দাঁড়াচ্ছে যে যদি আমরা কোনো বস্তু বা পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করার জন্য অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োগ করি তাহলে তা অন্যায় হবে। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় তো শ্রমের মূল্যাংকন করার প্রয়োজনই পড়বে না। কারণ যার যখন যেমন প্রয়োজন নতুন ব্যবস্থার কাছে দাবী করতে পারবে এবং তা পেতে থাকবে। তাহলে শ্রমের মূল্যাংকন করার তো কোনো অর্থ থাকছে না। এই নতুন ব্যবস্থায় না তো কোনো অর্থ-মূল্যের স্থান রয়েছে না কোনো শ্রম-মূল্যের স্থান রয়েছে। যার যা প্রয়োজন সর্বদা তারা পেতেই থাকবে। এইভাবে সকলে সমানভাবে সুখী হয়ে যাবে। এই নতুন ব্যবস্থা তৈরি করার উদ্দেশ্যও তো তাই। আমরা বলতে পারি— যে ব্যবস্থা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূরণ করে দেয় সেই ব্যবস্থাকেই ন্যায়শীল ব্যবস্থা বলা যাবে। এবং সেই অর্থশাস্ত্রকেও ন্যায়শীল অর্থশাস্ত্র বলা যাবে। আজ অবধি যে সকল অর্থশাস্ত্র এসেছে তা মনুষ্য জীবনের লক্ষ্যকে পূরণ করতে পারেনি এবং তা করতে পারবে এমন কোনো আশাও দেখা যাচ্ছে না। তাহলে আজ পর্যন্ত যে অর্থশাস্ত্র চলে আসছে তাকে তো অন্যায়কারীই বলতে হবে। বরং একে বিধ্বংসী অর্থশাস্ত্র বলা উচিত। কারণ এর জন্য মানুষ একে অপরের শত্রু হয়ে উঠেছে। একজন আরেকজনকে বিনাশের কাজে লেগে রয়েছে।

ন্যায়শীল অর্থব্যবস্থার মুখ্য বিষয়সমূহ

১. আর্থিক কর্মকাণ্ডের তিনটি বাস্তবিক স্বরূপ নির্ধারণ— চাহিদা (Demand), উৎপাদন (Production) এবং বিতরণ (Supply)।

2 এই তিনটি আর্থিক কর্মের ন্যায়শীল সঞ্চালন।

৩. আর্থিক নিয়মনীতি ও সিদ্ধান্তকে ন্যায়শীল পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা।

৪. সরকারের মাধ্যমে মুদ্রার ব্যবহার কেবলমাত্র সরকারি গণনা করার কাজেই ব্যবহার করা হবে। জনগণের জন্য এর বিশেষ কিছু গুরুত্ব থাকবে না। জনগণের যা প্রয়োজন তা তারা পেয়ে যেতে থাকবে।

৫. জনগণের জন্য শিক্ষা, জীবিকা, সুখসুবিধা এবং সংরক্ষণ— এই চারটি অধিকার ন্যায়শীল ভাবে প্রতিষ্ঠা করা।

৬. সকলের জন্য ইচ্ছে অনুযায়ী শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সকলের জন্য জীবিকা, প্রতিটি গ্রাম/নগরে সমস্ত সুখসুবিধা এবং পরিষেবা প্রদান। সার্বিকভাবে সুরক্ষার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা।

৭. রুচি অনুযায়ী জনগণের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের সিদ্ধি।

যে কোনো দেশের পক্ষে সঠিকভাবে জীবনযাপনের জন্য নিম্নলিখিত চারটি আধার আবশ্যক—

১. সম্পদ
২. সংস্কৃতি
৩. সভ্যতা
৪. সিদ্ধান্ত

সম্পদ তো প্রাকৃতিকভাবে সংসারের মধ্যেই রয়েছে। এই সম্পদের উপর সকলের সমান অধিকার রয়েছে। স্থুল শরীর নিয়ে জীবন নির্বাহ করার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সকলের সমানভাবে রয়েছে।

এরপর প্রয়োজন হয় সংস্কৃতির অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের। যার দ্বারা সকলের ব্যক্তিত্ব নির্মিত হয়। কোনো এক অশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে আমরা এমন কিছু আশা করতে পারি না যার কাছে কোনো জ্ঞান নেই। উপরে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা একে অপরের সাহায্য নিয়েই সুখী জীবন উপভোগ করতে পারি। একা একা নয়। জীবন কী, কীভাবে কাটানো উচিত, কার প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি শেখানোর জন্য কোনো একটি মাপদন্ডযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োজন। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে সংস্কৃতির আধারে সংস্কারযুক্ত করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সকল মনুষ্য একে অপরের সাথে যেন সহজেই সহযোগিতা করতে পারে। এরজন্য সঠিক আধার হতে পারে শিক্ষা। এমন নয় যে কোনো মানুষ মন্দ হয়ে গেছে আর শিক্ষার মাধ্যমে তাকে শোধরাতে হবে। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে ভালো হয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এটিই হবে যে সেইসব নিয়মনীতি সম্পর্কে শিশুদের অবগত করানো যার আধারে সমাজে বসবাস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শিশুকে পথে চলাচলের নীতিনিয়ম না বলা হয় তবে পথে চলাফেরা করার সময় সে বুঝতে পারবে না তাকে কী করতে হবে। সে বিভ্রান্ত হবে অথবা নিজের মত করে চলার চেষ্টা করবে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটবে। এবং নিজের জন্য ও অন্যের জন্য দুঃখ বয়ে আনবে। এখানে শিক্ষা যেটি করবে তা হল তাকে পথে চলাফেরা

করার নীতিনিয়ম সম্পর্কে অবগত করাবে এবং তার অভ্যাস করাবে। এখন আমরা বুঝে গিয়েছি যে শিক্ষা কাউকে শোধরানোর জন্য নয় বরং উপযোগী জ্ঞান প্রদান করার জন্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য এটিই। এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থার সকল নীতিনিয়ম ও উপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে অবগত করানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে নাকি কাউকে শোধরানো। সকলে নিজেকে শুধরে নিয়েই বসবাস করে। আর যাদের মন্দ হতে দেখা যাচ্ছে তা কেবলমাত্র ভুল ব্যবস্থার কারণে। অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলে শরীর যেমন অসুস্থ্য হয় ঠিক সেইভাবে ভুল ব্যবস্থার কারণে ব্যক্তিত্বও বিকৃত হয়ে যায়। সম্পদ সকলের কাছে থাকলে সংস্কৃতি সকলের কাছে থাকলে সভ্যতার উদয় হয়। সভ্যতার অর্থ হচ্ছে সভ্যভাবে একে অপরের পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে একা অথবা পারিবারিক অথবা সামাজিকভাবে সুখী জীবন উপভোগ করা। সহজভাবে বললে সভ্য ব্যবহার করা, নিজের কর্মকে সহজভাবে পালন করা ইত্যাদি। সুতরাং সভ্যের তাৎপর্য হচ্ছে নীতিনিয়ম অনুসারে জীবন-যাপন। সভ্যতা ছাড়া বড় সুখসুবিধা উৎপন্ন করা যায় না। সভ্যতা ছাড়া আমরা কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর জীবনযাপনের মধ্যেই রয়ে যাব। এর চাইতে অধিকতর সুখ নির্ভর করে সভ্যতা বিকাশের উপর। আমরা নিজের সাথে কেমন ব্যবহার করব, পরিবারের সাথে কেমন ব্যবহার করব, সমাজের সাথে কেমন ব্যবহার করব এবং সমষ্টির সাথে কেমন ব্যবহার করব— অর্থাৎ ব্যবহারই কোনো সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি। আর সকলের শেষে রয়েছে সিদ্ধান্ত; যার অর্থ অন্তিমরূপে সিদ্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসারে জীবন-যাপন। আমাদের সম্পদ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সভ্যতার আধার তো মূলত সিদ্ধান্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিকশিত সংস্কৃতিকেই সঠিক অর্থে সংস্কৃতি বলা যাবে। আর বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সংসারের সকল অনৈক্য একের মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছে। একটি তত্ত্বই অনেকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমরাও তো নিরন্তর সুখই পেতে চাই। তাহলে সিদ্ধান্ত এটিই যে আমরা সকলে এক থেকেই অনেক হয়েছি এবং আমাদের সকলের লক্ষ্যও এক। তা হচ্ছে সদা সুখী থাকা। তাই আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিও এই সিদ্ধান্তের আধারেই তৈরি করে নেওয়া উচিত। যদি কারোর অন্য কোনো সিদ্ধান্ত ভালো লাগে তাহলে তিনি আগাম সম্মানীয় অতিথি হিসেবে আমার সাথে চিন্তন-মনন এবং আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত। আর যদি সম্পূর্ণ আলোচনার পর এটি সিদ্ধ হয় উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ভুল তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি এই সিদ্ধান্তকে ত্যাগ করব। যে নতুন সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে তাকে গ্রহণ করব। যদি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধ হয় তবে আপনাকেও তা সহজেই স্বীকার করে নেবার জন্য তৈরি থাকতে হবে। এমনটিই আশা থাকবে আপনার উপর। তারপরও আপনি স্বতন্ত্র যে স্বীকার করবেন কি করবেন না।

***

অধ্যায় ৭

সরকারের প্রয়োজনীয়তা কেন

আমাদের জীবনে মোট চার প্রকার কর্ম রয়েছে। সেসব নিম্নে বর্ণিত হয়েছে—

১. ব্যক্তিগত কর্ম
২. পারিবারিক কর্ম
৩. সামাজিক কর্ম
৪. সমষ্টিগত কর্ম

মানুষ প্রথম দু-প্রকার কর্ম নিজের জন্য এবং ব্যক্তিগত স্তরে সম্পাদিত করে নেয়। যেমন স্নান করা, ভোজন করা, কাপড় পরা, খেলাধুলো করা, বিবাহ করা, সন্তান জন্ম দেওয়া, পরিবারের দেখাশোনা করা, ঘর তৈরি করা, ঘরের আশেপাশে অন্যান্য ব্যবস্থা করে নেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এইসব কর্মও সে সরকারি সাহায্য ছাড়া সঠিকভাবে করে উঠতে পারে না। কোনোরকমভাবে ব্যবস্থা করে নেয়। যেন চালিয়ে নেওয়া যায়। দূরবর্তী অনেক গ্রামে দেখবেন যেখানে সরকারি সুবিধা এখনো অবধি পৌঁছাতে পারেনি সেখানকার মানুষজন মিলিত উদ্যোগে সাধারণভাবে কিছু না কিছু ব্যবস্থা তৈরি করে নেয়। সেখানে সামাজিক সুখসুবিধা থাকলেও তা না থাকার মতনই। যেটুকু থাকে তা সেখানকার সমাজের সাহায্য নিয়ে করতে হয়। নাহলে সেটুকুও সম্ভব হতো না।

পরের দুটি সামাজিক এবং সমষ্টিগত কর্মের জন্য একটি সার্বজনিক সংস্থার প্রয়োজন হয় যাকে সরকার বলা হয়। যেমন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ— জীবিকা, কৃষি, উৎপাদনশিল্প, প্রশাসন, নেতৃত্ব। সুখসুবিধা— আবাস, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, যাতায়াত, দূরভাষ, ডাক। সংরক্ষন— ন্যায়ালয়, হসপিটাল, আপৎকালীন সুরক্ষা, বীমা ইত্যাদি। এইসব কর্মকে কেউ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্তরে সম্পাদিত করতে পারবে না। অর্থাৎ সামাজিক ও সমষ্টিগত কর্মকে ব্যবস্থিতরূপে সম্পাদন করার জন্যই সরকার নামক সংস্থা গঠন করা হয়। ব্যবস্থা গঠন করার পর সরকার এইসব কর্মকে সম্পাদিত করার জন্য নীতিপ্রণালী তৈরি করে এবং সেই অনুযায়ী প্রশাসন তাদের কর্ম সম্পাদন করে। এটিই হচ্ছে কার্যপ্রণালী।

সরকারের কার্যপ্রণালীর বিবরণ

১. শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ
২. জীবিকা
৩. সুখসুবিধা
৪. সংরক্ষণ

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ

প্রথমত, যখনই কোনো সভ্য সমাজ তৈরি করার কথা আসে তখন কিছু নীতিনিয়ম তৈরি করতে হয়। সেখানে একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং একটি সম্পূর্ণ দর্শন থাকে যা মেনে নিয়ে একে অপরের সাথে আচরণ করে। এটি তখনই সম্ভব যখন নীতিনিয়ম সম্পর্কিত জ্ঞান সেই সমাজের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যদি সমাজের কাছে সেই নীতিনিয়মের জ্ঞান না থাকে তাহলে পালন কীভাবে করবে অথবা ব্যবহারিক জীবনে সুখের জন্য কীভাবে কাজে লাগাবে? এইজন্যই সমাজের মধ্যে শিক্ষার বৃহৎ গুরুত্ব রয়েছে। এই জ্ঞানকে অর্জন করার জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জীবন-যাপনকে কীভাবে সমৃদ্ধশালী বানানো যায়, সুখসুবিধাগুলিকে বাড়ানোর জন্য কীভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে খুঁজে নেওয়া যায় এবং কীভাবে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরিত করা যায় যেন সেই প্রজন্ম কম সময়ে সহজেই সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অর্জন করে পরবর্তী গবেষণা করতে পারে এবং যা আবিষ্কার করা হয়েছে তা জীবনের সুখসুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পারে। যেন আমরা অধিক থেকে অধিকতর সুখী হতে পারি। এটিই হচ্ছে পরিবার, সমাজ ইত্যাদি রচনার উদ্দেশ্য। এর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

'শিষ' ধাতু থেকে শিক্ষা শব্দ তৈরি হয়েছে। শিক্ষা সেটিই যা আমাদের শিষ্টতায় পরিণত করে। যা আমাদের অন্তঃকরণে শিষ্টতা প্রদান করে। শিষ্টতা থেকেই মনুষ্য সভ্য হয়। বর্তমানে সভ্যের অর্থ হচ্ছে যেমন সমাজ নির্মিত হয়েছে তাতে যেন সে আচরনের যোগ্য হয়। সভ্যের অর্থ অবশ্যই এটি নয় মানুষ একটি নষ্ট প্রাণী তাকে শিক্ষার মাধ্যমে শোধরাতে হবে। মনুষ্য প্রাকৃতিকভাবে শোধরানো অবস্থাতেই রয়েছে যেমনটি তার হওয়া উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এটিই হওয়া উচিত— সে যেন সমাজের নীতিনিয়মের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং সভ্য হয়। অর্থাৎ সমাজের সাথে সঠিক ব্যবহার করার জন্য

সফল হতে পারে। এবং ওই সমাজে তার কর্ম কী হবে যার মাধ্যমে সে সমাজের উদ্দেশ্য পূরণে নিজের যোগদান দিতে পারে। এর জন্যই তো সমাজ তৈরি করা হয়েছে যেন নিজেদের ইপ্সিত সুখগুলিকে প্রাপ্ত করতে পারি। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা এটি জানতে পারি কী কর্ম করা উচিত, কেন করা উচিত, কীভাবে করা উচিত, কোনটি সঠিক কোনটি ভুল, কার সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত, কেমন আচার ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি। এসব কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে সহজেই এবং তড়িৎ গতিতে জেনে নেওয়া যেতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি অন্তঃকরণ চতুষ্টয় থাকে। এর অর্থ আমাদের ভেতরে চারপ্রকার ক্ষমতা থাকে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার। মনের ভেতর চিন্তন-মনন করার শক্তি থাকে। বুদ্ধির ভেতর সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি থাকে। চিত্তের ভেতর ধারণ করার শক্তি থাকে। আর অহংকারের ভেতর জ্ঞান অর্জনের শক্তি থাকে। আমাদের অন্তঃকরণের এই হচ্ছে পুরো প্রক্রিয়া। এই অন্তঃকরণ বিকাশের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন হয়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারকে পরিষ্কৃত করার জন্য চারটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। মন পরিষ্কৃত করার জন্য ভাষা, বুদ্ধিকে পরিষ্কৃত করার জন্য গণিত, চিত্তকে পরিষ্কৃত করার জন্য সংজ্ঞান এবং অহংকারকে পরিষ্কৃত করার জন্য দর্শনের প্রয়োজন হয়। শিক্ষা সমাপ্ত হতে হতে যে শিশুর যতটা বোধ তৈরি হবে সেই শিশু ততটাই অগ্রসর হবে এবং তার ওই চার ক্ষমতাও সেইরূপ কর্ম করবে। আচার ব্যবহারও তার অভিজ্ঞতা অনুসারে রচিত হবে। তার রুচিও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উৎপন্ন হবে। প্রশিক্ষণও সেই আধারেই হবে। এরপর কর্মসংস্থানও সেইমত নিশ্চিত হয়ে যাবে।

১৫ বর্ষীয় পাঠ্যক্রম ও তার উদ্দেশ্য

শিক্ষা দু-প্রকারের হবে— সাধারণ এবং পেশাগত। ১৫ বছর বয়স অবধি সাধারণ পাঠ্যক্রম থাকবে। যা সকলেকে অনিবার্যভাবে পড়ানো হবে। কোনো ছাত্রকে কখনো অকৃতকার্য করানো হবে না। যে ছাত্র যেমন নম্বর অর্জন করবে সেই নম্বরের ভিত্তিতে তাকে পরবর্তী কক্ষে প্রবেশ করানো হবে। কেবলমাত্র চারটি বিষয়ই এই সাধারণ শিক্ষা প্রণালীতে পড়ানো হবে। ভাষা, গণিত, সংজ্ঞান এবং দর্শন। যা সকল শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবে। ভাষা মনের বিকাশ করবে, গণিত বুদ্ধির বিকাশ করবে, সংজ্ঞান চিত্তের বিকাশ করবে এবং দর্শন অহংকারের বিকাশ করবে। অন্তঃকরণ বিকাশের মাধ্যমেই মনুষ্যের মধ্যে ঠিক এবং ভুলের জ্ঞান তৈরি হয়। কখন কী করা উচিত তার জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমেই হয়। আচার ব্যবহার কেমন হবে তার জ্ঞানও শিক্ষার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। মন তর্ক-বিতর্ক করে। যখন আমাদের সামনে কিছু পরিস্থিতি আসে তখন আমরা মন দ্বারা তা

বিচার করি। পরিস্থিতি বিচার করার জন্য অনেক বিকল্প আমাদের সামনে চলে আসে। মন সেইসব বিকল্পগুলিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্তন-মনন করে এবং বোঝার চেষ্টা করে কী করলে দুঃখ আসতে পারে এবং কী করলে সুখ আসতে পারে। এটিই হচ্ছে মনের কর্ম। এই কর্মকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য যৌক্তিক ভাষার প্রয়োজন হয়। ভাষার মাধ্যমে বিচার-পরামর্শ করা সহজ হয়। এটি মূলত তখন প্রয়োজন হয় যখন আমরা অন্যের সাথে আলোচনা করি। কেননা ভাষার মাধ্যমেই বিভিন্নতার নানারকম রূপ দেওয়া যায়। নাহলে ভাষার অভাবে কেবলমাত্র শারীরিক সংকেতের মাধ্যমে এই কর্ম মূলত অসম্ভব ছিল। যেমন কারোর সম্পর্কে কাউকে কিছু বলা। তাই ভাষার মাধ্যমে এইসব কর্ম খুব সরল হয়ে যায়। ভাষার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য গ্রহণ করতে পারি এবং প্রদান করতে পারি। যদি এইভাবে করি তাহলে সুখ পাব অথবা যদি ওইভাবে করি তাহলে দুঃখ পাব ইত্যাদি বুঝতে পারি। তারপর সেই তথ্যগুলিকে নিজের মাধ্যমে ও অপরের সাথে পরামর্শ করে স্পষ্ট করে নিতে পারি। নানারকম বিকল্প বের করে নেওয়া অথবা কারোর সম্পর্কে নানারকম কল্পনা করাই হচ্ছে মনের কর্ম। যদি এইভাবে করি তবে কী হবে অথবা যদি সেইভাবে করি তবে কেমন হবে। যদি এটি করে ফেলি তবে কী হবে আর যদি সেটি করে ফেলি তবে কী হবে। তাহলে বোঝা গেল বিভিন্ন প্রকার কল্পনা করা এবং বিভিন্ন প্রকার বিকল্প তৈরি করাই হচ্ছে মনের কর্ম। আর মনের এই কাজের জন্য ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। যদি মানুষের ভেতর থেকে এই ভাষাকে সমাপ্ত করে দেওয়া যায় তাহলে এখনই আমরা সকলে আদি মানবদের মতন হয়ে যাব। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন কেবলমাত্র এক আদিম জীবনই বিকল্প হিসেবে থাকবে। যেমন আমরা পশুদের জীবন-যাপন দেখি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার হচ্ছে ভাষা। ভাষা সমাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যাওয়া। সুতরাং এবার বিচার বিবেচনার পর সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। তা নাহলে বিচার বিবেচনার কোনো যুক্তি থাকে না। যদি আমরা সকলে বসে কেবলমাত্র বিচার বিবেচনা করি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছই তবে কেমন হবে? ব্যাপারটা এমন হবে, যেন কোনো বিচারক আদালতে অন্য উকিলদের থেকে সব তথ্য-বিবেচনা শুনে নিলেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিলেন না। তবে আমরা কী বলব বিচার প্রক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয়নি? তাহলে জানা গেল বিচার পরামর্শের পর সিদ্ধান্তে আসা উচিত। এই সিদ্ধান্তজনিত অভ্যাসের ফলেই গণিত বিষয়টি বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। আর সিদ্ধান্ত নেবার জন্য অন্তঃকরণের দ্বিতীয় করণ— বুদ্ধি দায়বদ্ধ থাকে। এই বুদ্ধির বিকাশের জন্যই রয়েছে গণিত বিষয়। গনিতের মাধ্যমে আমরা সর্বদা প্রতিটি গণনায় কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। যেমন ৫ এর সাথে ৮ যুক্ত করলে কী সিদ্ধান্ত হবে। সিদ্ধান্ত আসবে ১৩। আর গণনা করার সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকেন এবং

সেই স্থানে গিয়ে থেমে যান যেখানে আপনি অন্তিম সিদ্ধান্ত বা অভীষ্ট উত্তর পেয়ে যান। যা আপনি পেতে চেয়েছেন। তাহলে এটিই হচ্ছে নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যাকে বৌদ্ধিক ক্ষমতা বলা হয় এবং এর বিকাশের জন্য গণিতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যে কোনোপ্রকার সিদ্ধান্ত এই প্রকার বুদ্ধির সহায়তায় নেওয়া হয়।

আমরা বিচার পরামর্শ করলাম এবং কোনো সিদ্ধান্তেও পৌঁছলাম তবে কি এবার কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে গেল? তাহলে দেখব যে তা হয়নি। এখনও আমরা কোথাও একটি মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছি। এখনও আমাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি যার জন্য আমরা সকলে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ‘বিচার-বিমর্শ’ করছিলাম। অর্থাৎ বিচারক মহাশয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কার ভুল ছিল এবং তাকে কি সাজা দেওয়া হবে। তাহলে এবার বিচারকের কর্ম তো সমাপ্ত হল, বুদ্ধির কর্মও সমাপ্ত হল, কিন্তু সমাজের কর্ম কি সমাপ্ত হল? হয়নি। কেননা এখনও তো সেই সিদ্ধান্তের উপর কর্ম সম্পাদন করা অবশিষ্ট রয়েছে। তাহলে কী হবে পরবর্তী পদক্ষেপ? পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বিচারক মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেওয়া এই বলে যে, ‘হ্যাঁ বিচারক সাহেব আপনার সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিচ্ছি এবং আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যনির্বাহ করা হবে’। তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ হল সেই সিদ্ধান্তকে প্রশাসন দ্বারা স্বীকার করে নেওয়া। সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেবার কর্ম সম্পাদন হয় আমাদের চিত্তের সহায়তায়। আর চিত্ত বিকাশের জন্য উপযোগী বিষয় হচ্ছে সংজ্ঞান। সংজ্ঞানের অর্থ হছে সামান্য জ্ঞান। সংজ্ঞানের মধ্যে সেই সকল সামান্য শিক্ষা থাকে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উপযোগী। যেমন কীভাবে বসব, কীভাবে ঘুমোব, কীভাবে হাঁটব, কীভাবে খাওয়া দাওয়া করব, কী খাবার খাব বা পান করব, কোন কাপড় কীভাবে পরব, কীভাবে অপরের সাথে ব্যবহার করব ইত্যাদি। এইসব কর্মের মূলে যেন শুধুমাত্র সুখ বিরাজ করে। ইতিহাস-ভূগোল এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ এইভাবে করব যেন সকলেই শুধুমাত্র সুখী হয়। কোনো দুঃখ যেন না আসে অথবা সুখ যেন সর্বাধিক আসে। দুঃখ এলেও তা যেন ক্ষণস্থায়ী হয় অথবা অতি সামান্য আসে। সংজ্ঞান থেকে জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংজ্ঞান রয়েছে আমাদের হাতে। এটিকে আমরা গ্রহণ করব কি করব না। মানুষ আপন স্বভাবেই নিজেদের সুখ প্রদানকারী বস্তু এবং পরিষেবা গ্রহণ করেই নেয়। সেইজন্য সঠিক সংজ্ঞানকে সে স্বীকার করে নেবেই। সংজ্ঞানের অর্থ এটিই যে সংজ্ঞান বিষয় আমাদের বলে দেয় কীভাবে নিজেকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায় যেন সকলে অধিক থেকে অধিকতর সুখী হতে পারে। আর সংজ্ঞান অথবা সাধারণ জ্ঞান শুধুমাত্র বলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না বিস্তারিত বুঝিয়েও দেয় যে এটিই কেন এর বাইরে অন্য কিছু কেন নয়। তাহলে জানা গেল মনুষ্য এমন শিক্ষাকে স্বীকার করেই নেয় যা থেকে কেবলমাত্র সুখই প্রাপ্ত হয়। আর যদি কেউ এই শিক্ষাকে

গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে বুঝতে হবে যে তার সংজ্ঞানে কিছু ঘাটতি রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে মানুষের মধ্যে কোনো ঘাটতি খুঁজে বের করতে হবে। এই হল আমাদের জীবনে সংজ্ঞানের অর্থ। একথা স্বীকার তো করে নিলাম কিন্তু কর্মে রুপান্তরও তো করতে হবে। কেননা ফলাফল তো কর্ম করার পর আসে। যাকে কেন্দ্র করে এত দীর্ঘ প্রক্রিয়া চলছে। আর এটি তখনই সম্ভব হয় যখন অহংকার একে স্বীকার করে নিয়ে কর্ম সম্পাদন করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। কারণ প্রয়োজনীয় ফলাফল তার চাইই চাই। অন্তঃকরণের চতুর্থ ধাপ হচ্ছে অহংকার। এটির সঠিক বিকাশের জন্য দর্শন নামক বিষয়ের প্রয়োজন। কেননা সমস্তকিছু এই অহংকার থেকেই শুরু হয়। অহংকারের জন্যই হয় আর এই অহংকারেই এসে সমাপ্ত হয়ে যায়। এই হচ্ছে ব্যাখ্যা। এর চারপাশেই সবকিছু আবর্তিত হতে থাকে। সম্পূর্ণ মানব জাতির জন্য এই অহংকারই হচ্ছে মুখ্য অধ্যাপক। মনুষ্য সম্পর্কিত সমস্তকিছু এই অহংকার থেকেই শুরু হয়। অহংকারেই এসে সমাপ্ত হয় এবং মধ্যবর্তী অবস্থায় এটিই কেন্দ্র হিসেবে উপস্থিত থাকে। এটিই ইচ্ছে প্রকাশ করে কোনোকিছু প্রারম্ভ করে, এটিই মনের সাহায্য নিয়ে চিন্তন-মনন করে, এটিই বুদ্ধির সাহায্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, এটিই চিত্তের সাহায্যে স্বীকার করে নেয়, এটিই কর্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় কর্ম সম্পাদন করে, এটিই পরিণাম হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপভোগ করে সুখী হয়। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা সুখ উপস্থিত থাকে। সুখের এই উপস্থিতি একপ্রকার পরীক্ষাও বটে। যদি অহংকারের জন্য এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সুখ প্রদানকারী হয় তবেই সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সঠিক হবে। কোনো দুঃখের উদয় হলে প্রথমেই আমাদেরকে সেই ব্যবস্থাকে নিরীক্ষণ করা উচিত এবং তার অপূর্ণতাকে পূর্ণ করা উচিত। এইজন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই অহংকার বিকাশের জন্য দর্শন বিষয় প্রয়োজন। এই বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা উচিত কারণ সকল ভালো ও মন্দ ক্রিয়াকলাপের প্রারম্ভ এখান থেকেই হয়। যখন শুরুটাই ভুল দিয়ে হবে তবে অবশিষ্ট প্রক্রিয়াও শেষ অবধি ভুল পথেই চলবে। এবং সকলের জন্য দুঃখই উৎপন্ন করবে। যেমনটি আমরা দেখছি। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে চলেছে। কোনো সমাজে সুখ-দুঃখ নামক ফলাফলের জন্য দর্শন বিষয়ই মূলরূপে দায়ী। যে সমাজের দর্শন যেমন হবে তার ফলাফল ও দিকনির্দেশ অনুযায়ী তেমন প্রকারের সুখী ও দুঃখী হবে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের দর্শন পূর্ণ না অপূর্ণ। এই পর্যালোচনা আমাদের সমাজের পরিস্থিতির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। যদি আমাদের সমাজ পূর্ণরূপে সুখী হয় তবে বুঝবেন আমাদের দর্শন পূর্ণরূপে সঠিক। অন্যথায় নয়। উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া অবধি এর উপর নিরন্তর গবেষণা চলা উচিত। দর্শন আমাদের বলে দেয় আমরা পৃথিবীতে কেন এসেছি এবং এই আসার উদ্দেশ্যকে কীভাবে জানব, অর্থাৎ এই জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্যকে কীভাবে পূরণ করা যাবে। মূলরূপে এটিই দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। এরই মাঝে

দর্শনশাস্ত্র অধিক অনেক প্রশ্নের সমাধান করে দেয়। যেমন আমরা কে, এই প্রকৃতির সাথে আমাদের কী সম্পর্ক, আমাদের নিজেদের মধ্যে কী সম্পর্ক ইত্যাদি। অহংকার অথবা ব্যক্তিত্ব কত প্রকার হয়ে থাকে এবং তাদের কীভাবে বিকশিত করা যায়, যে কারণে বিভিন্ন প্রকার অহংকারের নির্মাণ করা হয়ে থাকে যেন সেই সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এর নির্মাণ প্রক্রিয়া কী? এইসব বিষয়গুলি দর্শনের অন্তর্গত। তাহলে সাধারণ শিক্ষার কর্ম এবং উদ্দেশ্য এটিই তা যেন আমাদের অন্তঃকরণকে সুনিয়োজিতভাবে বিকশিত করতে পারে।

এখনো অবধি যত প্রকার দর্শন আমরা পাই সেসবের প্রারম্ভে যে মূল প্রশ্ন আসে তা হল 'এই ব্রহ্মাণ্ডময় জীবন কী অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডময় জীবনের উদ্দেশ্য কী অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডময় জীবন কোন পথে চলছে', সেই সকল দর্শনে কিন্তু তার স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়নি। আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে যতটা অস্পষ্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে তার অর্থ এই যে মানুষকে মোক্ষের পথে চলা উচিত। আর মোক্ষের অর্থ এই বলা হয়ে থাকে তা হল এই সংসার থেকে মুক্তি। অর্থাৎ সংসারের জন্ম, জীবন ও মরণ থেকে মুক্তি। এখন আপনিই বলুন যে এই সংসারে জন্ম নেওয়ার পূর্বে সে তো এই সংসারের বাইরেই ছিল তাই না? অর্থাৎ সংসার থেকে তো সে মুক্তই ছিল। যদি সংসার থেকে মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে জন্মের পূর্বে তো সকলে মুক্তই ছিল। তাহলে এই সংসারকে তৈরি করার কি প্রয়োজন হল? উদাহরণ হিসেবে ধরে নিন আপনি নিজের ঘরে বাস করছেন এবং একদিন আপনি অন্য কোনো স্থানে যাবার পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি দ্বিতীয় স্থানে কেন যাচ্ছেন'। তাহলে আপনি জবাবে কি এই কথাই বলবেন যে, 'বন্ধু আমি সেখানে এইজন্য যাচ্ছি যেন সেখানে গিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারি? যেন সেই দ্বিতীয় স্থান থেকে মুক্ত হতে পারি'! আপনার এই উত্তর শুনে আপনার বন্ধু বলবে কি বলবে না 'তার কি কোনো প্রয়োজন আছে'? আপনি তো প্রথম থেকেই এখানে রয়েছেন। অর্থাৎ আপনি তো প্রথম থেকেই দ্বিতীয় স্থান থেকে মুক্তই রয়েছেন। তাহলে আবার এইসব গমনাগমন কেন? বর্তমান সময়ের দর্শন এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। দিতেও পারবে না কারণ এই প্রশ্নের উত্তর আর কি হতে পারে? এখন যদি আপনি বিভিন্ন দার্শনিকদের থেকে জানতে চান যাদের আপনি বিভিন্ন নামে চেনেন, যারা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, আর আমি এইসব ধর্মগুলিকেও দর্শন হিসেবেই বলছি। দর্শনের অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে— জীবনের যে সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা জীবন-যাপন করি অথবা জীবনযাপনের দিকনির্দেশ পেয়ে থাকি তাকেই দর্শন বলছি। আমার বিবেচনায় আজ যেটিকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বলছি এটিও একপ্রকার দর্শন অথবা একপ্রকার ধর্ম। আপনি এটিকে গণধর্ম নাম দিতে পারেন। দেশের সংবিধানও একপ্রকার দর্শন, বলতে গেলে একপ্রকার ধর্ম। ধর্মের অর্থই হচ্ছে ধারণ করার

উপযুক্ত। আর সংবিধানও তো এটিই বলছে এর অন্তর্গত নাগরিকদের কী ধারণ করা উচিত কী করা উচিত নয়। অর্থাৎ কোনটি ধর্ম আর কোনটি অধর্ম। আর পুরো সংসারের পরিস্থিতি দেখে এটি বলা যায় এখনো অবধি সেই ধর্ম বা দর্শন আসেই নি যা সকলের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে সক্ষম হতে পারে। এইভাবে আমরা আমাদের জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই দর্শনের গুরুত্বকে বুঝতে পারি। আর এমনও বলা হয়ে থাকে যে সকল ধর্মকে সমানভাবে দেখা উচিত। ব্যবহারিক দিক দিয়ে তা সম্ভব নয় কারণ প্রতিটি ব্যক্তি কোনো না কোনো ধর্মকে তো বিশেষভাবে মেনে চলে। তবেই তো সে একটি ধর্মকে চয়ন করে। যখন কেউ কোনো একটি ধর্মকে বিশেষরূপে দেখবে অথবা সেইরূপ মেনে চলবে তবে তো অবশিষ্ট ধর্মকে সে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই রাখবে তাই না? নাহলে কীভাবে কেউ একটি ধর্মকে বেছে নেবে? উদাহরণস্বরূপ, আপনি বাজারে গেলেন কোনো সব্জি কিনতে। আর সেখানে একই সব্জির বিভিন্ন প্রকারভেদ দেখতে পেলেন এবং তা থেকে কোনো একটি সব্জি নিজের পছন্দ অনুযায়ী কিনে নিলেন। এবার বলুন যে আপনি কীভাবে সমস্ত প্রকারের সব্জিকে সমানভাবে দেখবেন? সমানভাবে দেখার অর্থ হচ্ছে আপনার কাছে সকল সব্জির প্রকারভেদ একইরকম মনে হবে। ধরুন আপনি সব্জি বিক্রেতাকে বলছেন যে কোনো এক প্রকার সব্জি দিয়ে দিন। সবই তো একই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনারা সকলে জানেন যে ব্যবহারিক দিক দিয়ে তা এক নয়। তাহলে ধর্মের ব্যপারে এমনটি কি করে হবে? অর্থাৎ আপনি ১৬ ক্যারাট সোনাকে ২৪ ক্যারাট মুল্যে কিনতে পারবেন না। অর্থাৎ যখন ধর্ম অনেক হবে তখন তার দর্শনও তো অনেকগুলিই হবে তাই না? নাহলে অনেক বলার অর্থ কী? সকলের নিজের নিজের পছন্দ রয়েছে এবং সকলে নিজের মত করে ভিন্ন-ভিন্ন মূল্যায়ন করে থাকে। অতঃপর নিজ বিবেচনায় কোনো একটি ধর্মকে আপন করে নেয়। কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার ধর্ম একে অপরের ক্ষতি করতে চলে আসে এবং পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠে। যেমনটি আমরা সকলে দেখতেও পাচ্ছি। এখন এই অবস্থায় সর্বধর্ম-সমন্বয় কীভাবে সম্ভব? তাহলে এর একটিই সমাধান আছে তা হল এক এমন দর্শন নিয়ে আসা যা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। সেই দর্শন সকলেকে সমস্তকিছু উপলব্ধ করে দেবে যা মূলত সকলে জীবনভর চেয়ে থাকে। এরপর আর ভিন্ন-ভিন্ন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না এবং অনেক প্রকার দর্শন থেকে যে সমস্যা উৎপন্ন হয় তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এরপর আর এমন ভয় আসবে না এই ভেবে যে অন্য ধর্মের জনসংখ্যা যদি অধিক হয়ে যায় তবে আমাদের বাঁচতে দেবে না। তাহলে আমরা নিজেদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে নিই যেন কোনো সমস্যা এলে তাদের সাথে লড়াই করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি। দর্শনকে ভয় অথবা লোভের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ে আপনি দেখতে পাবেন যে প্রায় সকল দর্শন স্বর্গের লোভ এবং নরকের ভয়ের উপর নির্ভরশীল। দর্শনকে যেখানে সত্য, প্রেম, ন্যায় এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

হওয়া উচিত ছিল। অথবা এক লাইনে বলতে গেলে সকল প্রকার সুখ যেন সকলের জন্য প্রাপ্ত হতে পারে এমন কোনো দর্শন থাকা উচিত ছিল। সঠিক দর্শন থাকলে সঠিক প্রকারের অহংকার অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের নির্মাণ হয়। সেইজন্য আমাদের এটি বোঝা উচিত যে ব্যক্তিত্বের নির্মাণের জন্য দর্শনের ভূমিকা সর্বাধিক। দর্শনের অর্থ হচ্ছে উদ্দেশ্য আনুসারে দিক নির্দেশ। যখন উদ্দেশ্য এক তবে দর্শন কীভাবে অনেক হতে পারে? একটি দর্শনই হওয়া উচিত। যতদিন দর্শন একাধিক থাকবে ততদিন মানুষ বিভিন্নরকমভাবে মেনে চলবে। আর যদি সেইসব দর্শনের দিকনির্দেশগুলি ভিন্ন-ভিন্ন হয় তবে এর অর্থ কি দাঁড়ায়? এতে এটিই হবে যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সহযোগিতা থাকবে না। কেননা সকলে আপন আপন উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলতে পছন্দ করবে যা হবে পরস্পর থেকে ভিন্ন। এর ফলে সহযোগিতার সংস্কৃতি অথবা সভ্যতা কখনো স্থাপন হবে না এবং সকল মানুষ কখনো সুখী হতে পারবে না। যতদিন দর্শন একাধিক থাকবে ততদিন এটি বুঝতে হবে যে সঠিক দর্শন এখনও আমাদের সম্মুখে আসেই নি। যেদিন সেই দর্শন এসে যাবে সেইদিন সকলে তা সহজেই স্বীকার করে নেবে।

এই প্রকার সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করলে চার প্রকারের ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে। এখানে যাদের নম্বর ০০ থেকে ২৫ শতাংশ অবধি আসবে তাকে শারীরিক অবস্থার (PQ) সক্ষমতা বলা হবে। যাদের নম্বর ২৫ শতাংশের বেশী এবং ৫০ শতাংশ অবধি আসবে তাদের মানসিক অবস্থার (IQ) সক্ষমতা বলা হবে। আর যাদের নম্বর ৫০ শতাংশের বেশী এবং ৭৫ শতাংশ অবধি আসবে তাদের ভাবনাত্মক অবস্থা (EQ) বলা হবে। আর যাদের নম্বর ৭৫ শতাংশের বেশী এবং ১০০ শতাংশ অবধি আসবে তাদের চেতনাত্মক অবস্থার (CQ) সক্ষমতা বলা হবে।

ভাষার স্বরূপ

কোনো ভাষা যদি পুরোপুরি তর্কসঙ্গত হয় তবে তাকে একটি ভাষা হিসেবে পড়ানো উচিত। ভাষাকে তর্কসঙ্গত হওয়া এইজন্য আবশ্যক কারণ ভাষার মাধ্যমেই মানুষের মন বিকশিত হয়। ভাষা যেমন হবে মনও সেইরূপ বিকশিত হবে। ভাষাই ভবিষ্যৎ সময়ের শিক্ষণ-প্রশিক্ষনের আধার হয়ে থাকে। সেইজন্য মনকে তর্কসঙ্গত বানানোর জন্য ভাষা তর্কসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজি ভাষায় যেমন PUT এর উচ্চারণ পুট হয় একইভাবে কিন্তু BUT এর উচ্চারণ বুট হয় না। তাহলে এটি অযৌক্তিক। সকল স্বরবর্ণ

ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সকল স্থানে একইরকম হওয়া উচিত। এইজন্য ভাষার ব্যকরণকেও পুরোপুরি তর্কসঙ্গত হওয়া উচিত। এমনটি নয় যে কোনোটার অর্থ কোথাও একরকম হবে আবার কোথাও অন্যরকম হবে। কোনো অক্ষর কোথাও লেখা হবে কিন্তু উচ্চারিত হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষা সঠিক এবং ব্যবহারিক নাহলে আমরা শিশুদের মধ্যে তর্ক করার জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারব না। যে কারণে শিশুরা কোনো একটি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তর্কসঙ্গত চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। আর যদি সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে না পারে তাহলে তো কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাই অধিকাংশ মানুষ সিদ্ধান্তবিহীন পরিস্থিতিতে জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। তাহলে ভাষা হচ্ছে সমগ্র জীবনের আধার। যদি এতে কিছুমাত্র ঘাটতি রয়ে যায় তবে তা ভুল পথে প্রভাবিত করতে থাকবে। মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত এবং অসহায় অনুভব করবে। এর কারণে সে এমন অনেক দুঃখ নিয়ে বাঁচতে বাধ্য হবে যেখানে ভাষা সঠিক হলে সুবিধা করতে পারত। তবে আপনি যদি চান কোনো একটি ঐচ্ছিক ভাষা শিখতেই পারেন যদি প্রয়োজন পড়ে। আর যদি অন্য কোনো ভাষা আপনি পড়তে চান তো আপনি ভিন্নভাবে পড়তেই পারেন। কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা সম্পূর্ণ জগতের জন্য স্বাভাবিকভাবেই থাকা উচিত যা হবে শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন একটিই ভাষা হবে তখন একজন ব্যক্তি যা বলবে অপর ব্যক্তি সেইরূপ বুঝতে পারবে। অধিক ভাষা থাকার ফলে মানুষ বিরাট অসুবিধের সম্মুখীন হয়। একজন কিছু বলছে এবং অপর ব্যক্তি নিজের মত করে বুঝে নিচ্ছে এবং উত্তরও সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন অর্থের মাধ্যমে দিতে হয়। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান সঠিক ভাবে হতে পারে না। যা কিনা ভাষার একটি মুখ্য কর্ম এবং মুখ্য উদ্দেশ্য। আর কখনও কখনও ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা যুদ্ধের কারণও হয়ে উঠে। তার কারণ কেউ কিছু একটি বলেছে কিন্তু দেখা গেল অপর ব্যক্তি তার উল্টো বুঝে নিয়েছে। এর ফলে সমাজে নানারকম ভ্রম উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভাষার কর্ম কেবলমাত্র অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্যই হওয়া উচিত এবং সেইরূপেই দেখা উচিত। মাতৃভাষা বা প্রতিবেশীর ভাষা হিসেবে নয়। একটি সঠিক ভাষা থাকলে অভিব্যক্তির আদান প্রদানে কোনোপ্রকার ভ্রম বা বিরোধ উৎপন্ন হবে না এবং আদান প্রদানের কর্ম সহজ ও দ্রুত হবে। একজন যা বলবে অবশিষ্ট সকলে তাই বুঝবে। সারা পৃথিবীতেই এটি হতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বের কোনো প্রান্তে যা বলা হবে অন্য প্রান্তে সকলে তা বুঝতে পারবে। এরজন্য সকলের কাছে একটিই ভাষা থাকা উচিত। এতে পরিশ্রমও কম হবে। বিভিন্ন ভাষা থাকার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, চলচ্চিত্র ইত্যাদিকে বহুবার অনুবাদ করতে হয়। ভাষা একটি হলে এইসবকে বহুবার অনুবাদ করার প্রয়োজন সমাপ্ত হয়ে যাবে। একইভাবে আরও অনেক প্রকার কর্ম রয়েছে যেখানে ভুল ব্যবস্থার কারণে অসুবিধেয় পড়তে হয়। আর সঠিক ব্যবস্থা থাকলে এইরূপ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। এর ফলে অতিরিক্ত সময় বাঁচবে অথবা

অধিক সৃজনশীলতায় মনোযোগ দেওয়া যাবে। অথবা নিজের পরিবারের জন্য অধিক সময় বের করে পারিবারিক সুখ উপভোগ করা যাবে।

ভাবনার প্রয়োগ কেবলমাত্র জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সম্পর্ক অনুযায়ী হওয়া উচিত, ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নয়। ভাবনার প্রয়োগ সেখানেই করা উচিত যেখানে তা গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকবে। যা কেবলমাত্র চেতনার মাধ্যমে হতে পারে অচেতন অবস্থায় নয়। ভাষা একটি কাল্পনিক অচেতন মাধ্যম। জীবজন্তুর মত ভাষার তো কোনো চেতনা নেই যে সে আপনার ভাবনাকে বুঝতে পারবে। বরং ভাষা নিজেই একটি মাধ্যম নিজের ভাবনাকে ব্যক্ত করার জন্য। ভাষা তাদের জন্য যারা তা বুঝতে পারে অথবা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখতে পারে। এটি শুধুমাত্র 'আমার ভাষা' আর ওটি শুধুমাত্র 'আপনার ভাষা' এসব বলে অনাবশ্যক সকল ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র প্রয়াসও করা উচিত নয়। বর্তমান সময়ের কোনো একটি ভাষা থেকে সমগ্র জগতের জন্য এমন একটি ভাষা চয়ন করা উচিত যা সর্বাধিক মাপদণ্ডকে পূরণ করবে এবং অবশিষ্ট ঘাটতিগুলিকে শুধরে নিয়ে ধীরে ধীরে শিক্ষার মাধ্যমে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। এইজন্য সকলের অনুমতিও নেওয়া উচিত। এটি করলে আমরা সেইসব সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারব যা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার কারণে হয়ে থাকে। নতুন ব্যবস্থা এলে এতে দ্রুত কর্ম করা যাবে।

গণিতের স্বরূপ

গণিতের মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ হয়। গণিতের মাধমে আমরা সর্বদাই কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। সেইজন্য গণিত হচ্ছে একটি যুক্তি সঙ্গত মাধ্যম যেখানে অযৌক্তিকতার স্থান থাকতে পারে না। নইলে আমাদের সমস্ত গণনা ভুল হয়ে যাবে। আমাদের সমস্ত লেনদেন অসম্ভব হয়ে পড়বে। লড়াই এবং মারামারির সংখ্যা অধিক বেড়ে যাবে। গণিতের বেলায় মানুষ এমনটি বলার চেষ্টা করে না যে এটি 'আমাদের গণিত' এবং ওটি 'তোমাদের গণিত'; এটি 'হিন্দুদের গণিত' এবং ওটি 'খৃষ্টানদের গণিত'। যেমনটি ভাষার বেলায় বলতে শোনা যায়। কেননা সকলে জানে যে গণিতের বেলায় যিনি যুক্তিহীন কথা বলবেন সর্বপ্রথমে তিনিই ঠকবেন। সেইজন্য আজ অবধি গণিতকে কখনও 'আমার গণিত' বা 'আপনার গণিত' বলতে শোনা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলায় মানুষকে সকল যুগে অযৌক্তিক এবং ছেলেমানুষি কথাবার্তা বলতে শোনা যায়। ভাষাকে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মের সাথে যুক্ত করা হয় এবং ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করা হয়। 'আমার ভাষা' ও 'তার ভাষা' এইরূপ বিপরীত ভাবা হয়, এমনকি আমার ভাষা মহান আর তার ভাষা

মহান নয় ইত্যাদি ইত্যাদি মত পোষণ করা হয়। বিশ্বের সর্বত্র ভাষা, গণিত, সংজ্ঞান ও দর্শন একইরকম হওয়া উচিত। তাহলেই সকলের ব্যক্তিত্ব একই আধারে নির্মিত হবে। কখনই একে অপরের বিপরীত হবে না। এর ফলে সকলের বোধ একই আধারে নির্মিত হবে এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা উৎপন্ন করতে সাহায্য করবে। অভিব্যক্তি আদান প্রদান করার জন্য কোনোরূপ ভ্রম অথবা বাধা উৎপন্ন করবে না। এর ফলে আদান প্রদানে সরলতা দ্রুত চলে আসবে। একজন যা বলবে, লিখবে বা সিদ্ধান্ত নেবে সকলে তাই বুঝতে পারবে। এটি সমগ্র বিশ্বেই হতে পারে। জগতের কোনো প্রান্তে যা বলা হবে সমগ্র বিশ্ব ঠিক তাই বুঝবে। এই কারণে শিক্ষা সকলের জন্য একইরকম হওয়া উচিত।

সংজ্ঞানের স্বরূপ

সংজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের চিত্ত বিকশিত হয়। চিত্ত হচ্ছে সকল তথ্যের ভাণ্ডার গৃহ। যার কাছে যত বেশী এবং যত প্রকার তথ্য থাকবে তার জীবন-যাপন তত সুগম হবে। সংজ্ঞান বিষয় মূলত স্মরণশক্তি বা স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে। আপনার আচার ব্যবহারের সমস্ত জ্ঞান সংজ্ঞানের অন্তর্গত। আপনার জীবনে স্বাভাবিকভাবে যত প্রকার সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় ওইসব সংজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে পড়ে। যেমন ইতিহাস, ভূগোল, আচার-ব্যবহার শাস্ত্র এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ হওয়া সকল প্রকার প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন সাধারণ জ্ঞান। এটি এমন একটি জ্ঞানের ভাণ্ডার যা স্মৃতির উপর নির্মিত। যেমন ইনি আমার পিতা। এবার এই বিষয়ের উপর আপনি কখনও বলতে পারেন না কেন ইনি আমার পিতা? ব্যস পিতা হন তো হন এবং নাহলে হন না। যেমন দিল্লী এখান থেকে ১৫০০ কিলোমিটার দূরে আছে। এখানে আপনি এটি বলতে পারেন না যে ১৫০০ কিলোমিটার কেন? ১৫৫০ কিলোমিটার নয় কেন? অর্থাৎ এমন জ্ঞান যা তর্ক সঙ্গত নয়। এটিকে শুধুমাত্র মনে রাখতে হয়। আপনার স্মৃতির বিকাশ সংজ্ঞান বিষয় দ্বারা হয়ে থাকে। আর এটি উপযোগিতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যার যেমন প্রকার তথ্যের প্রয়োজন সেসব সহজলভ্য থাকা উচিত। অনাবশ্যক তথ্য দিয়ে নিজেকে ভারী করা উচিত নয়। জীবনে সবকিছু উপযোগিতার আধারেই হওয়া উচিত। অনাবশ্যক ভার দুঃখ প্রদানকারী হয়ে থাকে।

দর্শনের স্বরূপ

আমাদের অহংকারের বিকাশ দর্শন বিষয় দ্বারা হয়ে থাকে। আমাদের অহংকার অর্থাৎ আমরা কেমন প্রকার ব্যক্তিত্বকে ধারণ করব এবং কোন পথে করব সেইসব দর্শন বিষয়ের অন্তর্গত। দর্শন বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান করা যায়। যেমন এই সংসার কেন তৈরি হয়েছে? এই সংসার কী? আমরা এখানে কী করছি? কেন করছি? আমাদের জীবনের কি কোনো লক্ষ্য আছে? যদি থাকে তাহলে তা কি? আমরা কি একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত? আমাদের কীভাবে জীবন-যাপন করা উচিত? যেন সকলের লক্ষ্য পূরণ হতে পারে। এই সংসার সৃষ্টির কী কোনো কারণ রয়েছে এবং যদি থাকে তবে তা কি? এইরকম বহু প্রশ্নের উত্তর মূলত বৈজ্ঞানিক আধার থেকে এবং যুক্তিসঙ্গত আধার থেকে পূরণ হোক। তাহলে তা পুরোপুরি তর্কসঙ্গত হবে। আর এটি ততক্ষণ পরিমার্জিত হতে থাকবে যতক্ষণ না এই বিষয় নিজস্ব পূর্ণতায় পৌঁছায়।

ভাষা ছাড়া সিদ্ধান্তে আসা যায় না। গণিত ছাড়া বোধ আসে না। সংজ্ঞান ছাড়া স্মৃতি আসে না এবং দর্শন ছাড়া গবেষণা সম্ভব নয়। কাউকে জোর করে শিক্ষা প্রদান করা হবে না। বিদ্যালয়ে সকলের জন্য প্রবেশাধিকার থাকবে। সকলের পঞ্জীকরণ হবে। সকলে প্রতি বছর পরের কক্ষেও উত্তীর্ণ হতে থাকবে। কিন্তু কাউকেই জোর করে শিক্ষা প্রদান করা হবে না। শিক্ষা প্রদান করার জন্য উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে সহজ উপায় বের করা হবে। সমস্ত শিক্ষা এই প্রকারে প্রদান করা হবে যেন কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করার সময় কোনোপ্রকার কষ্টের সম্মুখীন না হয়। সাধারণত ৫ বছর বয়স পূর্ণ হবার পর ৬ষ্ঠ বর্ষে শিশুকে বিদ্যালয়ে পঞ্জীকরণ করে প্রথম কক্ষে প্রবেশ করানো হবে। ২০ বছয় বয়স অবধি প্রত্যেক শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে। অতঃপর বিদ্যালয় দ্বারা সকল শিক্ষার্থীর পরবর্তী অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে। এরপর তার পছন্দ ও ইচ্ছে অনুযায়ী কোনো একটি বিষয়ে জীবিকামূলক ব্যবহারিক শিক্ষা পরবর্তী ৫ বছর অবধি প্রদান করা হবে। যাকে বলা হবে মহাবিদ্যালয়। এর আধারেই সকলকে নিশ্চিত জীবিকা প্রদান করা হবে।

এরপর গবেষণামূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র যোগ্য শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী গবেষণামূলক শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারবে। একে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হবে। যেটি হবে তাদের পেশা। গবেষণামূলক শিক্ষার কোনো সময়সীমা থাকবে না। এইসকল গবেষণা এবং অনুসন্ধান সমগ্র জগতের জন্য উৎসর্গ করা হবে। এর উপর সমগ্র বিশ্বের

সমান অধিকার থাকবে। জগতের প্রয়োজনে এই সকল আবিষ্কার বিনা শুল্কে ব্যবহার করা হবে।

উপরের বিষয়বস্তুর ফলাফল এটিই হচ্ছে যে— মানব জীবনের সামগ্রিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অনিবার্য। শিক্ষাই মূলত সঠিক অর্থে আমাদের সামাজিক প্রাণীতে পরিণত হতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। সামাজিক হলেই সকল প্রকার সুখের দরজা খুলতে শুরু করে।

মনুষ্যের প্রকার

মনুষ্যের জন্ম থেকেই জাগ্রত অবস্থায় অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়ে যায়। জাগ্রত অবস্থায় অন্তঃকরণের ফলেই মনুষ্য এত বিকাশ করতে পারে। সে সবকিছু বুঝতে সক্ষম হয়ে উঠে। সে প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করতে পারে। তা থেকে তথ্যসমূহ বের করে নিতে পারে। এতপ্রকার গবেষণা করতে পারে। বর্তমানে আমরা যে এত উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছি এর মূলে রয়েছে এই জাগ্রত অন্তঃকরণ। যে মানুষের অন্তঃকরণ যত বেশী জাগ্রত হয় সে ততটাই সকল বিষয়কে গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হয়। তারপর সেই স্তর থেকে সে সমস্তরকম কর্ম করে থাকে। মানুষের অন্তঃকরণকে বিকশিত করাই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষের মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারকেই অন্তঃকরণ বলা হয়। যেভাবে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বাহ্যকরণ বলা হয়। করণের অর্থ হচ্ছে কিছু করার সাধন। যার মাধ্যমে কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় তাকে সংস্কৃত ভাষায় করণ বলা হয়। মানুষের অন্তঃকরণে চার প্রকার কর্ম হয়ে থাকে। মন দ্বারা চিন্তন-মনন করার কর্ম হয়। বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্ম হয়। চিত্ত দ্বারা গ্রহণ বা স্মৃতিধারণের কর্ম হয়। অহংকার দ্বারা সেইসব কাজের ইচ্ছে উৎপন্ন হয় এবং বাহ্যকরণ দ্বারা তাদের সম্পন্ন করা হয়। এই অহংকারকেই কর্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, স্রষ্টা ইত্যাদি নামে জানা যায়। মন কতটা গভীরতা দিয়ে চিন্তন-মনন করতে পারে, বুদ্ধি কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চিত্ত কত দ্রুত এবং কতটুকু গ্রহণ করতে পারে এর থেকেই আপনার অহংকারের কর্ম সম্পন্ন হয়। যা থেকে আপনার স্তর কিরূপ তা বোঝা যায়। অহংকার মানে আপনার 'আমি' কি প্রকারের তা আপনার অন্তঃকরণ বিকাশের মাধ্যমেই নিশ্চিতভাবে জানা যায়। যারা নিজেদের কেবলমাত্র শরীর মনে করে তারা কেবলমাত্র নিজেদের সুখ-দুঃখকে অনুভব করে। তাদের রুচিও কেবলমাত্র শরীর দ্বারা সম্পাদিত কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। তাদের সম্পূর্ণ দিনযাপন নিজেদের মধ্যেই সীমিত থাকে। তাহলে এর অভিপ্রায় এটিই হবে যে আপনি শরীরী অবস্থায় রয়েছেন। আপনি নিজ

সুখের আশায় কোনোকিছু করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকবেন। মানসিক স্তরের ব্যক্তিরা পরিবারের সদস্যদের সুখ-দুঃখকে ঠিক সেইভাবেই অনুভব করে যেমনটি আপনি নিজে করেন। তারা সুখকে বাড়াতে ও দুঃখকে কমানোর জন্য কর্মও করে থাকে। তারা কোনো বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোনোকিছু গ্রহণ করতে পারে। নির্দিষ্ট সীমা অবধি তারা বুদ্ধিমানও হয়। তাহলে এর অভিপ্রায় এটিই হবে যে আপনি মানসিক অবস্থায় রয়েছেন। আপনার আমিত্বের পরিসর আপনার পরিবার অবধি আসছে। ভাবনা স্তরের ব্যক্তিরা নিজের সুখের সাথে সাথে পরিবারের সুখের জন্যও কিছু না কিছু করার জন্য তৎপর থাকেন। এইভাবে যদি আপনি পুরো সমাজের সুখ-দুঃখকেও একই প্রকার অনুভব করতে পারেন যেমনটি নিজের বেলায় করে থাকেন, নিজের পরিবারের বেলায় করে থাকেন। আর তাদের সুখকে বাড়াতে এবং দুঃখকে সমাপ্ত করার জন্য কর্ম করে থাকেন। তারা গভীরভাবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তন-মনন করতে পারেন। সিদ্ধান্তও অনেকটা সঠিক নিতে পারেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যও সর্বদা তৎপর থাকেন। অর্থাৎ যখনই আপনি জানতে পারেন যে এটি সঠিক এবং যা করলে সমাজ সুখী হবে শীঘ্রই তা গ্রহণ করতে শুরু করেন। সম্পর্ককে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। যা করতে বলা হয় তাই করে দেন। এনারা যা প্রতিজ্ঞা করেন মৃত্যু পর্যন্ত তা পালন করার ক্ষমতা রাখেন। এদের শুধুমাত্র এমন একটি ভয় থাকে যেন কোথাও কখনও ভুল প্রতিজ্ঞা না করে ফেলেন। এদের অভিপ্রায় হচ্ছে এরা ভাবনা স্তরের মনুষ্য। আত্মিক স্তরের ব্যক্তির আমিত্বের পরিসর পুরো সমাজের পরিসর অবধি চলে আসে। এরা সমাজের সুখের জন্য কিছু না কিছু করার জন্য তৈরি থাকেন। যারা এই প্রকার গভীরভাবে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তন-মনন করতে পারেন তারা সমস্ত দিকগুলি জেনে নিয়ে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এরা সিদ্ধান্তকে শীঘ্রই গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই তা কর্মে রূপান্তর করতে পারেন। সমষ্টির আধারে তাদের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। সমষ্টির সকল সুখ-দুঃখ তারা এভাবে অনুভব করে যেভাবে নিজের সুখ-দুঃখকে অনুভব করেন, নিজের পরিবারের বেলায় অনুভব করেন, নিজের সমাজের বেলায় অনুভব করেন। তারা গবেষণা ও অনুসন্ধানে দক্ষ হন এবং স্বভাবে বৈজ্ঞানিকদের মতন হন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন। পক্ষপাতহীন হন। অন্তর্মুখী হন। সর্বদা সত্য, ন্যায়, প্রেম এবং পুণ্যের পক্ষ নিয়ে থাকেন। এদের প্রতিটি কর্ম সমষ্টির স্তরেই হয়ে থাকে। এদের আত্মিক স্তরের মনুষ্য বলা হয়। তারা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পান এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখতে পান। এরা জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ হন। বিবেকবান হন। প্রজ্ঞাবান হন। এদের দ্বারা কদাচিৎ কোনো ভুল হয় তাও অজ্ঞাতসারে। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে আমরা এটি বুঝেছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলত কী এবং কী কারণে শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যক এবং অনিবার্য হওয়া উচিত। তা হবে সহজভাবে

জোরপূর্বক নয়। যে শিশু সহজভাবে স্বেচ্ছায় নিজেকে যতটা বিকশিত করতে পারবে করবে। তবে আমরা
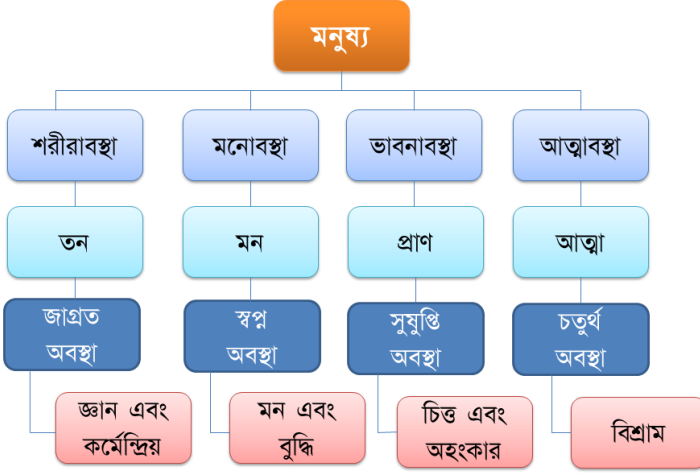
এমন পদ্ধতি খুঁজে নিতে পারি যার মাধ্যমে শিশু খেলতে খেলতে সর্বাধিক বিকশিত অবস্থাকে প্রাপ্ত করে নিতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখী হওয়া। বিকশিত হওয়া নয়। বিকশিত হওয়া কেবলমাত্র একটি সাধন মাত্র লক্ষ্য কিন্তু নয়। সুখ প্রাপ্তিই হচ্ছে মূল লক্ষ্য অন্য কিছু নয়। এই সত্যকে সদা মনে রাখা উচিত।

ভাষার মাধ্যমে মন, গণিতের মাধ্যমে বুদ্ধি, সংজ্ঞানের মাধ্যমে চিত্ত এবং দর্শনের মাধ্যমে অহংকার বিকশিত হয়। শিক্ষার শুধুমাত্র এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। এর থেকে কমও হবে না এবং এর থেকে অধিকও হবে না। এটি খেয়াল রাখতে হবে যে সমস্ত শিক্ষা যেন আনন্দের সাথে প্রদান করা হয় সামান্যতমও ক্লেশ না দিয়ে। পুনরায় উল্লেখ করছি যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সদা সুখী হওয়া। এই কথাকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। কর্ম আপনি যাই করুন না কেন। আমাদের কোনো কর্ম থেকে কেউ যেন দুঃখী না হয়। শিক্ষার অন্তর্গত খেলাধূলোরও বড় অবদান রয়েছে। শারীরিক ক্রীড়া, মানসিক ক্রীড়া, ভাবনাত্মক ক্রীড়া এবং চেতনামূলক ক্রীড়া— এই চারপ্রকার ক্রীড়া হয়ে থাকে। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আজীবন চলতে থাকবে। যে ব্যক্তি যে ক্রীড়া অনুশীলন করতে চাইবে সর্বদা তা করার সুযোগ-সুবিধা পাবে।

পঞ্চবর্ষীয় প্রশিক্ষণ বিধান

এই জগতে বিভিন্ন প্রকারের শিশুরা রয়েছে। যারা বড় হয়ে পছন্দমত কোনো একটি কর্মকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচন করবে। যেন সে সমাজের সুখের জন্য পছন্দের কর্মের মাধ্যমে তা পূরণ করতে পারে। আমরা জানি যে একজনের কর্ম অন্য জনের জন্য সুখসুবিধা এবং অধিকার তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ অধ্যাপকের কর্ম চয়ন করেন তাহলে এর অর্থ অধ্যাপনা তার কর্ম। তবে উভয়েই শিক্ষা আদান প্রদানের সুবিধা অধিক নিতে পারবেন। আর যদি অধ্যাপকের চয়ন সঠিকভাবে না হয় তাহলে অধ্যাপনার কর্মও সঠিকভাবে হবে না। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বিদ্যা বা অধ্যয়নের সুবিধা পাবে না এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কর্ম প্রদান করার সময়ও তাদের পছন্দের উপর ধ্যান রাখা উচিত, নাহলে মানুষ মনপ্রান দিয়ে দায়িত্ব পালন করবে না। যার ফলে উচ্চ গুণ সম্পন্ন ফলাফল আসবে না। এই কথাটি আপনি প্রতিটি কর্ম, অধিকার এবং সুবিধার উপর পরখ করে দেখতে পারেন। যদিও আমরা চাই সকলেই যেন নিজেদের সমস্ত সুখসুবিধা পরিপূর্ণভাবে পায়। তাই সমস্ত কর্মকে সমুচিতভাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অতঃপর উচিত মনুষ্য তৈরি করা এবং তাকে পরীক্ষা করে সমুচিত কর্ম নির্বাহ করার দায়িত্ব প্রদান করাই বিদ্যালয়ের কর্ম। পরীক্ষা যেন শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করার জন্যই নেওয়া হয়ে থাকে— দুটো শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করার জন্য নয়। পরীক্ষা যেন এটি জানার জন্য নেওয়া হয় যে শিক্ষার্থী কোনোপ্রকার কর্ম সম্পাদন করার জন্য যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা তা যাচাই করা। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করার জন্য নেওয়া উচিত নয়। এটি সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং দুঃখদায়ী। আমাদের একজনের সাথে অপরজনের তুলনা কখনও করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষ ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কেউ একটি বিষয়ের যোগ্য হয়ে থাকে, অন্য কেউ অপর কোনো বিষয়ের যোগ্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতা সমাজের জন্য প্রয়োজন হয়। তা নাহলে বিভিন্ন প্রকার কর্ম সম্পাদিত হতে পারবে না। ভিন্ন-ভিন্ন সুখসুবিধা উৎপন্ন হবে না, ফলে আমরাও ভিন্ন-ভিন্ন সুখসুবিধা উপভোগ করতে পারব না। এইজন্য আমাদের বোঝা উচিত যে একটি পূর্ণ সমাজ তৈরি করার জন্য সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন হয় এবং সকল প্রকার মানুষের যোগদান প্রয়োজন হয়। তত্ত্বগত দিক দিয়ে সকলেই তো এক। কারোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। বিভিন্ন প্রকার কর্মকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই ভেদ কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে হয়ে থাকে যা আবশ্যকও বটে।

পঞ্চবর্ষীয় পাঠ্যক্রমে চার প্রকারের প্রশিক্ষণ থাকবে।

১. কৃষি শিক্ষা
২. উৎপাদনশিল্পকর্ম শিক্ষা
৩. প্রশাসনিক শিক্ষা
৪. নেতৃত্ব শিক্ষা

পরীক্ষা বার্ষিকরূপে হবে এবং দু-প্রকারের হবে। লিখিত এবং মৌখিক। দুটো পরীক্ষাতেই প্রশ্ন ভিন্ন-ভিন্ন আসবে। ফলাফল নম্বর দিয়ে প্রকাশ করা হবে। শিক্ষার্থীর নম্বর অধিক আসার ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন হবে। কাউকেই অনুত্তীর্ণ করা হবে না। যে শিক্ষার্থীর নম্বর শূন্য থেকে ১০০ অবধি আসবে সেই নম্বর দেখেই তাকে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রবেশ করানো হবে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতিটি শ্রেণীতেই তাদের যোগ্যতা এবং গুনাগুণ যাচাই করা হবে। তিন প্রকারের শ্রেণী থাকবে। ০ থেকে ৩৩ শতাংশ অবধি তৃতীয় শ্রেণী, ৩৩-র উপরে ৬৬ শতাংশ অবধি দ্বিতীয় শ্রেণী, ৬৬-র উপর ১০০ শতাংশ অবধি প্রথম শ্রেণী। এই প্রকারে ক্রমশঃ নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চপদে তারা আসীন হবে।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের বিধান

এই বিধানের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালিত হবে। বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা চলতে থাকবে। গবেষকদের 'বৈজ্ঞানিক' উপাধিতেই জানা যাবে। গবেষণামূলক শিক্ষাকে তিন ভাগে রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ এখানেও তিনটি শ্রেণী থাকবে। যেমন আপনার শরীর, মন এবং প্রাণ হয়ে থাকে। সেই প্রকারে সমষ্টির মধ্যেও পদার্থ, প্রকৃতি এবং প্রাণ হয়ে থাকে। পদার্থের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য অধিভৌতিক বিজ্ঞান, প্রকৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য অধিদৈবিক বিজ্ঞান এবং প্রাণের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। অধিভৌতিক শিক্ষা, অধিদৈবিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা— এই তিন প্রকারের গবেষণামূলক শিক্ষা থাকবে। অধিভৌতিক শিক্ষায় কৃষি, উৎপাদনশিল্প, প্রশাসন, নেতৃত্ব প্রদানের অধ্যয়ন এবং গবেষণা থাকবে। অধিদৈবিক শিক্ষার অন্তর্গত সমস্ত প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন এবং গবেষণা থাকবে। আর আধ্যাত্মিক শিক্ষার অন্তর্গত প্রাণ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা আসবে। যে কর্ম অধিভৌতিক বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হবে না তার জন্য অধিদৈবিক বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হবে। যেমন পরিবেশ দূষণ,

অগ্নিকাণ্ড, গ্রহ-নক্ষত্রের দুষিত প্রভাব, ভুমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বড় মহামারী, খরা বা অনাবৃষ্টি, অতি বর্ষণ, উল্কাপিণ্ড ইত্যাদি সকল প্রকার দুর্যোগ। প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তার ভারসাম্য বজায় রাখাই অধিদৈবিক বিজ্ঞানের মুখ্য কর্ম হবে। এই প্রকারে যে কর্ম অধিদৈবিক বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হবে না তা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। যেমন প্রাণশক্তি সম্পর্কিত কোনো রোগ অথবা সমষ্টির মধ্যে প্রাণশক্তি সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা অথবা আত্মিক শান্তির জন্য যোগ ইত্যাদি উপায়সমূহ। প্রাণশক্তির বিজ্ঞানকে জেনে তার ভেতর এবং বাহিরের ভারসাম্য বজায় রাখাই এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের কর্ম হবে। এমন কোনো কর্ম এই সংসারে নেই যা এই তিন প্রকার বিদ্যা দ্বারা সম্পন্ন করা যাবে না। এই তিন প্রকার বিদ্যা নিয়ে যারা অধ্যয়ন, গবেষণা এবং জগতের ভারসাম্য বজায় রাখবে তাদেরকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বলা হবে। সাধারণতঃ অধিভৌতিক বিজ্ঞানীদের আবাসস্থল এবং কর্মস্থল সমাজের মধ্যেই থাকবে। অধিদৈবিক বিজ্ঞানীদের আবাসস্থল এবং কর্মস্থল অরণ্যের মধ্যে থাকবে। কোনো বিশেষ প্রয়োজনেই তারা জনগণের সান্নিধ্যে আসবে। সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য তাদের একান্তে থাকা আবশ্যক। আর তাদের গবেষণাও তো প্রকৃতিকে নিয়েই। এইজন্য সমাজের মধ্যে বসবাস করা এদের পক্ষে উপযুক্ত হবে না। সরকার দ্বারা তাদের জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এদের পরিবার চাইলে সমাজের মধ্যে বাস করতে পারে চাইলে অরণ্যে থাকতে পারে। আধাত্মিক বৈজ্ঞানিকরা পুরো পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বিচরণ করতে পারে অথবা যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারে। অর্থাৎ আজ এখানে তো কাল অন্য কোথাও। এই শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা হবেন পরিযায়ী প্রকৃতির। এনারা পূর্ণ জ্ঞানী হবেন। প্রাণ বিষয়ে এদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী কোনো সময় করব। সচেতন অবস্থায় থাকা মানুষই কেবলমাত্র তাদের রুচি অনুসারে এই তিন প্রকার বিদ্যা অধ্যয়নের অধিকারী হবেন।

***

অধ্যায় ৮

কর্মের প্রকারভেদ

সমাজে চার প্রকারের কর্ম হয়ে থাকে— কৃষি কর্ম, উৎপাদনশিল্পকর্ম কর্ম, প্রশাসনিক কর্ম এবং নেতৃত্ব কর্ম। সাংস্কৃতিক সুখ বাস্তবে কীভাবে উৎপন্ন হয় যদি জেনে যাই তবে ব্যবস্থা তৈরির ভিতকে আমরা সরলভাবে বুঝতে পারব। যখন কেউ কোনো কর্মকে সফলতার সাথে সম্পন্ন করে তখন সেই কর্মের মাধ্যমে ভোগ করার সামগ্রী উৎপাদিত হয়। আর সেই ভোগের জ্ঞান, উৎপাদন এবং উপভোগকরাকেই সুখ নামে আমরা জানি। অর্থাৎ বিশ্বে যত রকম কর্ম সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয় তা সবই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ভোগের নির্মাণ করে থাকে। আর এই ভোগ জ্ঞান, কর্ম এবং উপভোগের মাধ্যমে ভোগ করা হয়। এই ভোগের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকার সুখ প্রাপ্ত করতে পারি। সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়া কর্মের উপরই এইপ্রকার সুখ নির্ভর করে। এটি মনে রাখতে হবে যে নতুন ব্যবস্থা তৈরির সময় পেশা নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যেন তারা নিশ্চিতভাবে সফল হয়। আপনারা সকলে এটি নিশ্চয়ই জানেন যে প্রতিটি কর্ম সফলতার সাথে সম্পাদন করার জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা, ক্ষমতা, গুণাগুণ, কুশলতা এবং পছন্দ— এই পাঁচ উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই পাঁচ উপাদান থেকে যদি কোনো একটি উপাদান অনুপস্থিত থাকে তবে কর্মের সফলতা ততটাই অনিশ্চিত হয়ে যাবে অথবা হতে পারে সেই কর্ম ফলাফল হিসেবে সুখের পরিবর্তে দুঃখ বয়ে আনবে। কর্ম যত বেশী সংবেদনশীল হবে তাতে এই পাঁচ উপাদানের মাত্রার প্রয়োজন ততটাই বেশী হবে। অর্থাৎ প্রথমে আমাদেরকে কর্মের বর্গীকরণ করতে হবে এবং জানতে হবে যে কোন ধরনের কর্মের জন্য এই পাঁচ উপাদান কতটা মাত্রায় লাগবে। তারপর সেইমত কর্ম সম্পাদন করার জন্য মানুষকে তা বণ্টন করে দিতে হবে। এই বিষয়টিকে বোঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। যদি কোনো একটি যানবাহন চালকের উদাহরণ নিই— যেমন সাইকেল, রিক্সা, মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, বিমান, মহাকাশযান ইত্যাদি। এখন সাইকেল চালককে দেখলে বুঝতে পারব যে সাইকেল চালনা শেখার জন্য সাধারণ জ্ঞান এবং সামান্য অভ্যাস প্রয়োজন হয়, এতে ঝুঁকিও কম থাকে। যদি সাইকেল নিয়ে কেউ পড়েও যান তবে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা না হবার

মতনই থাকে। সাইকেল চালক খুব বেশি আঘাতপ্রাপ্তও হন না আর সাইকেল বিরাট অংকের দামীও হয় না। রিক্সা চালানো আরেকটু কঠিন এবং সাইকেলের চাইতে একটু বেশী ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এইভাবে মোটর সাইকেল চালানো শেখা আরেকটু কঠিন এবং দুর্ঘটনা ঘটলে দুজনের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সাইকেল ও রিক্সার তুলনায় মোটর সাইকেল বেশ দামীও হয়। মোটরগাড়ি চালানো শেখা আরেকটু কঠিন এবং দুর্ঘটনা ঘটলে গাড়িতে বসা পাঁচ জনেরই প্রাণ বিসর্জন হতে পারে। এইভাবে আপনি দেখতে পারেন যে বাস চালানো শেখা অধিক দায়িত্বপূর্ণ এবং দুর্ঘটনা ঘটলে ৬০ জন সওয়ারির মৃত্যু হতে পারে। আবার রেলগাড়ির ক্ষেত্রে শতাধিক যাত্রী হতাহত হতে পারে। ঠিক এভাবে অবশিষ্ট সব কর্মের দায়িত্বসমূহকে বুঝে নিতে হবে যে কোন কর্ম কতটা জ্ঞানযুক্ত এবং সংবেদনশীল। সমুচিত যোগ্যতা, ক্ষমতা, গুণাগুণ, কুশলতা ইত্যাদির ভিত্তিতে পছন্দসই ব্যক্তিকেই নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত। এর সাথে কোনোভাবেই সমঝোতা করা উচিত নয় নাহলে দেরী হলেও এর পরিণাম দুঃখদায়ীই হবে এবং আমরা তা এড়াতে পারব না। কিছু মানুষ বলেন যে সকল কর্ম সকলের জন্য বরাদ্দ থাকা উচিত। কিন্তু এখানে এটি বোঝা আবশ্যক যে কর্মের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকা উচিত যদি সেই ব্যক্তি ওই পাঁচ উপাদান পূরণ করতে পারেন। নাহলে সমাজে দুর্ঘটনার বন্যা বয়ে যাবে। কোনো ভোগ্য বস্তুই উচ্চ গুণমানের নির্মিত হবে না। এতে সুখ উৎপন্ন না হয়ে বরং দুঃখ উৎপন্ন হতে শুরু করবে। এমন কোনো জেদ করা উচিত নয় যেখানে সম্পূর্ণ যোগ্যতা ছাড়াও কাউকে সেই কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব দিয়ে দেবে। সকলের জন্য এটি অত্যন্ত হানিকারক হবে। আর আমরাও তো সাধারণত নিজেদের পছন্দের কর্মই করতে চাইব। যখন আমরা নিজেদের রুচি অনুসারে বিদ্যা অর্জন করতে পারছি, নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিতে পারছি, যেখানে সকল কর্মের বেতনও সমান থাকবে, যেখানে সমান বেতনের প্রভাবে সকল কর্মের মান বরাবর হয়ে যাবে— তাহলে আমরা ভিন্ন কর্ম কেন করতে চাইব? রুচিহীন কর্ম করলে আমরা তো স্বাভাবিকভাবে দুঃখই অনুভব করব। তাহলে যেসব ব্যক্তি এমনটি বলছে যে সকলেকে সব কর্ম করতে দেওয়া উচিত, বাস্তবে এটি বলার কারণ হচ্ছে তারা মনে করে কিছু কর্ম আরামদায়ক এবং অধিক আয়যুক্ত। এমনকি অধিক আয় থাকার কারণে সমাজে অধিক সম্মান পাওয়া যায়। সুতরাং সকলেকে যদি কর্মের সুযোগ না দেওয়া হয় তবে তারা সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুঃখী হবে। আমি এই বিষয়ে তাদেরকে বলতে চাই— যদি সকল কর্মের মান একসমান করে দেওয়া যায় তাহলে তো সমস্যাই থাকে না। আর মান ঠিক হয় জীবন-যাপনের স্তরের উপর। যার জীবন-যাপনের মান কম স্তরের হয় তার মানও কম হয় এবং যার জীবন-যাপনের মান অধিক স্তরের হয় তার মানও অধিক হয়। তাহলে নতুন ব্যবস্থাতে তো এই সমস্যা উৎপন্নই হবে না কেননা সকল কর্মের মান একসমান হবার ফলে সকলের মান একসমান

হয়ে যাবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে কিছু কর্ম তো কম বেতনের হলেও তা অধিক সম্মানীয় হয়ে থাকে। মূলত বাস্তবে এমনটি নয়। যদি আপনি পুরো হিসেব মিলিয়ে দেখতে চান তাহলে জানবেন যে বেতনের অর্থ সেটি নয় যেটি আপনি মূল্য হিসেবে পান। বরং সেই পদের কারণে যে উপকার আপনি পান সেটিকেও তো বেতন হিসেবে ধরা উচিত। আমরা এই বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নিতে পারি— সমাজে আমাদের মান এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে বাস্তবে আমরা কীরূপে জীবন-যাপন করতে পারছি। আর নতুন ব্যবস্থায় তো সকলের জীবনস্তর সমান হবে এবং সর্বাধিক উন্নত হবে। এতে মান-সম্মানজনিত সমস্যার দূরীকরণ ঘটবে।

একটি কথা তো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে কর্মের নির্ধারণ কীভাবে করতে হবে। এবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই কর্মগুলি সফলতার সাথে সম্পন্ন হলে যে ভোগ উৎপন্ন হবে তার বিতরণ কীভাবে করা হবে যেন তা সকলের ইচ্ছানুসারে সহজেই সকলের কাছে পৌঁছে যায়। কার কোন ভোগের ইচ্ছে অথবা ডিমান্ড রয়েছে তা জানতে অথবা কোন প্রকারের ভোগ সে চাইছে তার জন্য পূর্বেই উল্লেখ করে দিয়েছি যে একটি অনলাইন পোর্টালের অন্তর্গত সকলে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী ভোগ্যবস্তুর চাহিদা রাখতে পারবে বা অর্ডার করতে পারবে।

রাষ্ট্রীয় উপজীবিকা নীতি

যোগ্যতা, ক্ষমতা, কুশলতা, গুণাগুণ ও পছন্দ অনুযায়ী সকলেকে কোনো একটি কর্ম উপজীবিকা বা পেশা হিসেবে নিশ্চিতভাবে প্রদান করা হবে। যদি কোনো কারণবশত সরকার কোনো জীবিকা প্রদান করতে না পারে তাহলে সরকার তাকেও সমান জীবন-যাপনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। শিশুদের ২৫ বছর বয়স অবধি সমস্ত খরচ সরকার বহন করবে এবং গৃহকর্মের সেবায় নিযুক্ত স্ত্রী অথবা স্বামীকেও সরকার সমান জীবনস্তর প্রদান করবে। সকল অসুস্থ্য, অযোগ্য এবং ৫০ বছরের উপরের ব্যক্তিদের জীবনস্তরও সমান থাকবে। অর্থাৎ সকলের জীবনস্তর একসমান হবে। এর অর্থ হচ্ছে কেউ আর্থিক ভাবে অপরের উপর নির্ভর থাকবে না। সরাসরি সরকার সকলের জন্য সবরকম ব্যবস্থা করবে। ফলে সকলের জীবনস্তর একসমান থাকবে।

উপজীবিকার প্রকারভেদ

১. কৃষি
২. উৎপাদনশিল্প
৩. প্রশাসন
৪. নেতৃত্ব

এই চার প্রকার জীবিকার তিনটি করে শ্রেণী থাকবে। মৃদু, মধ্যম এবং উত্তম। ৩৩ শতাংশ নম্বর অবধি মৃদু শ্রেণী, ৩৩ থেকে ৬৬ শতাংশ নম্বর অবধি মধ্যম শ্রেণী এবং ৬৬ শতাংশ থেকে অধিক নম্বর প্রাপকদের উত্তম শ্রেণী হিসেবে মান্য করা হবে। যেমন— কৃষি ক্ষেত্রে যদি ধরে নিই মৃদু শ্রেণীর মানুষ চাষবাস করবে, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ বাগান করবে এবং উত্তম শ্রেণীর মানুষ দুগ্ধ উৎপাদন করবে। একইভাবে উৎপাদনশিল্পের ক্ষেত্রে মৃদু শ্রেণীর মানুষ সামান্য কারিগরি কর্ম করবে, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ মাঝারী কারিগরির কর্ম করবে এবং উত্তম শ্রেণীর মানুষ উচ্চ পর্যায়ের কারিগরি কর্ম করবে। এইভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৃদু শ্রেণীর মানুষ জনগণের মাঝে কর্ম করবে, মধ্যম শ্রেণীর মানুষ তথ্য সংগ্রহের কর্ম করবে এবং উত্তম শ্রেণীর মানুষ ব্যবস্থাপনার কর্ম করবে। এইভাবে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেও মৃদু শ্রেণীর ব্যক্তি বিধায়কের কর্ম সম্পাদন করবে, মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের কর্ম সম্পাদন করবে এবং উত্তম শ্রেণীর ব্যক্তি প্রশিক্ষকের কর্ম সম্পাদন করবে। উদাহরণ হিসেবে মৃদু শ্রেণীর ব্যক্তিদের গ্রাম এবং জেলায় বিধায়ক স্তরের নেতৃত্ব হিসেবে নির্বাচন করা হবে। মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তিদের রাজ্য এবং দেশের মন্ত্রী স্তরের নেতৃত্ব হিসেবে নির্বাচন করা হবে এবং উত্তম শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিশ্বস্তরের প্রশিক্ষকদের থেকে নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।

জীবিকার ভিত্তিতে চার প্রকারের কর্ম হবে—

১. শারীরিক যোগ্যতা-প্রধান কর্ম

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা পুষ্টি সম্পর্কীত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য অন্ন উৎপাদন, ফল উৎপাদন, পশুপালন ইত্যাদি কৃষিকর্ম সম্পাদন করবেন।

২. মানসিক যোগ্যতা-প্রধান কর্ম

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সমৃদ্ধি সম্পর্কীত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য উৎপাদনশিল্পকর্ম সম্পাদন করবেন।

৩. ভাবনাত্মক যোগ্যতা-প্রধান কর্ম

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জনসেবা সম্পর্কীত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কর্ম সম্পাদন করবেন। অর্থাৎ প্রশাসন, ন্যায় ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জনসেবা, সুরক্ষা, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি কল্যানকারী কর্মসমূহ।

৪. চেতনাত্মক যোগ্যতা-প্রধান কর্ম

এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা জনগণের নেতৃত্ব সম্পর্কীত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কর্ম সম্পাদন করবেন। অর্থাৎ আইন কানুন অথবা নীতিনিয়মের ব্যবস্থাপনার মত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কর্মসমূহ।

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সরকার বিভিন্ন বস্তু এবং পরিষেবা উৎপাদন করবে। যে সকল বস্তু অথবা পরিষেবা প্রদান করা সমাজের পক্ষে সুখদায়ক হবে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে কোনো দুস্প্রভাব পড়বে না ততদিন অবধি সরকার সেইসব বস্তু বা পরিষেবা উৎপাদন করবে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন বস্তু অথবা পরিষেবা ব্যবহারের অনুমতি বৈজ্ঞানিকগণ না দিলে সরকার তা উৎপাদন করতেও পারবে না।

কৃষি উপজীবিকা

কৃষি উপজীবিকার অন্তর্গত মূলত তিন প্রকারের কর্ম থাকবে। অন্ন উৎপাদন, ফল উৎপাদন এবং দুগ্ধ উৎপাদন। কৃষি বিভাগ এইসবের প্রবন্ধন করবে।

১. নির্বাচন অনুযায়ী যাদের শারীরিক অবস্থা মৃদু শ্রেণীর হবে তারা অন্ন উৎপাদনের কর্ম করবে। যেমন রবি শস্য, খারিফ শস্য ইত্যাদি। তারা চাষবাস সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদন করবে।

২. নির্বাচন অনুযায়ী যাদের শারীরিক অবস্থা মধ্যম শ্রেণীর হবে তারা উদ্যান বিষয়ক কর্ম করবে। অর্থাৎ শাক, ফল এবং ফুলের উৎপাদন সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদন করবে।

৩. নির্বাচন অনুযায়ী যাদের শারীরিক অবস্থা উত্তম শ্রেণীর তারা দুগ্ধ উৎপাদন সম্পর্কিত কর্ম করবে। দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য কেবলমাত্র সেইসব পশু এবং উদ্ভিদের

ব্যবহার করা হবে যাদের বৈজ্ঞানিকগণ উপকারী হিসেবে নির্বাচিত করে দেবেন। তারা দুধ, দই, ঘি, লস্যি ইত্যাদি উৎপাদন করবে।

উৎপাদনশিল্প উপজীবিকা

উৎপাদনশিল্পকর্ম বিভাগ এই উপজীবিকার অন্তর্গত সকল ব্যবস্থা প্রবন্ধন করবে। নির্বাচন অনুযায়ী যাদের মানসিক অবস্থা মৃদু শ্রেণীর হবে তারা সাধারণ কারিগরি বিষয়ক কর্ম করবে। অর্থাৎ যেসব কর্মে কারিগরি প্রযুক্তি সাধারণ স্তরের হবে। যেমন— ছুতোর, প্লাম্বার, দর্জি, ইলেকট্রিক ফিটার অথবা রিপেয়ারিং, সাধারণ মেশিন চালক, মুচি, নাপিত, ধোবা, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, কামার, গয়না প্রস্তুতকারক, বিজ্ঞাপনদাতা, নির্মাণ কর্মী ইত্যাদি। একইরকমভাবে মধ্যম স্তরের জীবিকার নির্বাচন হবে। যেমন— বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সফটওয়ার প্রোগ্রামিং, বিভিন্ন প্রকার ডিজাইনিং ইত্যাদি। আর উচ্চস্তরের জীবিকার মধ্যে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট পদ থাকবে।

প্রশাসনিক উপজীবিকা

প্রশাসনিক জীবিকা বা সার্বজনিক পরিষেবার অন্তর্গত তিনপ্রকার কর্ম থাকবে। শ্রমিক, কেরানি এবং ব্যবস্থাপন। প্রশাসনিক বিভাগে তাদের যোগ্যতা, পছন্দ ইত্যাদির আধারে তাদের পেশা প্রদান করবে।

১. নির্বাচন অনুযায়ী ভাবনাত্মক স্তরে যারা মৃদু শ্রেণীর অন্তর্গত তারা ক্ষেত্রীয় শ্রমিকের পদে কর্ম করবে। অর্থাৎ সার্বজনিক ক্ষেত্রে কর্মের জন্য শ্রমিকদের যোগ্যতা, পছন্দ ইত্যাদির আধারে তাদের কোনো একটি পদ প্রদান করা হবে। এখানে শ্রমিকের অর্থ হচ্ছে নিজ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্ম সম্পাদন করা।

২. নির্বাচন অনুযায়ী ভাবনাত্মক স্তরে যারা মধ্যম শ্রেণীর হবে তারা কেরানির পদে কর্ম করবে। অর্থাৎ সার্বজনিক ক্ষেত্রে কেরানি পদের জন্য তাদের যোগ্যতা ও পছন্দের আধারে কোনো একটি পদ প্রদান করা হবে। কেরানির অর্থ হচ্ছে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এমনভাবে রাখতে হবে যেন প্রয়োজন পড়লে তারা সমস্ত তথ্য নির্দিষ্ট আধিকারিককে উপলব্ধ করে দিতে পারেন। তথ্য সম্প্রচার বিভাগের অধীনে

কর্মরত সকল শ্রমিকরা তা উপলব্ধ করাবে। তারা একপ্রকারের ডাটা ম্যানেজমেন্টের কর্ম করবে।

৩. নির্বাচন অনুযায়ী ভাবনাত্মক স্তরে যারা উত্তম শ্রেণীর হবে তারা ব্যবস্থাপনার কর্ম করবে। ব্যবস্থাপক পদে তাদের যোগ্যতা ও পছন্দের আধারে কোনো একটি পদ প্রদান করা হবে। ব্যবস্থাপকের অর্থ হচ্ছে তিনি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো কর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তার জন্য উত্তরদায়ী থাকবে। যা প্রশাসনিক দিক থেকে প্রদান করা হবে। যদি কোনো সমস্যা আসে এবং নিজের থেকে সমাধান করতে না পারেন তাহলে প্রশাসন থেকে সমাধান নিতে পারেন।

বিভিন্ন কমিশন
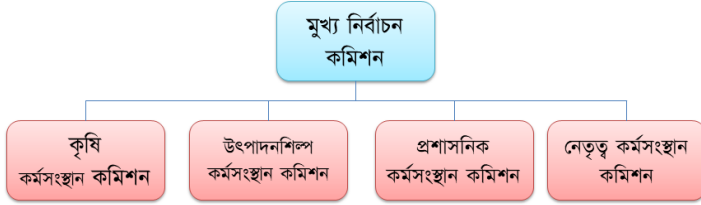
সংসদীয় উপজীবিকা

সংসদীয় অথবা নেতৃত্ব অথবা প্রশাসনিক উপজীবিকার অন্তর্গতও তিন প্রকার কর্ম থাকবে। অধিভৌতিক নেতৃত্ব, অধিদৈবিক নেতৃত্ব এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব। কর্মসংস্থান বিভাগ এইসব উপজীবিকার অন্তর্গত প্রত্যেক কর্মচারীর যোগ্যতা ও পছন্দের আধারে জীবিকা প্রদান করবে।

১. নির্বাচন অনুযায়ী চেতনাবস্থায় মৃদু শ্রেণীর ব্যক্তিরা অধিভৌতিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কর্ম করবেন গ্রাম অথবা জেলা স্তরের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। এই বিভাগের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য থাকবেন বিচারক, উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমুখ ব্যক্তিরা। অর্থাৎ বিধায়ক পদের জন্য গ্রাম বা জেলা স্তরের নেতৃত্ব পদ থাকবে। যাদের অধিভৌতিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

২. একইভাবে নির্বাচন অনুযায়ী চেতনাবস্থায় মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তিরা অধিদৈবিক নেতৃত্ব পদের জন্য কর্ম করবেন রাজ্য অথবা দেশ স্তরের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। এই বিভাগের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য থাকবেন বিচারক, উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমুখ। যাদের অধিদৈবিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

৩. নির্বাচন অনুযায়ী চেতনাবস্থায় উত্তম শ্রেণীর ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব পদের জন্য কর্ম করবেন বিশ্বস্তরের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। এই বিভাগের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য থাকবেন বিচারক, উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রমুখ। যাদের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান গবেষণার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

প্রারম্ভে আমি চার প্রকার প্রশ্নপত্র তৈরি করে দেব যার মাধ্যমে এই চার স্তরের ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হবে। অতঃপর শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বিদ্যালয় থেকেই তাদের নির্বাচন হতে থাকবে। এর পরও যদি কারোর মনে হয় তিনি উপযুক্ত, তবে তিনি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে জীবিকা গ্রহণ করতে পারবেন।

সকলের মান-মর্যাদা এবং পারিশ্রমিক সমান থাকবে কেন?

কেউ কেউ বলেন বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানের জন্য বেতনও ভিন্ন-ভিন্ন হওয়া উচিত। কেননা কর্ম বিশেষে শ্রম ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। স্থুল ভাবনায় একথা সঠিক বলেই মনে হয়। কিন্তু তা বাস্তবে জীবনের উদ্দেশ্যকে পূরণ করে না বরং বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আসুন বুঝে নিই এই নীতি মূলত কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?

যদি আমরা পারিশ্রমিক সমান না রাখি তবে যেসব বস্তু উচ্চ বেতনভোগী মানুষ দ্বারা নির্মিত হবে তার মূল্য স্বাভাবিকভাবে অধিক হবে। আর অধিক মুল্যের হলে স্বল্প আয়ের মানুষ তা ক্রয় করতে পারবে না। অর্থাৎ সমাজের একটি বড় অংশ উচ্চ মুল্যের বস্তু বা পরিষেবা উপভোগ করতে পারবে না। অর্থাৎ এই বর্গের মানুষ উক্ত সুখ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাবে। তখন কম বেতনভোগী মানুষ দামী বস্তু পেতে কোনো না কোনো উপায় খুঁজবে। কেননা তারাও উচ্চ মূল্যের বস্তু এবং পরিষেবা থেকে প্রাপ্ত সুখ উপভোগ করতে চাইবে। সমাজে মানুষ দু-প্রকারের সুখ উপভোগকারী হয়ে থাকে। প্রথমত— সংবিধান অনুযায়ী এবং দ্বিতীয়ত— সংবিধানের বিপরীত। সংবিধানে তো আমরা উল্লেখ করে

দিয়েছি যে কম বেতনভোগী মানুষ উচ্চ মুল্যের বস্তু/পরিষেবা উপভোগ করতে পারবে না। তাহলে দ্বিতীয় উপায় যেটি থাকে তা হল বিভিন্ন প্রকার অপরাধমূলক পথ। এভাবেই দুর্নীতি এবং অপরাধের কারণ তৈরি হয়ে যাবে। বলপ্রয়োগ দ্বারা অপরাধ কিছুটা কম করা গেলেও নির্মূল করা সম্ভব হবে না। এই প্রকার বলপ্রয়োগ সমাজে অশান্তি, অস্থিরতা, সন্ত্রাসী ইত্যাদি উৎপন্ন করবে। সকলে সর্বদা কলহ এবং অসন্তোষ নিয়ে বেঁচে থাকবে। এমনতর পরিবেশে আমরা সাধারণ বস্তুও সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারব না। প্রশাসনও সময়, শ্রম এবং অর্থ এইসকল অশান্তি, কলহ, অপরাধ ইত্যাদির ভারসাম্য রক্ষার কাজে লেগে থাকবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সমাজে আর্থিক সমতা কতটা আবশ্যক। আর্থিক সমতা না হবার কারণে অন্যান্য সমতাগুলিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমান হতে পারবে না। কিন্তু সকল মানুষই তো সমস্ত রকমের সুখ উপভোগ করতে চায়। তা নাহলে চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, অপহরণ, দুর্নীতি, ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ অন্যান্য সকল সমস্যা যা থেকে মানুষ দুঃখ অনুভব করে আসছে তা ঘটতে শুরু করবে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে পারিশ্রমিক সমান হওয়াটা কতটা অনিবার্য। পারিশ্রমিক সমান ধার্য করা ছাড়া বিশ্বের কোনো ব্যবস্থা ন্যায়শীল হতে পারে না এবং ন্যায়শীল ব্যবস্থা স্থাপিত না হলে সমস্তরকম ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা উৎপন্ন হতেই থাকবে। যেমনটি আপনি বর্তমান ব্যবস্থায় দেখছেন। একথাও যুক্তিযুক্ত যে সকলের পারিশ্রমিক যখন সমান রাখতে হবে তখন বাস্তবে পারিশ্রমিক থাকার প্রয়োজনীয়তাও আর গুরুত্ব পাবে না। ব্যাস তারপর সকল শ্রমের মূল্য আপনিই সমান হয়ে যাবে। অর্থাৎ যার যা প্রয়োজন হবে তা সে স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে যাবে। ফলে সকলের জীবনস্তর সমানরূপে সমৃদ্ধশালী হবে।

ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যার জন্য দায়ী কে?

এটি শুনে আপনি আশ্চর্য হবেন যে আর্থিক বৈষম্যও আধ্যাত্মিক সমস্যার কারণ। এখনো অবধি মানুষ জেনে আসছে যে ভৌতিক সমস্যা এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা ভিন্ন-ভিন্ন, আর এদের পেছনে কারণও রয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন। বাস্তবে কিন্তু এমনটি নয়। মূল কারণ একটিই তা হচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে আর্থিক অসমতা। এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক সমস্যা। আমাদের ভেতরে মন অশান্ত হয়ে গিয়েছে এমনটি মূলত নয়। আমরা নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ অনুভব করি। জীবনকে স্বাধীন অনুভব করি না। নিজেকে হীন অনুভব করি। আমাদের ভেতরে অনাবশ্যক চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। যখন তা নিরন্তর চলতে থাকে তখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। আমরা বিরক্ত হতে থাকি। কথায় কথায় ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

কোনো কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারি না। কর্ম হাতে নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেতে থাকি। নিজের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা গ্রাস করতে থাকে। এমন মনে হতে থাকে যেন ভবিষ্যৎকালে জীবন-যাপন করছি। অথবা যেন অতীতকালে জীবন-যাপন করছি। বর্তমানকালের জন্য বাঁচতেই পারি না। পরিবারের জন্য সময় বের করতে পারি না। সকলের সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকি। জীবন অশান্ত হতে শুরু করে। বহু মানুষ তো পাগলই হয়ে যায়। হয় তারা আত্মহত্যা করে ফেলে অথবা পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা স্বয়ং অসুখী থাকি এবং আমাদের কারণেই অন্য সকলে অসুখী হতে থাকে। এমনকি অবশিষ্ট জীবনেই এইরকম অবস্থা নিরন্তর চলতে থাকে। কখনো সখনো হয়তো সুখের মুহূর্ত চলে আসে। তাহলে এটিই তো আমাদের আধ্যাত্মিক সমস্যা নাকি অন্য কিছু? সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে যে অন্তরে অশান্তি তখনই হয় যখন বাইরের ঘটনা আমাদের ইচ্ছের বিপরীত চলতে থাকে। এই অশান্তির কারণ আপনারা সকলে জানেন যে বাইরে যতক্ষণ ভয়ের পরিবেশ থাকবে ততক্ষন আমাদের অন্তরে ভয় এবং অশান্তি থাকবেই। বাইরের ভয়ের পরিবেশ অসমান ব্যবস্থার কারণেই তৈরি হয় যা আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝে নিয়েছি। যখন আমাদের ইচ্ছে পূরণ হয় না তখন সকলে যেনতেন প্রকারে অপরের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেই ইচ্ছেগুলিকে পূরণ করার চেষ্টা করতে থাকি। এতে কেউ বা সফল হয়ে যায় কিন্তু বেশীরভাগই অসফল হয়। যিনি সফল হন তিনিও ভয়ে ভয়ে থাকেন এই ভেবে— নিজে যেমন করে ছিনিয়ে এনেছি তেমন করে অন্য কেউ যেন আমার থেকে ছিনিয়ে না নেয়। কারণ যিনি ছিনিয়ে নিতে সফল হননি তিনি তো পুনরায় চেষ্টা করবেন। যার ফলে সমাজে সর্বদা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়ে থাকে, আমাদের অন্তর সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে এবং মনও অশান্ত থাকে। এটিই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা— বাস্তবে আমরা এমনটিই মনে করি। বাইরে বিভিন্ন ধর্মের সাধু-সন্যাসিদের কাছ থেকে আমরা শুনেও থাকি যে সংসার হচ্ছে দুঃখের ঠিকানা, এক সরাইখানার মত, এ তো আমাদের নিজের ঘর নয়, আমাদের ঘর তো দূরে কোথাও মেঘের ওপারে, সাত সমুদ্রের পারে, স্বর্গে অথবা বৈকুণ্ঠে ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর আমরা সারাজীবন নিজেদের সন্তানদেরকেও এইপ্রকার সংস্কার প্রদান করার প্রয়াস করতে থাকি এবং তাদের ছেলেবেলার সুখ প্রাপ্তির বিনাশ ঘটাতে থাকি। নিজেদের ধর্মগুলিকেও একইভাবে আমাদের দূষিত অভিজ্ঞতার আধারে তৈরি করে নিই, একইরকম দূষিত শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে নিই। সন্তানরা এরপর বড় হয়ে এমনতর শিক্ষা এবং ধর্ম পেয়ে এমন ভয়ংকর হয়ে যায় যে তাদের আমরা সন্ত্রাসবাদী বলে থাকি। আমাদের শ্রমের একটি বড় অংশ এদের সাথে লড়াই করতে অথবা নিজেদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য খরচ করতে থাকি। এইভাবে বহু কু-চক্র আমাদের জীবনে চলতে থাকে যাদের কারণে আমরা অন্তরে অবিরত ভয় এবং অশান্তি অনুভব করতে থাকি যার

পরিণামস্বরূপ আমরা সর্বদা দুঃখে থাকি। এমন মনে হয় যেন আমরা সবদিক থেকে বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছি। সেইকারণে আমরা এই সংসার থেকে মুক্তি অথবা মোক্ষ প্রাপ্তির কল্পনা করতে থাকি যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। সমস্যা যখন বাইরের জগতে থাকবে তখন কীভাবে মানুষের অন্তরে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে? কেন সে অপরকে ঈর্ষা করবে না? কেন অপরের উপর ক্রোধিত হবে না? কেন অপরকে হিংসা করবে না? কেন একজন অপরজনের জন্য ভয় উৎপন্ন করবে না? কেন একজন অপরজনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না? কেন সে ভবিষ্যতের চিন্তা করবে না? কেন একে অপরের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না? কেন হত্যা করবে না? কেন ধর্ষণ করবে না? কেন সে অসত্য বলবে না? কেন সে ভাল ব্যবহার করবে? এইসব মিলিয়ে সে কীভাবে সুখ-শান্তিতে থাকবে এবং অপরকে থাকতে দেবে? যেমনটি সে নিজের ক্ষেত্রে চায়? তাহলে কোনো সংবিধানে কেবলমাত্র ন্যায় শব্দ লিখে দিলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় না? ন্যায়ের জন্য সেই সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও জরুরী যেখানে এই ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং বাস্তবায়িত হতে পারে। চাঁদে সকলেই যেতে চায় কিন্তু কোনো উপায় অবলম্বন না করে চাঁদে পৌঁছানো সম্ভব? আমরা সকলে জানি তা সম্ভব নয়। তাহলে সংবিধানে কেবলমাত্র ন্যায়ের প্রস্তাবনা লিখে দিলেই ন্যায় করা হয় না। তার জন্য সকল ব্যবস্থা তৈরি করা প্রয়োজন যেন ন্যায় বাস্তবে অভিব্যক্ত হতে পারে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব নীতিমালার প্রয়োজন হয় তা যদি থাকে তবেই ন্যায় সম্ভব হতে পারে। ন্যায় বলুন বা সমতা বলুন একই কথা। তাহলে এটি পরিষ্কার যে আর্থিক সমতা বা আর্থিক ন্যায়ই মূল কথা এবং তা অবশিষ্ট অন্য সব সমতাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি আমরা সমাজে আর্থিক সমতা নিয়ে না আসি তবে দ্বিতীয় কোনো উপায় আমি দেখতে পারছি না যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমতা আসতে পারে। সুতরাং আর্থিক সমতা ছাড়া সকলকে নিজেদের ইচ্ছেমত উপভোগের ব্যবস্থা করে দেবার অন্য কোনো উপায় নেই। যদি কারোর কাছে অন্য কোনো ভাল উপায় থাকে তাহলে দয়া করে আমাদেরকে জানান। আমরা যারা এমন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কর্মে লিপ্ত রয়েছি সকলেই আপনার সাথী হব। আর যদি এটিই একমাত্র উপায় হয় তবে আর বিলম্ব করবেন না। শীঘ্রই আমাদের সাথে যুক্ত হোন এবং এই ব্যবস্থাকে বিশ্ব সংসারে বাস্তবায়িত করতে আপনার ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করুন। আমরা সকলে অপেক্ষায় রয়েছি।

***

অধ্যায় ৯

সরকার, প্রশাসন এবং নেতৃত্ব গঠনের প্রক্রিয়া

সরকার গঠন করা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকারের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে সঠিক নেতৃত্বমণ্ডলী নিযুক্ত করা। অর্থাৎ নেতাদের চয়ন প্রক্রিয়া কীভাবে হবে তা সুনিশ্চিত করা। সরকার গঠন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে তার উপরই অন্যান্য বিষয়গুলি নির্ভর করে। সরকার গঠন এমনভাবে হওয়া উচিত যেন 'নিয়ন্ত্রণ' জনগণের হাতে থাকে এবং 'নেতৃত্ব' নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকে। এমনটি হলে যে কোনো নেতার পক্ষে নিরঙ্কুশ হবার সম্ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং নেতৃত্বও সঠিকভাবে সম্পাদন হতে পারবে। এইভাবে আমরা দুটি সুবিধা একসাথে পেয়ে যাব। নেতৃত্ব যেমন সর্বদা উচ্চপর্যায়ের হবে তেমনি নিয়ন্ত্রণও সর্বদা জনগণের হাতে থাকবে। বর্তমান সময়ের মত নির্বাচন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র ৫ বছরে একবার নয় বরং নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্বদা জনগণের কাছে থাকবে। জনগণ যে কোনো সময় নেতা-নেত্রী, প্রতিনিধি অথবা নীতিনিয়মকে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিযুক্ত করতে পারবে এবং অপসারণ করতে পারবে। সরকার, সরকারী নেতা-নেত্রী অথবা প্রতিনিধি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ইন্টারনেট মাধ্যমে রাখা থাকবে। জনগণ যখন খুশি তা দেখতে পারবে এবং অন্তিম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই ব্যবস্থায় এমন একটি মুক্তমঞ্চ থাকবে যেখানে সকল নাগরিক নিজেদের বক্তব্য জনতার কাছে উপস্থাপন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ– এমন কিছু তথ্য যার দ্বারা ব্যবস্থা উন্নত হতে পারে অথবা কোনো নেতা বা নেত্রী নিজ কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন করছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলি রাখা থাকবে। কোনো ব্যক্তি যদি এমন কিছু আবিষ্কার করেন যার মাধ্যমে সমাজ লাভবান হতে পারে তবে সেইসব তথ্যও তিনি মুক্তমঞ্চের মাধ্যমে সরকার অথবা জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন। এই প্ল্যাটফর্ম সর্বদা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। জনগণ সমাজের লাভের জন্য এই প্ল্যাটফর্মকে যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবে।

একটি প্রধান নির্বাচন কমিশন থাকবে যা সরকারের গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। গ্রাম পর্যায়ে চেতনাত্মক স্তরের ব্যক্তিরা নির্বাচনের জন্য মনোনীত হতে পারবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সর্বাধিক ১০ জন যোগ্য আবেদনকারীকেই নির্বাচনের জন্য মনোনীত করা হবে। যাদের মধ্য থেকে জনগণ ৫ জন নেতা নির্বাচন করবে।

স্থান বর্গীকরণ

উদাহরণস্বরূপ ২ লক্ষ্য অবধি জনতার জন্য ১০ জনের মধ্যে ৫ জন নেতা থাকবে। অর্থাৎ একটি নগরের জন্য ৫ জন নেতা চয়ন করা হবে। আনুমানিক ৪০ হাজার আবাসিকদের জন্য সকল সুবিধা সম্পন্ন একটি অঞ্চলকে টাউনশিপের সংজ্ঞা দেওয়া হবে। ধীরে ধীরে পুরো ভারতে এই প্রকারে টাউনশিপ স্থাপন করা হবে। সকল অঞ্চলে একইরকম সুযোগ-সুবিধা এবং সংরক্ষণ থাকবে। ২০টি নগর মিলে একটি জেলা ধরা হবে। এইভাবে ২০টি জেলা মিলে একটি রাজ্য ধরা হবে। ২০টি রাজ্য মিলে একটি দেশ ধরা হবে। এইভাবে সকল দেশ মিলে একটি বিশ্ব ধরা হবে। কেবলমাত্র টাউনশিপ স্তরের নেতাদের জনগণ দ্বারা নির্বাচিত করা হবে। এরপর এই নির্বাচিত নেতাদের দ্বারা জেলা স্তরে ৫ জন নেতা নির্বাচন করা হবে। আবার জেলা স্তরের নেতাদের দ্বারা ৫ জন রাজ্য স্তরের নেতা নির্বাচিত করা হবে। আর এইপ্রকারে রাজ্য স্তরের নেতাদের দ্বারা দেশের জন্য ৫ জন নেতা নির্বাচিত করা হবে। শেষে সকল দেশের নেতাদের দ্বারা বিশ্ব স্তরের ৫ জন নেতা নির্বাচিত করা হবে অথবা প্রতিটি দেশ থেকে একজন নেতা বিশ্ব সরকারের জন্যও নির্বাচিত হতে পারবে। এইস্তরে ৫ জনের মধ্যে ১ জন মুখ্য নেতা এবং ৪ জন সহায়ক নেতা হবেন। ভবিষ্যতে যদি কোনো নেতার কাজে ১০ শতাংশ জনগণও অসন্তুষ্ট হন তবে সেই নেতাকে

পুনরায় নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। তিনি যদি ৫০ শতাংশের কম ভোট পান তবে তিনি পদচ্যুত হয়ে যাবেন। সাধারণত সকল নেতাদের কার্যকাল ৫ বছরই থাকবে। এই প্রণালীতে নেতাদের নির্বাচন নীচ থেকে উপরের দিকে হবে এবং ব্যবস্থা উপর থেকে নিচের দিকে থাকবে। অন্তিম নিয়ন্ত্রণ সর্বদা জনগণের হাতেই ন্যাস্ত থাকবে।

স্থান বর্গীকরণ

মুখ্য সংবিধান বিশ্বস্তরের নেতাদের দ্বারা সংশোধন করা হবে। যেখানে সকল স্তরের ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ব সরকার নিজের স্তরে কর্ম সম্পাদন করবে এবং দেশের সরকারদের প্রয়োজন অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতে থাকবে এবং সকল কর্মের নিরীক্ষণ করতে থাকবে। দেশের সরকার নিজ কর্মের পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে পথনির্দেশ দেবে এবং তাদের কর্মের নিরীক্ষণ করবে। গ্রাম স্তরের সরকার অবধি এইভাবে চলতে থাকবে। নির্বাচন নীচ থেকে উপরে এবং প্রশাসন উপর থেকে নিচের দিকে থাকবে। ফলে সর্বদা ক্ষমতার সমতা বজায় থাকবে। চেতনাত্মক স্তরের ব্যক্তিরা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ হন না তবুও যতটা উপায় করা যেতে পারে চেষ্টা করা উচিত। গ্রাম স্তরের নেতাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী হওয়া উচিত।

যোগ্যতা

কেবলমাত্র চেতনাত্মক স্তরের ব্যক্তিদেরকেই এই পদের জন্য মনোনীত করা উচিত।

চয়ন প্রক্রিয়া

একটি নগর থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদনকারীর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১০ জন যোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্ব বিভাগ দ্বারা নির্বাচিত করা হবে। এরপর জনতা নিজেদের ভোটাধিকার দ্বারা তাদের থেকে ৫ জন নেতৃত্ব নির্বাচন করবে। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজন মুখ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করে নেবে। নির্বাচনের সমস্ত খরচ সরকারের তরফ থেকে করা হবে। নির্বাচন কমিশন সকল প্রতিনিধিদের জন্য এবং তাদের নীতিনিয়মকে বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা জনগণকে অবগত করবে এবং প্রচার করবে। কোনো প্রতিনিধি নিজের প্রচার নিজে করবে না। কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনই সমস্ত প্রচার করবে। নির্দিষ্ট সময়েই ভোটগ্রহণ করা হবে। যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন তাকে সেই অঞ্চলের নেতৃত্ব আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রদান করা হবে। সাধারণভাবে সকলের কার্যকাল পাঁচ বছরের জন্য হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধি নিজের দায়িত্ব পালন করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন। তবে জনগণ চাইলে উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যবর্তী সময় তাকে পদচ্যুত করতে পারে। যদি সেই অঞ্চলের জনগণ অসন্তুষ্ট হয়ে ১০ শতাংশ ভোট প্রদান করে কোনো প্রতিনিধিকে সরাতে চায় এবং নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সেই আবেদনপত্র নির্বাচন কমিশনকে প্রেরণ করে দেয় তবে কমিশন উক্ত প্রতিনিধির জন্য পুনরায় নির্বাচনের আয়োজন করবে। যদি সেই ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার সর্বাধিক আবেদন আসে তবে নেই প্রতিনিধিকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া অনলাইন মাধ্যমেই হবে। সকলে নিজেদের অনলাইন প্রোফাইল থেকেই সরাসরি ভোট প্রদান করতে পারবে। এমনকি তারা কোন নেতাকে ভোট প্রেরণ করেছে তা পরেও সকলে দেখতে পারবে। তৎকাল জানিয়েও দেওয়া হবে যে তাদের ভোট কোন নেতার কাছে পৌঁছেছে। নির্বাচন কমিশন একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হবে যেখানে জনগণ নিজেদের যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করতে পারবে। সরকার সরাসরি তাদের পদে আসীন করতে পারবে না। কেবলমাত্র প্রথমবারই সরকার দ্বারা পদে আসীন হবে। এই সকল পদে চেতনাত্মক স্তরের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরাই থাকবেন। যতজন ব্যক্তি এই বিভাগে আবেদন করবেন তাদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হবে। এরপর নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন অনুসারে স্বয়ং নির্বাচন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে। অবশিষ্ট অন্য চার জীবিকা বিভাগ নিজ স্তরে সরকারের অধীনে কর্ম করবে। এইভাবে নগরস্তরের নেতৃত্ব দ্বারা ১০ জনের মধ্যে ৫ জন জেলাস্তরের জন্য নির্বাচিত হবে। আবার জেলা নেতৃত্ব দ্বারা ১০ জন থেকে ৫ জন রাজ্যস্তরের জন্য নির্বাচিত হবে। রাজ্য স্তরের নেতাদের দ্বারা ১০ জন্য থেকে ৫ জন দেশস্তরের জন্য নির্বাচিত হবে সরকার গঠন করার জন্য। শেষে প্রতিটি দেশস্তরের নেতৃত্বের ২ জন

আবেদনকারীর মধ্যে ১ জনকে বিশ্বস্তরের নেতা নির্বাচিত করা হবে। অথবা সমগ্র বিশ্ব থেকে ১০ জনের মধ্যে ৫ জনকে নেতৃত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চয়ন করা হবে। ধরা যাক ১০০টি দেশ আছে। তবে ১০০ জন প্রতিনিধি বিশ্বস্তরের সরকারের জন্য নির্বাচিত করা হবে। যদিও ৫ জনই অধিক হয়ে যায় তবুও প্রারম্ভে প্রতিটি দেশ থেকে ১ জনের নিযুক্তি হতে পারে। এতে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা যে কর্ম ৫ জন করতে পারবে তার জন্য ১০০ জন অনাবশ্যক। কিন্তু প্রারম্ভে জনগণ এটি ভেবে নিতে পারে যে নিজেদের দেশ থেকে বিশ্ব সরকারে প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। সেকথা ভেবে এমনটি করা যেতেও পারে। কিছু বছর পর যখন জনগণ অনুভব করবে যে ৫ জনই যথেষ্ট তখন আবার নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব সরকারের জন্য ৫ জন নেতৃত্ব নির্বাচিত করা হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া
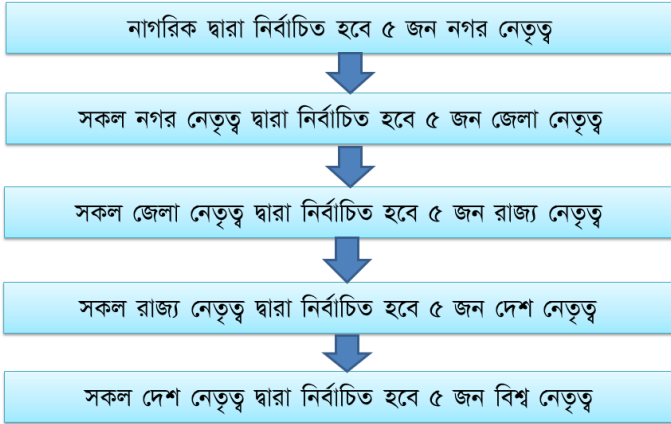
একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বপ্রথম প্রতিনিধি মণ্ডলীকে চয়ন করা হবে। যারা সমস্ত নীতিনিয়ম নির্ধারণ করবে। প্রতিনিধি তিনিই হবেন যিনি পূর্ণরূপে যোগ্য হবেন এবং জনগণের প্রিয়পাত্র হবেন। যখন সরকার গঠনের জন্য এমন প্রতিনিধি মণ্ডলীর নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সরকার পরিচালনার অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এই তো গেল সরকার গঠনের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। এবার এই সরকার কীভাবে কর্ম করবে তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে। সরকার সর্বপ্রথমে চার প্রকার জীবিকা বিভাগ গঠন করবে। যাদের নাম— নেতৃত্ব জীবিকা বিভাগ, প্রশাসনিক জীবিকা বিভাগ, উৎপাদনশিল্পকর্ম জীবিকা বিভাগ এবং কৃষি জীবিকা বিভাগ। এই চার বিভাগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণকে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করবে। মুখ্যত যে কোনো সরকারের চার প্রকার কার্য থাকবে।

সকল বিভাগ এমন নীতিপ্রণালী তৈরি করবে এবং পরিচালনা করবে যার দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে।

১. শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ

প্রতিটি শিশুর সমান স্তরের সম্পূর্ণ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে।

২. জীবিকা

২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের যোগ্যতা এবং পছন্দ অনুযায়ী একটি পেশা সুনিশ্চিত করা হবে।

৩. সুখসুবিধা

প্রতিটি বিভাগে ও প্রতিটি অঞ্চলে সমান এবং সমুচিত সুখসুবিধা সুনিশ্চিত করা হবে।

৪. সংরক্ষণ

প্রতিটি বিভাগে ও প্রতিটি অঞ্চলে সমান এবং সমুচিত সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা হবে।

জীবিকা বিভাগের গঠন প্রক্রিয়া

সকল স্তরের সরকার জীবিকা বিভাগের গঠন এই প্রক্রিয়ায় করবে যে সেখানে মুখ্য পদগুলির জন্য চেতনাত্মক এবং ভাবনাত্মক স্তরের যোগ্য ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হবেন। সুতরাং যেখানে এমনতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকবে সেখানে কখনো কোনো সমস্যা উৎপন্নই হবে না। আমি এই কথাটিকে পুনরায় বলতে চাই যে, কোনোপ্রকার সমস্যা উৎপন্নই হবে না। আর যদি নতুন কোনো সমস্যা উৎপন্ন হয় তাহলে তা অতিশীঘ্র গোঁড়া থেকে সমাধান করে ফেলা হবে। যাতে কখনই ভবিষ্যতে দ্বিতীয়বার কোনো সমস্যা উৎপন্ন না হতে পারে।

বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ববর্গের গঠন প্রক্রিয়া

নেতৃত্ব জীবিকা বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থায় চেতনাত্মক স্তরের ব্যক্তিদের নিযুক্তি তাদের যোগ্যতা, ক্ষমতা, কুশলতা, গুণাগুণ এবং পছন্দের ভিত্তিতে হবে। যেমন– সকল বিভাগের পরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সকল বিচারপতি, বৈজ্ঞানিক, মুখ্য চিকিৎসক, ব্যবস্থার সকল পরিদর্শক, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের মুখ্য সম্পাদক প্রমুখ পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ।

প্রশাসন অথবা জনসেবক ব্যক্তিবর্গের গঠন প্রক্রিয়া

প্রশাসনিক উপজীবিকা বিভাগ দ্বারা প্রশাসনিক পদে নিযুক্তি তাদের যোগ্যতা, ক্ষমতা, কুশলতা এবং পছন্দের ভিত্তিতে হবে। এই পদের জন্য ভাবনাস্তরের ব্যক্তিবর্গ নিযুক্ত হবেন। প্রশাসন সেইসব কর্ম সম্পাদন করবে যা জনগণের সুখসুবিধার সাথে সম্পর্কিত হবে। যেমন– শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আবাস, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, ডাক, দূরভাষ, দূরদর্শন, রেডিও ইত্যাদি ছাড়াও পরিবহন, পার্ক, স্টেডিয়াম, পুস্তকালয়, দেশের সকল নাগরিকের

সুরক্ষা প্রদান করবে। প্রকৃতির চার শ্রেণী– জড়-পদার্থ, বৃক্ষ-বনস্পতি, পশু-পক্ষী এবং মনুষ্যবর্গের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, সহায়তা ও সহযোগিতা, সুরক্ষা ও বিচারালয় ইত্যাদির সার্বজনিক পরিষেবার সমুচিত সংরক্ষণ প্রাপ্তির ব্যবস্থাপন থেকে ক্ষেত্রীয় স্তর অবধি সকল কর্ম।

এ তো গেল শাসন ও প্রশাসনিক গঠন প্রক্রিয়া। এখন আরও দুটি ক্ষেত্র অবশিষ্ট রয়েছে। এক উৎপাদনশিল্প এবং দ্বিতীয় কৃষি। আসুন সেগুলি দেখে নিই।

উৎপাদনশিল্প বিভাগে ব্যক্তিদের গঠন প্রক্রিয়া

উৎপাদনশিল্প উপজীবিকা বিভাগ এই বিভাগের নিযুক্তি কার্য করবে। এই বিভাগের জন্য ন্যুনতম মানসিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হবেন। এখানেও তিনটি স্তর থাকবে। মৃদু, মধ্যম এবং উচ্চ স্তর। সমস্ত নেতৃত্ব এবং প্রবন্ধনের ব্যবস্থা সরকার করবে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের কেবলমাত্র নিজেদের প্রদান করা কর্ম সম্পাদনের জন্যই আসতে হবে। যেমন– ছুতোর, প্লাম্বার, দর্জি, ইলেকট্রিশিয়ান, রিপেয়ারিং মিস্ত্রি, মেশিন চালক, মুচি, নাপিত, ধোবা, ওয়েল্ডার, রাজমিস্ত্রি, কামার, জুয়েলারী, বিজ্ঞাপন কর্মী, নির্মাণ কর্মী, বিভিন্ন প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কর্ম, কোয়ালিটি কনট্রোল, সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং, বিভিন্ন প্রকার ডিজাইনিং, অন্যান্য বিশেষ কারিগরি কর্ম ইত্যাদি। সকল প্রকার ব্যক্তিদের যোগ্যতা এবং পছন্দের ভিত্তিতে কোনো একটি জীবিকায় নিযুক্ত করা হবে।

কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিদের গঠন প্রক্রিয়া

কৃষি উপজীবিকা বিভাগ দ্বারা শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যোগ্যতা এবং পছন্দের ভিত্তিতে এই বিভাগে শস্য উৎপাদন, ফল উৎপাদন এবং দুগ্ধ উৎপাদন সম্পর্কিত কোনো একটি জীবিকাতে নিযুক্ত করা হবে। সরকার সকলকেই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো একটি জীবিকা প্রদানে বাধ্য থাকবে। কর্মসংস্থান না প্রদান করতে পারলেও সরকারকে তাদের জন্য সমান জীবনস্তর দিতে হবে, তারা যে কোনো বর্গেরই হোক না কেন। জীবিকা প্রদান করার পর যদি কর্ম না করে তবে সে স্বয়ং জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে, সরকার নয়। সরকার তাদের জন্য সবরকমের সহায়তা করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকবে। এমনকি তাদের সকল প্রকার সংরক্ষণ দেবে। যদি সরকারের কোনো নীতিনিয়ম আপনার ভুল মনে হয় তার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম থাকবে যেখানে জনগণের জন্য

অনলাইনে সরাসরি সমস্ত তথ্য সম্প্রচারের ব্যবস্থা থাকবে। যেখানে আপনি কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন। জনতাকে জানাতে পারবেন যে কি ভুল হয়েছে। আর যদি সঠিক তথ্য আপনি জানেন তবে তাও জানাতে পারবেন। পরে নেতৃত্ববর্গের দ্বারা অথবা জনগণের মান্যতার ভিত্তিতে তা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আপনি যদি কোনোপ্রকার অসুবিধের সম্মুখীন হন তবে দয়া করে নির্দিষ্ট আধিকারিক অথবা বিভাগে উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত করাতে পারবেন। যা অনলাইন প্রক্রিয়াতেই হবে। ফলে কাউকে কোথাও যেতে হবে না। আপনার নিজের যে অনলাইন আকাউন্ট থাকবে সেখান থেকেই আপনি যে কোনোপ্রকার অভিযোগ করতে পারবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উক্ত আধিকারীক আপনাকে সেই সমস্যার সমাধান করে দেবে। যদি উক্ত আধিকারী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাধান না দিতে পারেন এবং উপরের বিভাগে আপনার সমস্যা না জানিয়ে থাকেন তবে তাকে নিম্ন পদে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হবে এই ভেবে যে তিনি উক্ত পদের যোগ্য নন, অথবা উক্ত কাজে তার রুচি নেই। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে আপনার সেই সমস্যা স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী অধিকারিকের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। তা চলতে থাকবে যতক্ষণ অবধি কোনো সমাধান না হয়। যতদিন সঠিক সমাধান না আসে ততদিন একটি বিকল্প সমাধান তৎক্ষণাৎ আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে যেন আপনার জীবন-যাপন সঠিকভাবে চলতে থাকে।

যদি কাউকে নিজের জীবিকা বদলাতে হয় তবে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা প্রমাণ করে নতুন জীবিকাতে নিযুক্তি নিতে পারবেন। নিজ যোগ্যতার নীচে কোনো জীবিকায় কেউ যেতে চাইলে তিনি যেতে পারেন তার জন্য কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু নিজ যোগ্যতার উপর কোনো জীবিকায় আপনি তখনই যেতে পারবেন যখন উক্ত পদের জন্য যোগ্য হবেন। ব্যবস্থা আপনাকে যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য সবরকম সহযোগিতা করবে। সকল বিভাগ বিদ্যালয়ের অন্তিম দিনেই আপনার যোগ্যতা যাচাই করে আপনাকে উচিত জীবিকা প্রদান করে দেবে। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। সাধারণত একজন ব্যক্তি একই সময়ে একটি জীবিকার জন্য নিযুক্ত হতে পারবে।
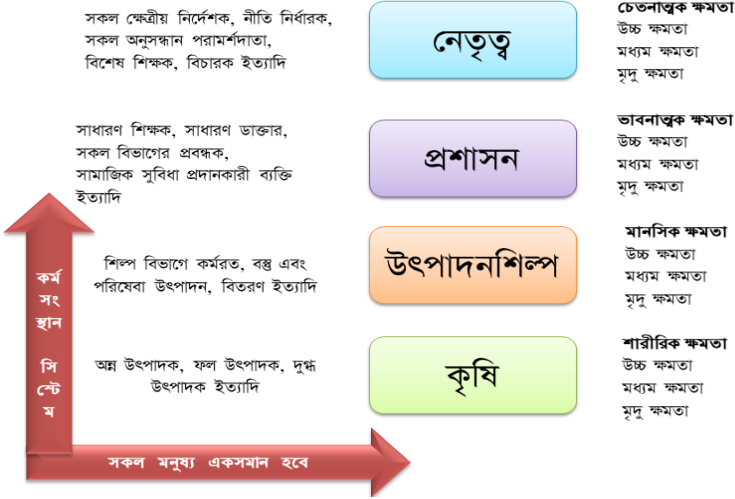
রাষ্ট্রীয় সুখসুবিধা নীতি

এটি হচ্ছে সামাজিক স্তরের কার্য। সুখসুবিধার অর্থ হচ্ছে সরকারি স্তরে প্রদান করা সকল সুযোগ-সুবিধা যা কিনা ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক স্তরে সম্ভব হয় না এবং যার জন্য সরকার গঠন করা হয়। যেমন সকল সুবিধা সম্পন্ন আবাসিক অঞ্চল, যেখানে জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস কানেকশন, ইন্টারনেট কানেকশন, টিভি কানেকশন, নিকাশি ব্যবস্থা, সকল প্রকার সুরক্ষা বিষয়ক সরঞ্জাম ইত্যাদি। সকল অঞ্চলে বিদ্যালয়, সড়ক, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবহন, স্টেডিয়াম, উন্নত পার্ক, ডাক ব্যবস্থা, মোবাইল ব্যবস্থা, পুস্তকালয়, ঔষধালয় ইত্যাদি। এই সকল সুখসুবিধা সকল ক্ষেত্রীয় স্তরে প্রদান করা উচিত। যেসব সুবিধা গ্রামীণ স্তরে প্রদান করা সম্ভব হবে না তা জেলা স্তরে প্রদান করা উচিত এবং জেলা স্তরেও সম্ভব নাহলে তা রাজ্য স্তরে প্রদান করা উচিত, এইভাবে রাজ্য স্তরে সম্ভব নাহলে সেইসব সুখসুবিধা দেশীয় স্তরে অথবা বিশ্বস্তরে প্রদান করা উচিত। এই সকল সুখসুবিধা সার্বিক দিক দিয়ে সকলকে সমানরূপে প্রদান করা উচিত। এটিকেই ন্যায় বিচার বলা হবে। কেননা এই জগতে যা কিছু প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ রয়েছে তার উপর সকল জীবের সমান অধিকার রয়েছে। কারোর জন্য কমও নয় কারোর জন্য বেশীও নয়। যদি এইপ্রকারে ন্যায় ব্যবস্থাকে স্থাপিত করে দেওয়া যায় তবে জগতে কারোরই কোনো প্রকারের অভাব থাকবে না এবং কোনোপ্রকার সমস্যা উৎপন্নই হবে না। যেমন–

সন্ত্রাসবাদ, নকশালবাদ, দরিদ্রতা, অসুস্থতা, অনাহার, ধর্ষণের মানসিকতা, কাউকে প্রতারিত করার মানসিকতা, নিজেকে তুচ্ছ এবং অপরকে মহান ভাবার মানসিকতা, ভবিষ্যতের প্রতি নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা, ভবিষ্যতে কি হবে, ভবিষ্যতের জীবন কীভাবে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ নীতি

এটি হচ্ছে সমষ্টিগত স্তরের কার্য। অর্থাৎ চার বর্গকেই সমুচিত সংরক্ষণ প্রদান করা উচিত। যেমন– মনুষ্য, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-বনস্পতি এবং পদার্থ সমূহের যে চার শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এদের মধ্যে কারোর কোনোপ্রকার দুঃখ থাকা উচিত নয়। সরকারের সংরক্ষণ নীতি এই প্রকার হওয়া উচিত যে চার প্রকার বর্গের মধ্যে কোনোপ্রকার ভারসাম্যহীনতা এবং কোনোপ্রকার ভয় বা ক্ষতি যেন না হয়। যেভাবে একজন ভালো ও বিচক্ষণ কৃষক নিজের জমিতে উৎপন্ন হওয়া অন্যান্য আগাছাগুলিকে তুলে ক্ষেতের বাইরে ফেলে দেয় এবং নিজ ফসলকে রক্ষা করে একইভাবে সকল প্রচেষ্টার পরও যদি কোনো প্রাণী অন্যের ক্ষতি করে অথবা ক্ষতি করতে চায় তবে তাকে সমাজের বাইরে এনে তার উচিত চিকিৎসা করানো কর্তব্য। যদি চিকিৎসা সম্ভব না হয় তবে তাকে সমুদ্রের মাঝে কোনো দ্বীপে ছেড়ে আসা উচিত। তাকে কদাপি সমাজের মাঝে রাখা উচিত হবে না। আর যদি সে অধিক হানিকারক হয় তবে তাকে চিরতরে শান্ত করে দেওয়া উচিত। তার জন্য বিশ্ব সরকার যেন আবশ্যক অস্ত্র-শস্ত্র, সেনা, কারাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখে। বিচার, চিকিৎসা, সুরক্ষা ইত্যাদি স্থাপন করে এবং প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ উন্নয়ন করে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে, ভূমিকম্পের সম্ভাবনা কমে যায়, বিভিন্ন অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, আয়ু বৃদ্ধি হয়, অন্য সকল প্রকার শক্তি বৃদ্ধি হয়, জীবনে স্বচ্ছতা আসে, জীবনের প্রতি সঠিক দৃষ্টিকোণ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। সরকার সকলেকে স্বাধীনতা, সম্মান, স্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রাপ্তি সংরক্ষণ নীতির অন্তর্গত করবে। যারা কোনো কারণে পরিবারের সাথে থাকতে চান না তাদের জন্য সংরক্ষিত আবাসের ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে সকল প্রকার সুখসুবিধার বন্দোবস্ত থাকবে। যেখানে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি ব্যক্তিগণ যতক্ষণ থাকতে চান ভালোভাবে থাকতে পারবেন। যেহেতু সরকারই তাদের জন্য সকল ব্যবস্থা করবে সেইজন্য তারা পরিবারের সাথে থাকুক বা সংরক্ষণ গৃহে থাকুক, এর ফলে সরকারের আলাদা বা অতিরিক্ত ব্যয় হবে না। সরকার চার বর্গের মধ্যে এক সমতা এবং সুখের পরিবেশ তৈরি করবে তার জন্যই এই সংরক্ষণনীতির সমাবেশ করা হয়েছে। কেননা এই সংসারে যদি কেউ কোনোভাবে দুঃখী অথবা ভারসাম্যহীন হয় তবে সে নিজের কাছের ও দূরের

সকলেকে দুঃখী এবং ভারসাম্যহীন করে দেয়। সেইজন্য যদি মানুষকে সুখী থাকতে হয় তাহলে অবশিষ্ট সকলেকেও সুখী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। কারাগার কখনোই দণ্ড প্রদানের স্থান হওয়া উচিত নয়। বরং তা মনোরোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্র হওয়া উচিত। কেননা যে কোনো অপরাধের পেছনে হয় মন্দ ব্যবস্থার হাত থাকে অথবা মানসিক অসুস্থ্যতার কারণ থাকে। এই যে সমাজে ভুল ব্যবস্থার কারণে আর্থিক অসমতা, দলাদলি, দমন, উৎপীড়ন, শোষণ, কুণ্ঠা, কুৎসা, অসুস্থ্যতা, বিক্ষিপ্ত অবস্থা ইত্যাদি রয়েছে যার কারণেই সমস্ত অপরাধ ঘটছে। এরজন্য সঠিক প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা, জীবিকা ব্যবস্থা, সুখসুবিধার ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সমৃদ্ধি সূচক মান কেন?

সন্তুষ্টি সূচক মান— নতুন ব্যবস্থায় জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগের আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেটিং থাকবে।
এতেই সরকারের কার্যকারিতার তথ্য জানা যাবে।

শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের সন্তুষ্টি রেটিং

কর্মসংস্থানের সন্তুষ্টি রেটিং

সকল প্রকার ভোগের সন্তুষ্টি রেটিং

1 2 3 4 5

সে জন্যই এই নতুন ব্যবস্থার কথা বলছি। যেন সকলেই এই নতুন ব্যবস্থাকে ভালভাবে বুঝে নিতে পারে সেইকারণে এই পুস্তক রচনা করা হয়েছে। যদি আপনারা সকলে আগ্রহী হন তবে এই ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের জন্য উপযোগী হতে পারে। দণ্ডনীতির পরিবর্তে আমাদের চিকিৎসানীতি এবং তার আগে সঠিক ব্যবস্থানীতি পালন করা উচিত। সকল প্রকারের ব্যাধি ভুল ব্যবস্থারই পরিণাম এছাড়া আর কিছু নয়। সমৃদ্ধি-সূচক মান সর্বদা ব্যক্তিগত সুখের স্তরেই হওয়া উচিত। এই নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজের সকল সুখের জন্য সর্বদাই নিজেদের রেটিং নম্বর দিতে থাকবে। যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এই ব্যবস্থার কারণে কোনো দুঃখ পায় তবে সে নিজের রেটিং দ্বারা অবগত করাতে পারবে। যা সকলে ইন্টারনেট থেকে যখন খুশি দেখতে পারবে। নির্দিষ্ট তথ্য অনুযায়ী সরকারকে তৎক্ষণাৎ তাদের দুঃখের কারণ নির্মূল করতে হবে। এই সূচকের আধারে সরকারের কার্যকলাপের পরিস্থিতি বোঝা যাবে যে সরকার কতটা সফলতা পেল। যদি একজন ব্যক্তিও কোনো কারণে দুঃখী হয় তবে তা সরকারের জন্য বিচারাধীন প্রশ্ন হবে এই ভেবে যে এখনও কোথায় সমস্যা রয়েছে যার কারণে দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে। সেই নির্দিষ্ট কারণ

শীঘ্রই সমাজের কাছে উপস্থাপন করে দেওয়া হবে এই কারণে– যদি কারোর কাছে কোনো সমাধান থাকে তা যেন তিনি সরকারকে দিতে পারেন। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার তো নিজ স্তরে অনুসন্ধান করতেই থাকবে।

***

অধ্যায় ১০

সমুচিত অর্থশাস্ত্র

অর্থশাস্ত্রের অর্থ

জীবনের সমস্ত লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আমরা সকলে যা কিছু কর্ম করি সেই সমস্ত কর্মগুলির মধ্যে বিভাজন এবং কর্মগুলির পরিণামস্বরূপ যা কিছু ফলাফল অথবা ভোগ উৎপন্ন হয় তাদের বিভাজন করার জন্য যেসব নীতিনিয়ম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাকেই অর্থশাস্ত্র নামে জানা যায়। অর্থশাস্ত্রের অর্থ এর চেয়ে অতিরিক্ত বলে কিছু হয় না। অর্থশাস্ত্রকে এখন এতটাই কঠিন বানানো হয়েছে যে সাধারণ মানুষ এটিকে বুঝতেই পারবে না। অর্থশাস্ত্রকে যেখানে অনেক সরল হওয়া উচিত ছিল। যদি অর্থশাস্ত্র সরল না হয় তবে তো সকলে বুঝতে পারবে না। আর যদি সকলে বুঝতেই না পারে তবে পালন করবে কীভাবে? যখন পালন করা হবে না তখন প্রত্যাশিত পরিণাম কীভাবে আসবে? যখন প্রত্যাশিত পরিণাম আসবে না তখন এমন অর্থশাস্ত্রের অর্থ কি? যেখানে অর্থশাস্ত্রই হচ্ছে কোনো ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। যে সমাজের অর্থশাস্ত্র যেমন হয় সেই সমাজের আর্থিক পরিস্থিতিও সেইরূপ হয়। যদি সমাজের আর্থিক অবস্থা সঠিক না থাকে তবে সকলে সম্পূর্ণরূপে সুখী কেমন করে হবে তাই না? এর অর্থ হবে যে সেই সমাজ অর্থশাস্ত্র নয় বরং অনর্থশাস্ত্রকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এবার নীচে দেখবেন যে কতটা সরলভাবে আমি এই বিষয়ের বর্ণনা করব। এতই সরলভাবে যে আপনি তা সহজেই বুঝে যাবেন। এমনকি পালন করাও ততটাই সহজ হয়ে যাবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এমনটি বলতে থাকে যে আমাদের কাছে অধিক কর্মসংস্থান নেই তাই এ বছর আমরা অল্প কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। কারণ বেতন প্রদানের জন্য আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই ইত্যাদি বিষয় আপনি শুনে থাকবেন। অর্থের অভাবের কারণে সরকার কর্মসংস্থান উৎপন্ন করতে পারছে না। আর কর্মসংস্থান উৎপন্ন না করতে পারার অর্থ হচ্ছে সরকার সেই সকল অত্যাবশ্যক কর্মগুলি সম্পাদন করতে পারছে না। যার ফলস্বরূপ সকলে সমস্তরকম সামাজিক সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থাৎ সমাজ দুঃখপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছে। আর সকল সমস্যা কেবলমাত্র এইজন্য দেখা দিয়েছে যে সকল সরকার যে অর্থশাস্ত্রকে গ্রহণ করেছে তা

অর্থশাস্ত্রই নয় বরং অনর্থশাস্ত্র। তা নাহলে অর্থশাস্ত্রের মধ্যে আবার অর্থের অভাব কি করে হয়? অর্থশাস্ত্রই যখন ভুল তখন সেই অর্থশাস্ত্র অনুসারে সরকার যেসব নীতিপ্রণালী নির্মাণ করবে তাতে ক্ষতিকারক ফলাফলই উৎপন্ন হয়ে থাকবে। যার কারণে সরকারের কাছে সবকিছুরই অভাব অনুভব হতে থাকে। নিম্নে আপনি বুঝতে পারবেন যে কর্মসংস্থান আমাদের কাছে এত অধিক পরিমাণে রয়েছে যে তা সম্পাদনের জন্য মানুষের অভাব হয়ে যাবে। আসুন প্রথমে তা বুঝে নিই যে কর্মসংস্থান এবং পেশা বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে। একে কি ভিন্নভাবে উৎপন্ন করতে হবে? অথবা এটি কি মনুষ্য জন্মের সাথে সাথে আপনিই উৎপন্ন হতে থাকবে? কর্ম যেহেতু মানুষের জন্যই প্রদান করা হয়ে থাকে এবং মানুষেরই উপভোগের প্রয়োজন হয় তাই উপভোগের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্যই কর্ম উৎপন্ন হয়ে থাকে। এইজন্য যত মানুষ হবে ততই ভোগের প্রয়োজন হবে। আর যত ভোগের আবশ্যক হবে ততই কর্ম সম্পাদনের আবশ্যক হবে। জনসংখ্যা, ভোগ ও কর্মের মধ্যে এটিই হচ্ছে মূল চক্র। এই চক্র অনুসারে সমাজে কর্ম কখনও অধিক হবে না অভাবও হবে না। অর্থাৎ যত মানুষ তত কর্ম। এবার এই কর্ম কি তাকে বুঝে নিই।

কর্মের পরিভাষা

জীবনের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বদা সুখী অবস্থাকে উপভোগ করা অথবা এক কথায় বললে তা হচ্ছে সুখ ভোগ করা। অর্থাৎ সকল প্রকার ইপ্সিত ভোগের নিরন্তর পূর্তি। সকল প্রকার ভোগ উৎপাদন করতে হয়। প্রকৃতি থেকে তা সরাসরি উৎপন্ন হয় না। এইসব ভোগ উৎপাদন করার জন্য আমরা যে শ্রম করি তাকেই কর্ম বলা হয়। আর এই কর্ম পরস্পর মনুষ্য দ্বারা নিজের জন্য এবং অপরের জন্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর্মের উৎপত্তি স্বয়ং হতে থাকে। অর্থাৎ যত মানুষ তত কর্ম, যত কর্ম তত ভোগ, যত ভোগ তত সুখ। এইজন্য না কর্মের অভাব হবে না ভোগের। আর এর থেকেই সকলের জীবনের পরম উদ্দেশ্য পূরণ হতে থাকবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝে নিই। যতদিন ঘরে একজন ব্যক্তি ছিল ততদিন অবধি ততটুকুই কর্মের প্রয়োজন ছিল। এরপর সেই ব্যক্তির বিবাহের পর দুটো ব্যক্তি হল। এবার দুটো ব্যক্তির জন্য কর্মও বেড়ে গেল এবং সেই কর্ম সম্পাদন করার ব্যক্তিও বেড়ে গেল। তাহলে প্রথমে একজন ব্যক্তি ছিল এবং একজনের কর্ম ছিল। এরপর দুজন ব্যক্তি হল তাই দুজনের কর্ম উপস্থিত হল। এরপরে একজন সন্তানের জন্ম হলে কর্মও বেড়ে যাবে। এইভাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে কর্মের কম বেশী হয়ে থাকে। জনসংখ্যা কম হলে কম কর্ম এবং জনসংখ্যা অধিক হলে অধিক কর্ম।

কেন্দ্রীয় সফটওয়্যার যোজনা
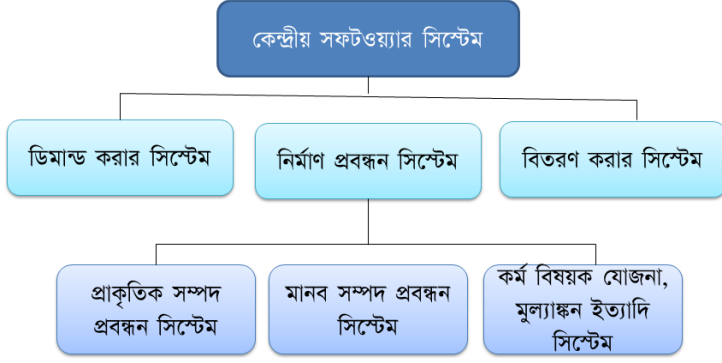
এই সকল কর্ম এবং ভোগের মধ্যে পরস্পর বিভাজন কীভাবে হবে যেন সকলেই তাদের কর্ম এবং ভোগ ন্যায়পূর্ণভাবে পেতে থাকে, এই বিষয়টি অধ্যয়নের জন্যই অর্থশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আসুন এবার এই অর্থশাস্ত্রকে অধ্যয়ন করি।

জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ কী?

জ্ঞান, কর্ম ও ভোগকে এইভাবে বুঝে নিন যে আমাদের জীবনে এদের প্রয়োজনীয়তা কী? গুরুত্বই বা কি? আমাদের শরীরে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে যাদের মাধ্যমে আমরা কোনো বিষয়ের ভোগকে অনুভব করতে পারি। যেমন— কানের দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সংগীত শ্রবণ এবং অপরের কথা শুনে তা ভোগ করতে পারি। ত্বকের দ্বারা বভিন্ন প্রকার স্পর্শ ভোগ করতে পারি। চোখের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের রং, রূপ, দৃশ্য ইত্যাদি ভোগ করতে পারি। জিভ দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার স্বাদ ভোগ করতে পারি। এইভাবে নাসিকা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধকে ভোগ করতে পারি। এভাবে আমরা বুঝে নিতে পারি যে নিজেদের এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সহস্র প্রকারের ভোগকে উপভোগ করে সেই বিষয় সম্পর্কিত সুখ প্রাপ্ত করে সুখী হতে পারি। তবে এমন মানুষের সাথেও আমার দেখা হয়েছে যারা বলেন সুখী হবার জন্য কোনো ভোগের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যখন তাদের জীবনকে নিরীক্ষণ করেছি পেয়েছি যে অজ্ঞানতার বশে তারা এইসকল মিথ্যে কথা বলছে। বিভিন্ন প্রকার ভোগ প্রাপ্তির জন্য আমি তাদের দিনরাত অনেক প্রয়াস করতে

দেখেছি। এও দেখেছি যে কখনও অসফল হলে তারা দুঃখও পাচ্ছে। আমি যখন তাদের জীবন নিয়ে আমার গবেষণা সম্পর্কে জানালাম তারা নিরুত্তর হয়ে গেলেন। কিছু বলতে পারলেন না। কিছু ব্যক্তি স্বীকারও করলেন। তারা বললেন— এমন তো আমরা কথার কথা হিসেবে বলে থাকি। কিছু ভোগ না করে কেউ কখনো সুখী হতে পারে কি? যদি আমরা সমাজকে এমন করে না বলি তবে সকলে ভোগের পেছনে নিরন্তর ছুটতে থাকবে, আমাদেরকেও দান-দক্ষিণা ইত্যাদি দেবে না। এই প্রকারের অনেক কথা তারা বলতে থাকে। এভাবে যদি কেউ বলে— ভোগ না করে আমরা সুখী থাকতে পারি তবে কোন কারণে তারা অসত্য কথা বলতে থাকে? মূলত তারা পরমাত্মার সৃষ্টির বিরুদ্ধেই কথা বলার প্রয়াস করে থাকে। যে সময় আমাদের এইসব ভোগের প্রয়োজন হবে সেইসময় তাদের উৎপাদনও তো করতে হবে কারণ প্রকৃতি থেকে তো আমরা সকল ভোগ প্রাপ্ত করতে পারব না। সেই সকল ভোগ উৎপন্ন করতে আমাদের সকলকে পরিশ্রম করতে হবে না? আমরা কী পরিশ্রম করব, কীভাবে পরিশ্রম করব এইসব জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। এই প্রকারে কিছুটা চিন্তন-মনন করে আমরা সকলে বুঝে গিয়েছি যে জ্ঞান, কর্ম ও ভোগের আধারের উপরই সমগ্র প্রক্রিয়া পরিবেষ্টিত রয়েছে। যদি ভোগের মাধ্যমে আমরা সুখ ভোগ করি তবে তো কর্মের প্রয়োজন নেই। আর যদি কর্মের প্রয়োজন না থাকে তবে জ্ঞান অর্জনের কারণ কী? পশুরা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া এবং কর্ম ছাড়া বেঁচে থাকে তেমন করে প্রকৃতি দ্বারা প্রদান করা ভোগকে উপভোগ করে নিরাপত্তাবিহীন জীবন কাটাতে হবে। আমার বোধ অনুযায়ী কেউই এমনভাবে জীবন কাটাতে চাইবে না। তার পরও যদি কিছু ব্যক্তি প্রাকৃতিকভাবেভাবে জীবন-যাপন করতে চায় তবে করতে পারে। সে ব্যবস্থা তো শুরু থেকেই সহজলভ্য রয়েছে। তার জন্য তো ভিন্নভাবে কোনো কর্ম বা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তো সকল সুখসুবিধাযুক্ত জীবন উপভোগ করতে চায়। এর জন্য তো কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। তাদের জন্য সকল সুখসুবিধাযুক্ত একটি সঠিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

আরও একটি কথা হচ্ছে— জগতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এবং সেই অনুযায়ী পালন করা ব্যক্তিরা এটিই বলে প্রচার করে যে ভোগী হবে না ত্যাগী হও। এখন তাদের কথা অনুযায়ী যদি সকলে ত্যাগী হতে শুরু করে তাহলে তো ভোগ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। আর যদি ভোগ নির্মাণ করার প্রয়োজনই না থাকে তবে তো কোনো কর্মেরও প্রয়োজন থাকবে না, কোনো জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন থাকবে না। অর্থাৎ কোনোপ্রকার কর্মসংস্থানের প্রয়োজন পড়বে না। তাহলে তো সরকারের কাছে কর্মসংস্থানের দাবী জানানোই উচিত নয়। এরপর তো সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকে না এই ভেবে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারল কি পারল না এবং সকলের জন্য

ভোগের ব্যবস্থা করতে পারল কিনা ইত্যাদি। এরপর আমাদের এটি বলাও বন্ধ করে দেওয়া উচিত যে— সরকার আমাদের চাকরি দিচ্ছে না। সরকারের কাছে তো চাকরির জন্য খালি পদ তখনই আসবে যখন সরকারের তরফ থেকে কোনো কর্ম করার প্রয়োজন হবে বা কোনো গবেষণা করার প্রয়োজন হবে। আর যদি সরকার কোনো কর্ম করে তবে তা থেকে তো ভোগই উৎপন্ন হবে যা আবার আপনারা কেউই উপভোগ করতে চান না। কেননা ভোগ করলে তো আমরা পাপী হয়ে যাব। চারিদিকে তো ত্যাগেরই শোরগোল চলছে যে সবকিছু ত্যাগ কর। যখন সবকিছু ত্যাগই করতে হবে তাহলে তো কর্ম বা জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ কর্মসংস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে সরকার কোনো কর্ম করে কী করবে? সুতরাং প্রথমে সকলেকে মিলে এটি ঠিক করতে হবে যে ভোগ করতে হবে না ত্যাগ করতে হবে। সহজভাবে বললে আপনারা যদি সকলে ভোগী হতে চান তবেই অধিক কর্ম এবং জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন হবে। তাহলেই অধিক কর্মসংস্থান উৎপন্ন হবে। তবেই সরকার আপনাদের সকলকে কর্ম অর্থাৎ জীবিকা প্রদান করতে পারবে। এর অর্থ পরিষ্কার যে আপনারা যতজন ভোগী হবার জন্য তৈরি আছেন সরকার কেবলমাত্র ততজনকেই রোজগার প্রদান করতে পারে তার অধিক দিতে পারবে না। তাহলে এর অর্থ স্পষ্ট যে অধিক ভোগের অর্থ হচ্ছে অধিক কর্ম এবং অধিক জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে অধিক কর্মসংস্থান অর্থাৎ অধিক সুখ। কম ভোগ মানে কম কর্ম এবং কম জ্ঞান, যার অর্থ হচ্ছে কম কর্মসংস্থান। অর্থাৎ কম সুখ এবং অধিক দুঃখ। কোন বিষয়টিকে জীবনের আধার হিসেবে গ্রহণ করবেন সেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরকেই নিতে হবে। যদি কম ভোগকে জীবনের আধার হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে আপনি কোনোকিছুর মাধ্যমে অধিক সুখের দাবী করতে পারবেন না। যদি আপনি অধিক ভোগকে জীবনের আধার হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে সরকারের কাছ থেকে অধিক সুখের দাবী করতে পারবেন। তাহলে মূল কথা এই যে আমাদের প্রথমে পর্যাপ্ত ভোগী হওয়া উচিত। এর মধ্যেই জীবনের সমস্ত সুখ লুকিয়ে রয়েছে। তাই ভোগ ত্যাগ করার প্রচার-প্রসারকে আমাদের এখন বন্ধ করা উচিত। সকল ধর্মের গুরুদের কাছে বিনম্র নিবেদন করা উচিত যে— এখন আপনারা ত্যাগ করার জ্ঞান প্রদান করা বন্ধ করুন এবং সমাজকে ভোগী হবার জ্ঞান প্রদান করা শুরু করুন। ত্যাগের জ্ঞান থেকে দরিদ্রতা, অশিক্ষা, অজ্ঞানী, অপরাধ, দুঃখ, অশান্তি, অসন্তুষ্টির জীবন গঠিত হয় এবং ভোগের জ্ঞান থেকে সমৃদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান, সুখ, শান্তি, সন্তুষ্টির জীবন গঠিত হয়। এখন আপনার যেমন জীবন চাই সেই হিসেবে আপনি জীবনের আদর্শ তৈরি করুন। অর্থাৎ ভোগ অথবা ত্যাগ। যেমন চাইছেন সেই অনুযায়ী আদর্শ তৈরি করুন। সেইমত ফলাফল আপনি এবং আপনার সমাজের অন্যান্যরা পেতে থাকবে। সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। এই ভোগ, জ্ঞান এবং কর্মকে বাস্তবায়িত করার জন্যই কোনো ব্যবস্থা এবং অর্থশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আরও একটি কথা যে আমাদের দর্শনশাস্ত্রকেও এজন্য

উপযুক্ত করতে হবে। দর্শনশাস্ত্রকে সঠিক না করে সঠিক অর্থশাস্ত্রের কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। তাই দর্শনশাস্ত্র বাস্তবিক হওয়া উচিত। দর্শনশাস্ত্রকে এমন কপোল কল্পিত হওয়া উচিত নয় যার কোনো বাস্তবিক আধার নেই। দর্শনশাস্ত্রের আধার অপার্থিব হওয়া উচিত নয়। অপার্থিবের অর্থ হচ্ছে— দেখে মনে হবে সুখ কিন্তু বাস্তবে মিলবে দুঃখ। তার বাস্তবিক অর্থ এমন হওয়া উচিত যা দেখে মনেও হবে সুখ এবং মিলবেও সুখ। স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, জান্নাত ইত্যাদি সব কপোল কল্পনা যার কোনোরূপ বাস্তবিক ভিত্তি নেই। আর আশ্চর্যের বিষয় যে বর্তমান দর্শন যে সুখকে পরিত্যাজ্য বলছে— স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, জান্নাত ইত্যাদি কাল্পনিক স্থানে সেই সুখকেই আবার মহান বলছে! যে সুখ স্বর্গের মহান প্রতীক জগতের জন্য কেন তারা সেই সুখকে তুচ্ছ বলেন? তাদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উল্টে নাস্তিক বলে উপহাস করেন? তারা বলেন যে আপনার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই। আপনি হচ্ছেন ভোগী পুরুষ। যেন সমস্ত শ্রদ্ধা এই সকল ব্যক্তিরা নিজেদের কাছে একত্রিত করে রেখেছে। এখানে ভোগী হওয়া পাপ কিন্তু স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, জান্নাত ইত্যাদি স্থানে ভোগী হওয়া পুণ্য। এটি এদের কেমন দু-মুখো মাপদন্ড? একদিকে তারা ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেন অপরদিকে স্বর্গে বা জান্নাতে বহু অপ্সরা বা হুর এদের চাই। এসব উক্ত ব্যক্তিদের এবং আমাদের দর্শনের বিপরীত মাপদন্ড নয় কি? এখানে কেউ সুখের সন্ধান করলে বা সুখের দাবী করলে তারা তুচ্ছ প্রাণী। যদি বৈকুণ্ঠে বা জান্নাতে সুখ খোঁজে, আর তার জন্য উপাসনা-প্রার্থনা করে তবে তা হবে মহান! ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্ম-জ্ঞানীদের এটি দু-মুখো চরিত্র নয় কি? আসুন এবার আমাদের জীবনে যতপ্রকার সুখ রয়েছে তাদের বোঝার চেষ্টা করি।

১. শারীরিক সুখ
২. মানসিক সুখ
৩. ভাবনাত্মক সুখ
৪. আত্মিক সুখ

তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কিছু অতিআবশ্যক বিষয়ের উল্লেখ আছে যাদের ছাড়া জীবনের কল্পনা করা যায় না। এইসবকে আমরা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির নামে জানি। আসুন আমরা এবার দেখে নিই যে আমাদের ভোগ সামগ্রী কত প্রকার হয়ে থাকে। আমাদের কাছে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় রয়েছে যাদের মাধ্যমে নানা প্রকার ভোগ থেকে সুখ উপভোগ করি। সেগুলি হল কান, ত্বক, চোখ, জিহ্বা এবং নাক। কান দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি শুনতে পাই। যেমন শব্দ, সংগীত, কথাবার্তা ইত্যাদি। ত্বক দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার স্পর্শের সুখ প্রাপ্ত করি। যেমন কোমল স্পর্শ থেকে কঠিন স্পর্শ ইত্যাদি। চোখ দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য সুখ প্রাপ্ত করি। যেখানে বিভিন্ন রকমের আকার ও রঙের মেলবন্ধন থাকে। জিহ্বা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকার স্বাদের সুখ প্রাপ্ত করি।

যেখানে সকল প্রকার ভোজন, পানীয়, ফল-ফুল ইত্যাদি থাকে এবং নাকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকার গন্ধের সুখ প্রাপ্ত করি। যেখানে সকল প্রকার ঘ্রান, সৌরভ ইত্যাদি থাকে। যদিও সকল পদার্থের মধ্যে সবরকম বিশেষত্ব থাকে। যেমন— ভোজনের মধ্যে শব্দ থাকে, রূপ থাকে, স্বাদ থাকে এবং সুগন্ধও থাকে। ভোজনের সাথে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের সাথে। একইভাবে অবশিষ্ট বিষয়গুলিকেও বুঝে নেওয়া উচিত। তাহলে এই ভাবে আমরা সকল পদার্থ থেকে আমাদের ইপ্সিত সুখ প্রাপ্ত করতে পারি। এছাড়া কর্মের মধ্যেও নিজস্ব সুখ রয়েছে, জ্ঞান প্রাপ্তির মধ্যেও ভিন্ন সুখ রয়েছে। এখন এই সমস্ত ভোগ আবার চার প্রকারের হয়ে থাকে। কেননা সমাজে মানুষের মধ্যেও চার প্রকার শ্রেণী রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে শরীর, মন, ভাবনা এবং আত্মা।

১. শারীরিক স্তরের ভোগ
২. মানসিক স্তরের ভোগ
৩. ভাবনাত্মক স্তরের ভোগ
৪. চেতনাত্মক স্তরের ভোগ

শারীরিক স্তরের ভোগ আমাদেরকে শারীরিক স্তরে সুখ প্রদান করে। মানসিক স্তরের ভোগ আমাদেরকে মানসিক স্তরে সুখ প্রদান করে। ভাবনাত্মক স্তরের ভোগ আমাদেরকে ভাবনা স্তরে সুখ প্রদান করে। আর আত্মিক স্তরের ভোগ আমাদেরকে আত্মার স্তরে সুখ প্রদান করে। এই চার প্রকার সুখের মাধ্যমে আমাদের শরীর, মন, ভাবনা বা প্রাণ, আত্মা সুখী এবং সুস্থ্য থাকে। আমাদের এই চারপ্রকার সুখেরই প্রয়োজন হয়। তবে এদের মধ্যে কোনো এক প্রকার মুখ্য সুখ রয়েছে যা সকলের জন্য থাকে এবং অবশিষ্ট সুখ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদক্ষেপে থাকে। যেমন শারীরিক অবস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য শারীরিক সুখ হচ্ছে প্রমুখ এবং অবশিষ্ট সুখগুলি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে থাকবে। এইভাবে অবশিষ্ট অবস্থার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে একইভাবে বুঝে নেওয়া উচিত। সবগুলি সুখকে বোঝার জন্য আমি একটি উদাহরণের সাহায্য নিচ্ছি। যেন অবশিষ্টরাও বুঝে নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ভোজনকেই নিচ্ছি। যারা শারীরিক স্তরের মানুষ তাদের জন্য উচিত মাত্রায় ভোজন গ্রহণ করা জরুরী। পেট যেন সঠিক মাত্রায় ভরে এটি তাদের প্রথম উদ্দেশ্য থাকে। ভোজন সুস্বাদু হলে আরও ভাল তবে মাত্রা যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। তাদের জন্য ভোজনের মাত্রা পর্যাপ্ত হওয়া উচিত, নাহলে তারা ভোজন থেকে তৃপ্ত হবে না। অর্থাৎ কম মাত্রার ভোজন থেকে তারা পূর্ণ সুখের অনুভব করতে পারবে না। ভোজন যতই সুন্দর হোক না কেন, যতই সুস্বাদু হোক না কেন অথবা যতই স্বাস্থ্যকর হোক না কেন। তাহলে পরিমাণ এদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

যারা মানসিক স্তরের মানুষ হবেন তারা স্বাদ অনুভব করার জন্য ভোজন গ্রহণ করেন। ভোজন মাত্রায় কম হলেও চলবে কিন্তু সুস্বাদু হতে হবে। ভোজন পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে কিন্তু সুস্বাদু নয় তবে সেই ভোজন থেকে তারা পূর্ণ তৃপ্তি পাবে না। ভোজন যতই স্বাস্থ্যকর হোক না কেন, যতই সুন্দর হোক না কেন, যতই সুস্বাদু হোক না কেন তা হবে মূল্যহীন। এদের জন্য স্বাদ হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত।

ভাবনাত্মক স্তরের মানুষ যারা হন তারা সুন্দরের প্রতি অধিক মনোযোগ দেন। একবেলা ভোজন কম মাত্রায় হলেও চলবে, কম সুস্বাদু হলেও চলবে কিন্তু সুন্দর হতে হবে। যদি ভোজন সুস্বাদু হয়, মাত্রাও পর্যাপ্ত এবং স্বাস্থ্যকরও হয় কিন্তু সুন্দর যদি না হয় তবে সেই ভোজন থেকে পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করবে না। তাহলে ভোজন এদের জন্য সুন্দর হওয়া জরুরী।

চেতনাত্মক স্তরের মানুষ যারা হবেন তাদের জন্য ভোজন স্বাস্থ্যবর্ধক হওয়া জরুরী। একবেলা কম মাত্রায় হলেও চলবে, কম সুস্বাদু হলেও চলবে, সুন্দর না হলেও চলবে কিন্তু যদি স্বাস্থ্যবর্ধক না হয় অথবা যদি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয় তবে তা থেকে তাদের তৃপ্তি অনুভব হবে না। তাহলে এদের জন্য ভোজনের স্বাস্থ্যবর্ধক হওয়া প্রাথমিক শর্ত। তারপর সুন্দরতা, তারপর স্বাদ এবং তারপর পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে চার স্তরের মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। একইভাবে সকল প্রকার ভোগের ক্ষেত্রেও এমনভাবেই বুঝে নেওয়া উচিত। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থায় ভোজনের সকল গুণ আপনিই এসে যাবে কেননা প্রতিটি বস্তু এবং পরিষেবা সকলের জন্য উচ্চ গুণমানসম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ হবে। উপরে কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকার মানুষকে বোঝার জন্য আমি ওইসব আলোচনা করেছি। যেন বিভিন্ন প্রকার মানুষের দৃষ্টিকোণ আমরা বুঝতে পারি, যেন এটিও বুঝতে পারি যে কীভাবে একইরকম ভোগ থেকে সকলে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের সুখ অনুভব করে। একইভাবে কর্ম এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বুঝে নেওয়া উচিত। সকলেই নিজেদের অবস্থা অনুযায়ী কোনো না কোনো কর্মে নিযুক্ত হতে চায় যার মাধ্যমে তারা কর্ম করার সুখ প্রাপ্ত করবে। যেমন শারীরিক অবস্থার ব্যক্তিরা কৃষি সম্পর্কিত কর্ম করতে চায়, মানসিক অবস্থার ব্যক্তিরা উৎপাদনশিল্প সম্পর্কিত কর্ম করতে চায়, ভাবনাত্মক স্তরের ব্যক্তিরা প্রশাসনিক কর্ম করতে চায় এবং একইভাবে চেতনাত্মক স্তরের ব্যক্তিরা নেতৃত্ব সম্পর্কিত ও গবেষণামূলক কর্ম করতে চায়। আর আমরা সকলেই নিজেদের অবস্থা এবং ইচ্ছানুযায়ী কোনো না কোনো জ্ঞান প্রাপ্ত করতে চাই। তাহলে ভোগ, কর্ম এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকার সুখ প্রাপ্ত করে থাকি অথবা করতে চাই।

সত্যিই কি বেকারত্ব বলে কিছু হয়?

সরকার যেমন বলে থাকে আমাদের কাছে কর্মসংস্থান নেই, ভবিষ্যতে আমরা কর্মসংস্থান তৈরি করব। এবার দেখে নিই যে সমাজে কর্মসংস্থান কম থাকে নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। এটি বোঝার জন্য উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরে নিই এইসময় পৃথিবীতে কেবলমাত্র ১০,০০০ মানুষ রয়েছে। ধরুন ৬ জন মিলে একটি পরিবার। এই হিসেব মতে ১০,০০০ মানুষ মিলে আনুমানিক ১৬৬৬টি পরিবার তৈরি হয়। একটি পরিবারের অর্থ হচ্ছে ২ জন প্রবীণ মাতা পিতা, ২ জন যুবা মাতা পিতা এবং ২ জন ছেলেমেয়ে। এবার প্রতি পরিবার পিছু ১ জনের কর্মসংস্থান অর্থাৎ কমপক্ষে ১৬৬৬ জনকে কর্ম অথবা জীবিকা প্রদান করতে হবে। তাদের মাধ্যমে ১০,০০০ মানুষের ভোগের নির্মাণ এবং বিতরণ করতে হবে। এইভাবে বর্তমান জনসংখ্যাকেও একই অনুপাতে হিসেব করে নিতে হবে। আসুন বুঝে নিই এই বিভাজন কীভাবে নির্ধারিত হবে।

সর্বপ্রথমে জরুরী বস্তু হচ্ছে খাদ্য। অর্থাৎ ভোজনকে নিয়ে আলোচনা করি। বিভিন্ন প্রকারের ভোজনের অন্তর্গত সম্ভবত ১০ বা ততোধিক প্রকারের শস্য এবং ডাল, ২০ বা ততোধিক প্রকারের সব্জি, ১০ বা ততোধিক প্রকারের তৈল জাতীয় শস্য, ২০ বা ততোধিক প্রকারের মশলা, ২৫ বা ততোধিক প্রকারের ফল ইত্যাদি রয়েছে। সব মিলিয়ে ৮৫ বা তার অধিক প্রকারের বস্তু কেবলমাত্র ভোজনের জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ যদি ১ জন মানুষ কেবলমাত্র ১টি করে বস্তু উৎপাদন করে তবে ৮৫ জন মানুষকে আমরা কর্ম প্রদান করলাম। এ তো গেল কেবলমাত্র ভোজন উৎপাদন। এবার এই সকল বস্তুকে বাজারে বিক্রির জন্য মানুষের প্রয়োজন হবে। ১টি বস্তু ১ জন মানুষ বিক্রি করলে ৮৫ জন মানুষ প্রয়োজন। এ তো গেল উৎপাদন এবং উৎপাদিত বস্তুকে বাজারে নিয়ে আসা। এবার আসুন এইসব উৎপাদিত ফসল মিলিয়ে যেসব বস্তু তৈরি হয় সেই বিষয়ে। যেমন— তেল, মশলা, আলুর চিপস, পাঁপড়, বড়ি, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি। এইসব বস্তু মিলিয়ে ১০০ বা তারও অধিক হতে পারে। তাহলে এখানে ২৭০ জনের বেশী মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে গেল। এ তো গেল শুধুমাত্র খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত কর্মসংস্থান। চাষ-আবাদ করার জন্য যেসব সার, জল, ট্রাক্টর, বীজ, অন্যান্য মেশিনাদি নিয়ে কমপক্ষে আরও ১০০ জনের অধিক কর্মীর প্রয়োজন হবে। তাহলে সর্বমোট ৩৭০ জনের কর্মসংস্থান তৈরি হয়ে গেল।

এবার দ্বিতীয় কর্মে আসি। যেমন— যেমন জামাকাপড় বিষয়ক। কাপড় প্রস্তুতকারক, দোকান অবধি কাপড় পৌঁছানো, বিক্রি করা, সেলাই করা, পরিষ্কার করা, ইস্ত্রি করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কেবলমাত্র একটি কর্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করার জন্যই ২০ জনের বেশী লোকের প্রয়োজন হয়। বাজারে এই প্রকার ১০০ বা ততোধিক প্রোডাক্ট রয়েছে। তাহলে এই হিসেবে ১০০ প্রোডাক্টের জন্য ২০ জন হলে অবশিষ্ট সব কাজের জন্য মোট ২০০০ জন লোক প্রয়োজন। এছাড়াও বাজারে ৫০টির অধিক পরিষেবা ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন— স্বাস্থ্য, সেলুন, বিউটি পার্লার, মনোরঞ্জন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সাধন।

এবার আপনি হিসেব মিলিয়ে দেখুন ১০,০০০ জন মানুষের জন্য ৩০০০ জনেরও বেশী লোকের প্রয়োজন। যেখানে কেবলমাত্র ১৬৬৬ পরিবারকেই কর্ম বিতরণ করা হচ্ছে। এই ভাবে দেখলে আপনি বুঝে যাবেন যে বিভিন্ন প্রকার কর্মের বিতরণ করা কতটা সহজ। প্রথমে মানুষকে তাদের যোগ্যতা গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া। এরপর যাদের যেমন প্রকার যোগ্যতা বিকশিত হবে সেইমত তাদের পছন্দ অনুযায়ী সেই প্রকার কর্ম বিতরণ করে দেওয়া। সে যেন আনন্দের সাথে সেই কর্মকে সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারে। এর পাশাপাশি আমাদের আরও অনেক সুখসুবিধার প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন— শিক্ষা, খেলা, আবাস, সড়ক, বিদ্যুৎ, জল, যাতায়াত, ডাক, ব্যাংক, সুরক্ষা, হাসপাতাল, পার্ক ইত্যাদি। এইসব কর্ম সম্পাদন করার জন্যও বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হবে। এখানেও ২০০টির বেশী লোকের সর্বদা প্রয়োজন হবে।

উপরে আমরা যেভাবে হিসেব করেছিলাম তাতে ১০,০০০ নাগরিক রয়েছে। যেখানে কেবলমাত্র ১৬৬৬ লোককেই রোজগার প্রদান করার কথা ছিল। এবার আপনি বুঝতে পারছেন যে আমাদের কাছে ৪০০০ জনের বেশী কর্মসংস্থান রয়েছে। হতে পারে আমি কোথাও একটু অধিক বলে দিয়েছি। তাহলেও তো মোট ১৬৬৬ জন লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিতভাবেই হয়ে যাবে। কর্মসংস্থান যতটা থাকবে তা সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া প্রয়োজন। এমনটি করা উচিত নয় যে কিছু লোককে অনেক কাজের সুযোগ দিয়ে দেওয়া হল এবং কিছু লোক কর্মসংস্থানের প্রতীক্ষাতেই জীবন কাটিয়ে দিল। এমন হলে অবশিষ্টদের সাথে অন্যায় করা হবে না? তাহলে সরকার কেন বারবার বলছে তাদের কাছে কর্মসংস্থান নেই? এর অর্থ এই যে সরকারের কাছে কোনো সঠিক নীতি নেই অথবা সঠিক ম্যানেজমেন্ট নেই। যার কারণে সমস্ত ক্ষেত্রে পারদর্শিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার চলুন প্রথমে আমরা আমাদের নীতিসমূহকে সঠিক করে নিই। সংক্ষেপে বললে এটিই হচ্ছে অর্থশাস্ত্র। এখন শুধুমাত্র এটিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এখনো অবধি বিশ্বব্যাপী যতগুলি অর্থশাস্ত্র রয়েছে তাদের কোনোটিই ন্যায়ের আধারে সঠিক বা

বাস্তবিক নয়। তাহলে এইসব সরিয়ে এমন একটি অর্থশাস্ত্রের সৃজন করি যা প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবিক পথে সঠিক হবে। মুখ্যত মানুষ তিনপ্রকার সুখ কামনা করে। জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ। কিছু মানুষ জ্ঞানের মধ্যে অধিক সুখ পায়। যেমন বৈজ্ঞানিক বা অন্য কোনো গবেষণায় অধ্যয়নরত অথবা অধ্যাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। তারা কোনোকিছু জেনে বা গবেষণা করে সুখ পেয়ে থাকে এবং দীর্ঘ সময় সেই কাজে লিপ্ত থাকে। সেইসব কাজের প্রতি তাদের গভীর রুচি থাকে। এইভাবে কিছু ব্যক্তি কর্মের মধ্যে সুখ পেয়ে থাকে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিজেদের পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী দীর্ঘ সময় অবধি আনন্দের সাথে কর্ম করতে পছন্দ করবে এবং করে যেতেও চাইবে। এইভাবে সকলে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার ভোগকে উপভোগ করে থাকে।

তাহলে এর অর্থ এটিই— জ্ঞান অর্জন করাতেও সুখ রয়েছে, কর্মের মধ্যেও সুখ রয়েছে এবং ভোগের মধ্যেও সুখ রয়েছে। এইভাবে জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই অপার সুখ রয়েছে, যদি তা আমাদের রুচি অনুসারে হয়। আর যদি তা আমাদের পছন্দের বিপরীত হয় তবে দুঃখ প্রাপ্তি হবে। শিক্ষার্থীরা সাধারণত ২৫ বছর বয়স অবধি নিজের পছন্দ বা রুচি অনুযায়ী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোনো না কোনো কর্ম অথবা গবেষণা করার রুচি অর্জন করে ফেলে। সেই রুচি বা পছন্দের ভিত্তিতে সরকার তাদের কোনো গবেষণা অথবা কর্ম করার ব্যবস্থা প্রদান করে দেবেই। ফলে আপনার পছন্দমত কর্মের পারদর্শিতা বা জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আপনি পেয়েই যাবেন। তাহলে তো সবদিক দিয়ে আপনার জীবন সুখী হয়েই যাবে। অর্থাৎ আপনি সর্বদা সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করতে থাকবেন।

মুদ্রার সঠিক স্বরূপ

যে ব্যবস্থা আমি দিতে চলেছি তাতে মুদ্রার প্রয়োজন কেবলমাত্র সরকার এবং মানুষের মধ্যে গণনার জন্যই ব্যবহার হবে। একজন ব্যক্তির সাথে অপর কোনো ব্যক্তি মুদ্রা নিয়ে কোনো লেনদেন করতে পারবে না। এছাড়া সরকার আপন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে যেখানে সম্পদ বিষয়ক গননার প্রয়োজন হবে সেখানেই কেবলমাত্র মুদ্রা প্রয়োগ করবে। যখনই কোনো ব্যক্তি সরকারের কাছে কোনো বস্তুর দাবী করবে সরকার সেই দাবিকে নির্দিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করবে। সেই বিভাগ ওই বস্তু নির্মাণ করবে, এরপর বিতরণ বিভাগ ওই বস্তু ব্যক্তির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। যখন ওই বস্তু সেই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে তখন আপনা-আপনি ওই বস্তুর সমান মুদ্রা সেই ব্যক্তির একাউন্ট থেকে কেটে যাবে। সরকার

এই প্রকার মুদ্রাই জারী করবে। এমনটি করলে কখনোই মুদ্রার অভাব পড়বে না, মুদ্রা অধিক হবে না অথবা মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না। এই নীতির ফলে সরকারের কাছে কখনোই অর্থসঙ্কট আসবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সর্বদা মজুত থাকবে। মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসঙ্কট তো কখনোই আসবে না। মুদ্রা আমাদের জীবনে এইজন্য এসেছে যেন আমরা লেনদেন প্রক্রিয়াকে সরল করতে পারি। মুদ্রা এইজন্য আসেনি যাতে আমরা ঋণ দিয়ে সুদ নিতে পারি অথবা অর্থের মাধ্যমে অর্থের মুনাফা করতে পারি। লেনদেন ছাড়া মুদ্রার অন্য কোনো প্রয়োগ সমাজে অন্যায়কেই প্রভাবিত করতে থাকে। যার ফলে সমাজে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটতে থাকে এবং ফলস্বরূপ অবিরত দুঃখের প্রাপ্তি হতে থাকে। একসময় সেই দুঃখ সমাজের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়। এইভাবে সমাজে অপরাধের জন্ম হতে থাকে এবং নিরন্তর সেই অপরাধ চলতে থাকে। এইজন্য মুদ্রার প্রয়োগ কেবলমাত্র গণনা করার কাজে ব্যবহার করা উচিত। এই নতুন ব্যবস্থায় মুদ্রার স্বরূপ এবং প্রয়োগ কেবলমাত্র এইজন্যই করা হবে। আর এই প্রকার প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন তা সরকার ও জনগণের মধ্যে হবে এবং সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে, ব্যক্তি দ্বারা নয়। মুদ্রা যদি জনগণের মধ্যে সঞ্চালিত হয় তবে তা থেকে অন্যায়কারী প্রতিফলনই সামনে আসবে। সম্পূর্ণ সমাজ লাভ ও ক্ষতির ভিত্তিতে চালিত হবে। অর্থাৎ অর্থের প্রয়োগ ভুল পথে হবে এবং সমাজে দুঃখ উৎপন্ন করবে। এইজন্য সরকারই কেবলমাত্র মুদ্রার প্রয়োগ করবে। অন্য কোনো ব্যক্তি স্বয়ং মুদ্রার প্রয়োগ করতে পারবে না। যদিও তার কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। কারণ ব্যক্তির যা

নতুন অর্থশাস্ত্রের লাভ

কোন অপচয় হবে না কেননা চাহিদা অনুযায়ী নির্মাণ হবে	ট্যাক্স সিস্টেমের অবসান	মুল্য বৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাস বলে কিছু থাকবে না	সকলের ভবিষ্যৎ সর্বদা জন্য সুরক্ষিত থাকবে	মুদ্রার অভাবজনিত কোন সমস্যা কখনই আসবে না
সমান মূল্যের বস্তু, পরিষেবা ইত্যাদির সুবিধা থাকবে	আলাদা করে কোন প্রচার বা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই	সেই অর্থে বাজারের কোনও প্রয়োজন পড়বে না	কোন প্রকার দুর্নীতির সম্ভাবনা থাকবে না	পরিবহনের সমস্যা থাকবে না
সকলের জন্য সমতার বাস্তবিক অধিকার থাকবে	ধনী-দরিদ্র থাকবে না। সকলেই সমস্ত কিছু পেতে থাকবে	লাভ-ক্ষতি অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিপজ্জনক খেলা থাকবে না। বরং স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা থাকবে	সকলের জন্য সমতা অনুযায়ী সমস্ত কিছু পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকবে	কোন প্রকার দূষণ থাকবে না
সমৃদ্ধশালী জীবন যাপনের জন্য অর্থ বাধ্যতামূলক নয়	একই বস্তু নানাপ্রকার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সবই উচ্চ মানের হবে	বহু প্রকারের অনাবশ্যক কর্ম স্বাভাবিকরূপেই সমাপ্ত হয়ে যাবে	মানুষ সুখের জন্যই কর্ম করবে। জীবন চালানোর জন্য বাধ্য হয়ে নয়	সমস্ত পদে সঠিক ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। ফলে সকল কর্ম উচ্চ গুণসম্পন্ন এবং সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হবে
সংবিধান সংক্ষিপ্ত এবং সরল হবে যেন সকলে সহজেই বুঝতে এবং পালন করতে পার	সকলের জন্য সমমানের উন্নত জীবন যাপন থাকবে	সবকিছু উচ্চ গুণসম্পন্ন, অত্যাধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত হবে	সমস্ত কিছুর মূল্য এক সূত্রে ন্যায়পূর্ণভাবে নির্ধারিত হবে	বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সঠিক পথে পরিচালিত হবে
মুদ্রার ব্যবহার কেবলমাত্র সরকার সম্পদ গণনার ক্ষেত্রেই করবে	দলতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটবে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।	সকল নাগরিক প্রকৃত গণতন্ত্র অনুভব করবে।	জিডিপি'র পরিবর্তে সন্তুষ্টিই হবে সমৃদ্ধির মাপদন্ড	এবং আরও অনেক

প্রয়োজন তা সরকারের কাছে দাবী করবে এবং সরকার সেই বস্তু বা পরিষেবা উপলব্ধ করে দেবে। সরকার প্রতি বছর জনগণের একাউন্টে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ জমা করে দেবে।

এরপর সকলে সেই পরিমাণ অর্থের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছানুযায়ী বস্তু ও পরিষেবা গ্রহণ করে সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে। ব্যক্তি যখন ইচ্ছে তার একাউন্টের বিবরণ দেখতে পারবে। সে নিজে থেকে অন্য কাউকে অর্থ ট্রান্সফার করতে পারবে না বা প্রদান করতে পারবে না। সকলের একাউন্ট সরকার পরিচালিত করবে। প্রত্যেক বছর আপনার খরচ না হওয়া অর্থের সাথে নতুন বছরের অর্থরাশি যুক্ত হয়ে যাবে। এভাবেই আপনার একাউন্ট সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক অর্থরাশির সীমা ১ লাখ টাকা এক বছরের জন্য প্রদান করা হল এবং আপনি বর্তমান বছরে ৯০ হাজার টাকা খরচ করলেন। পরের বছর সরকার আবার আপনাকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। খরচ করার জন্য আপনার একাউন্টে তখন ১ লাখ ১০ হাজার টাকা থাকবে। কিন্তু এই অর্থ কেবলমাত্র সরকারের কাছে কিছু কেনাকাটা করার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। জনগণ নিজেদের মধ্যে কোনো লেনদেন করতে পারবে না। এমনটি এইজন্য করা হয়েছে যে সরকার যদি জনগণকে মুদ্রা লেনদেন করার স্বাধীনতা দিয়ে দেয় তবে সরকার কখনো জানতে পারবে না যে কোনো বস্তু অথবা পরিষেবার কতটা চাহিদা রয়েছে। কেননা জনগণ নিজেদের মধ্যেই লেনদেন করে নেবে এবং সরকারের কাছে তা জানার কোনো উপায় থাকবে না। সরকার যদি সকলের চাহিদা জানতে না পারে তাহলে পূরণ করার ব্যবস্থাও করতে পারবে না। তাহলে তো জনগণকে স্বয়ং নিজেদেরকে নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে, আর তা করে ওঠা কখনোই সম্ভব হবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় এমনটিই হয়ে চলেছে। এমন অবস্থায় বস্তুর মূল্য চাহিদা পূরণের আধারে চলতে থাকবে। মানুষ অধিক লাভের আশায় কিছু না কিছু হেরফের করতে থাকবে, যার ফলে কিছু বস্তুর মূল্য এতই বেড়ে যাবে যে স্বল্প আয়ের মানুষ তা কিনতেই পারবে না এবং কিছু বস্তুর মূল্য এতই কমে যাবে যে লগ্নি করা অর্থই ফেরত আসবে না। ফলস্বরূপ সমাজে ভয়ঙ্করভাবে আর্থিক বৈষম্যই দেখা দেবে। উপরে আমরা বুঝে নিয়েছি যে আর্থিক বৈষম্যই হচ্ছে সমাজের সকল দুর্দশার কারণ। অধিক আয়ের লোভে সকল খাদ্য পদার্থে ভেজাল মেশানো শুরু হবে। সকল প্রকার বস্তু এবং পরিষেবার গুণগত মান নিন্মমুখী হয়ে যাবে। সকল প্রকার দূষণ বাড়তে থাকবে এবং সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কেননা কোথায় কোন ব্যক্তি কি তৈরি করছে এবং কে কোন বস্তু কিনছে সরকার জানতে পারবে না। ফলে আবার মুদ্রাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এরপর তা মাধ্যম নয় সাধন হয়ে উঠবে অধিক থেকে ততোধিক মুদ্রা উপার্জন করার জন্য। একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, সমস্ত ব্যবহার নকল হয়ে উঠবে, প্রেমভাব থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এককথায় বললে বর্তমান সময়ের অবস্থাই ফিরে আসবে। তাহলে বোঝা গেল যে মুদ্রাকে স্বতন্ত্র করে দিলে সবকিছু অনিয়মিত এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। যেমনটি বর্তমানে ঘটছে। মুদ্রা ব্যবহারের স্বতন্ত্রতা সমাজে সকল প্রকার দুর্নীতি ক্রমাগত উৎপন্ন করতে থাকবে। সরকার তা ঠেকানোর যতই

চেষ্টা করুক না কেন তা করতে পারবে না। কেননা যাদের সরকার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য নিযুক্ত করবে তারাও আর্থিক বৈষম্যের কারণে দুর্নীতি করতে বাধ্য হয়ে যাবে। আবার সরকারেরও তো পরবর্তী নির্বাচনে লড়াই করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। সেটি দুর্নীতি থেকেই সম্ভব। সকলে তো সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করতে চায়। এতে কিছুমাত্র ভুল নেই যে মানুষ কেন সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপন করতে চায়। তার জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস সে করতে থাকে। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে মুদ্রাকে স্বতন্ত্র করে দিলে তার পরিণাম কি ভয়ানক হতে পারে। আর সেইসব আমরা আমাদের আভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই জানি। আর্থিক বৈষম্য তখনই হবে যখন মুদ্রাকে সমাজ সঞ্চালন করবে, ব্যক্তি দ্বারা নয়। এখানে সমাজের অর্থ বলতে আমি সরকারকে বুঝিয়েছি। ব্যবস্থা তৈরি করার জন্য এবং ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সমাজই তো সরকারকে নিযুক্ত করবে। কোনো ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন হবে সে নিজের প্রোফাইল থেকে সরকারের কাছে অনলাইনে অর্ডার করবে এবং সেই অর্ডার আপনিই নির্দিষ্ট বিভাগে চলে যাবে। নির্দিষ্ট বিভাগ সেই বস্তু প্রস্তুত করে বিতরণ বিভাগে পাঠিয়ে দেবে। বিতরণ বিভাগ অর্ডার-কর্তার ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। এইভাবে সকলে সরকারের কাছে বস্তু এবং পরিষেবা অর্ডার করতে পারবে এবং প্রাপ্ত করতে থাকবে। যদি কেউ কোনো পুরনো বস্তু বিক্রি করতে চায় তবে তা সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারবে এবং কেউ কোনো পুরনো বস্তু কিনতে চাইলে সে সরকারের কাছ থেকে কিনতেও পারবে। সরকার এইসব বস্তুর মূল্য অনলাইনে উল্লেখ করে দেবে। যার প্রয়োজন হবে তার জন্য সে সরকারের কাছে অর্ডার করতে পারবে। এইভাবেই পুরনো বস্তুকেও মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। এই প্রকারে সরকার মুদ্রা সঞ্চালনের পাশাপাশি আর্থিক সমতা বজায় রাখবে। অনেকে আবার এমনটি বলেন যে মুদ্রাই হচ্ছে সকল সমস্যার উৎস। মূলত বিষয়টি এমন নয়। লেনদেনকে সহজ সরল করার জন্য মুদ্রা হচ্ছে একটি মাধ্যম মাত্র। বিষয়টি এমন— অনেকেই বলেন সব্জি কাটার ছুরিই হচ্ছে সকল সমস্যার কারণ। কেননা ছুরি দিয়ে বারবার হাত কেটে যায়। কিন্তু ছুরিকে যদি আপনি জীবন থেকে সরিয়ে দেন তবে অধিক অসুবিধেয় পড়বেন। তখন সব্জি কাটা বা খাবার তৈরি করতে অনেক সমস্যা হবে এবং সময় অধিক লাগবে। যেটি করতে হবে তা হচ্ছে ছুরি আমাদের কাছে থাকবে, তাকে এমনভাবে তৈরি করা যেন অসাবধান হলেও যেন আহত করতে না পারে। একইরকমভাবে আমি মুদ্রাকে রেখেছি, কিন্তু তার স্বরূপ এবং সঞ্চালন এমন করে দিয়েছি যেন তা থেকে সমাজের শুধুমাত্র লাভই হয় কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়াই। বর্তমান ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে দিলে বস্তুর বিনিময় অনেক কঠিন হয়ে যাবে এবং বস্তু বিনিময়ের গতিও রুদ্ধ হয়ে পড়বে। যার ফলে মানুষ সময়মত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত করতে পারবে না ও সুখী হতে পারবে না। এই অসুবিধের ফলে দুঃখই উৎপন্ন হবে। এর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণও থাকবে না। কেননা সরকার জানতেই পারবে না যে

মানুষ নিজেদের মধ্যে কি এবং কতটা লেনদেন করছে। আবার বস্তুর উৎপাদন বা যোগান জনগণের হাতেই দিতে হবে। ফলে ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালিত হতে পারবে না। আবার নতুন করে আর্থিক বৈষম্য তৈরি হবে এবং বর্তমান সময়ের মতই সকল সমস্যা উৎপন্ন হয়ে যাবে। সমাজ বর্তমান সময় থেকে ১০০ বছর পেছনে চলে যাবে। সরকার সঠিকভাবে চালিত হতে পারবে না। বড় রকমের গবেষণা করতে পারবে না। সামাজিক সুখসুবিধা সীমিত হয়ে পড়বে। এভাবে বুঝে নিন যে রাজাদের সময়ে যে সামাজিক অবস্থা ছিল তেমন অবস্থা বর্তমান সময়ে চলে আসবে। এইজন্য মুদ্রাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে কোনো লাভ হবে না। উল্টে সমস্ত উন্নয়নের গতি শিথিল হয়ে পড়বে। সরকারকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতেই হয় তবে তো মুদ্রা সঞ্চালনও নিয়ন্ত্রণ করে দেওয়া যায়, যেন মুদ্রার লাভ সকলে পেতে পারে এবং তা থেকে যেন কোনো দুঃখ উৎপন্ন না হয়। তাই এটিই হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি কারণ এতে মুদ্রাও থাকবে এবং তা কেউ অপপ্রয়োগও করতে পারবে না।

মুদ্রা থেকে যেন সমাজের লাভই হয়। আর সেই পদ্ধতি কি তা আমি উপরে বুঝিয়ে দিয়েছি। কারোর কাছে এর চাইতেও উত্তম পদ্ধতি থাকলে দয়া করে আমায় জানাবেন। এই ব্যবস্থায় সকল বস্তু এবং পরিষেবার মাপদণ্ড একই প্রকার করা হবে। বর্তমান ব্যবস্থার মত নয়। তাই নতুন ব্যবস্থায় যে কোনো বস্তুর মূল্য সর্বদা একইরকম থাকবে। চাহিদা এবং পূর্তির আধারে তা নির্ণয় করা হবে না।

ক্রোধ, লোভ, মোহ, অশান্তি, অপরাধ ইত্যাদি উৎপন্নই হবে না

- সমান জীবন স্তর থাকার কারণে সকলের জন্য সমানভাবে সমস্তকিছু সর্বদা প্রাপ্ত হতে থাকবে। যেমন— ইচ্ছে অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম, ভোগ ইত্যাদি।
- এতে কারোরই কোনো ক্রোধ উৎপন্ন হবে না। কেননা ক্রোধ তখনই আসে যখন কারোর ইচ্ছেপূর্তিতে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- লোভ উৎপন্ন হবে না কারণ লোভ তখনই উৎপন্ন হয় যখন আমাদের মনে হয় আগামীকাল পাব কিনা তা নিশ্চিত নয় এবং যখন বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী যোগান কম হয়।
- মোহ উৎপন্ন হবে না কারণ প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের দেখভালের ব্যবস্থা থাকবে। আমার সন্তানই আমার দেখভাল করবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। যিনি প্রবীণ সদস্যদের দেখভাল করে সুখ পাবেন তিনি তাদের দেখভাল করবেন। তা না হলে সরকারের তরফ থেকেই পরিপূর্ণ দেখভালের ব্যবস্থা থাকবে।
- যখন আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম, ভোগ এবং অন্য সকল সুখসুবিধা মিলতে থাকবে তখন সকলের জীবনে শান্তি সর্বদা বিরাজ করবে। তার জন্য আলাদা করে কিছু করার প্রয়োজন পড়বে না।
- এইসবের জন্য কোনো প্রকার ধ্যান, মন্ত্র, জপ, ত্যাগ, তপস্যা, পূজা, প্রার্থনা, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে না। কারণ জীবনের সমস্ত প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবে ব্যবস্থার পরিণামস্বরূপ সকলেই সর্বদা পেতে থাকবে। কোনো প্রকার অপরাধ সংঘটিত হবার সম্ভাবনাই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তার অবশিষ্ট কোনো কারণও থাকবে না।
- যদি কেউ অপরাধ করতেও চায় তা করতে পারবে না কারণ ব্যবস্থার মধ্যে এসব করার কোনো স্থান থাকবে না। অর্থাৎ কেউ চাইলেও তা করতে পারবে না।

নতুন ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির মত কোনো বিষয় থাকবেই না। সকলের জীবনস্তর একসমান থাকবে। সমাজ যখন পুরনো ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় প্রবেশ করবে তখন পুরনো অভিজ্ঞতার কারণে মানুষ অনাবশ্যক বস্তুর দাবী করতে চাইবে। ফলে তখন একটি বড় সমস্যা উৎপন্ন হবে। এই অসুবিধে থেকে মুক্ত হবার জন্য অর্ডার বা চাহিদা পূরণের উপর ৩ থেকে ৫ বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন পড়বে। সেই সময়কালে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী কিছু প্রাপ্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন পড়বে। এর ফলে সরকার আপনাকে প্রথমেই পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থরাশি প্রদান করে দেবে। বছরের মাঝে কোনো সময় যদি সরকারের মনে হয় অর্থের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন তবে তা বাড়াতেও পারবে। যখন সমাজের মধ্যে একরকম সমতা চলে আসবে তখন সম্ভবত অর্থের কোনো সীমা নির্ধারণের প্রয়োজন পড়বে না। যার যেমন বস্তু অথবা পরিষেবা প্রয়োজন হবে তা গ্রহণ করতে থাকবে এবং সুখী জীবন উপভোগ করতে থাকবে। তখন এই প্রকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন থাকবে না। কেননা সমস্ত বস্তু এবং পরিষেবা বিনামূল্যেই সকলে পেতে থাকবে।

বস্তু এবং পরিষেবার মূল্য গণনা

একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে বস্তু বা পরিষেবার মূল্য কখনোই ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের উপর নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। বস্তু এবং পরিষেবার মূল্য সর্বদা একটি ন্যায়কারী মাপদন্ডের মাধ্যমে নির্ণয় করা উচিত। যেমন ধরা যাক ১ ঘণ্টা শ্রমের মূল্য ১ মুদ্রার সমান। এবার— কোনো বস্তু নির্মিত হতে এবং আপনার কাছে পৌঁছাতে যত ঘণ্টা সময় লাগবে তা হিসেব করতে হবে। ধরে নেওয়া যাক একটি বস্তু ২ ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে তৈরি হল এবং বিতরণ হল। তাহলে সেই বস্তুর মূল্য ২ মুদ্রা হল। সামাজিক সুখসুবিধা তো আমরা সকলে বিনামুল্যেই পাব। আবার সকল প্রকার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব নয়। যেমন বৌদ্ধিক শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। যদিও নতুন ব্যবস্থায় সকল প্রকার শ্রমের মূল্য সমান থাকবে। সেইজন্য এমন সব বস্তু এবং পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ সেই শ্রমের ভিত্তিতেই হবে যেসব বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। যার পদ্ধতি এমনতর হবে যে ধরুন একজন কাঠমিস্ত্রি একটি চেয়ার ১ ঘণ্টায় তৈরি করবে। এই হিসেব আসবে সপ্তাহে ৫ দিন কাজের ভিত্তিতে। তাহলে ৫ ঘণ্টায় সে প্রতিদিন ৫টি চেয়ার তৈরি করে ফেলবে। এইভাবে সে একমাসে ১০০টি (দিনে ৫ ঘণ্টা শ্রম × সপ্তাহে ৫ দিন = সপ্তাহে ২৫ ঘণ্টা × ৪ সপ্তাহ) চেয়ার তৈরি করে নেবে। তাহলে এইভাবে সেই কাঠমিস্ত্রির বেতন হল প্রতিমাসে ১০০ মুদ্রা। এবার এই পদ্ধতিকে আধার করে সকলের বেতন হবে প্রতিমাসে ১০০ মুদ্রা। যারা সড়ক, জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিভাগে কর্মরত

থাকবেন তাদের বেতনও প্রতিমাসে ১০০ মুদ্রা ধরা হবে। এবার ধরে নিই সরকারি কাজে ১০০০ জন ব্যক্তি কর্ম করছে। তাহলে প্রতি মাসে সকলের বেতন হবে ১,০০,০০০ মুদ্রা। অর্থাৎ প্রতি মাসে সরকারের মোট খরচ হবে ১,০০,০০০ মুদ্রা। সরকার এই খরচকে সেইসব বস্তু এবং পরিষেবার সাথে সামানভাবে জুড়ে দেবে। ধরে নেওয়া যাক ১,০০,০০০ মুদ্রার জন্য সেই পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে বস্তু ও পরিষেবার নির্মাণ হল। এই হিসেব অনুযায়ী উৎপাদিত বস্তু এবং পরিষেবার মূল্য হবে ১,০০,০০০ (পরিমাপযোগ্য শ্রম) + ১,০০,০০০ (অপরিমাপযোগ্য শ্রম), অর্থাৎ ২,০০,০০০ মুদ্রা। এবার ২ প্রকার শ্রমের বিনিময়ে নির্মিত এবং বিতরণযোগ্য চেয়ারের অন্তিম মূল্য হবে ৪ মুদ্রা (উৎপাদন শ্রম + অন্যান্য পরিষেবাজনিত শ্রম)। এইভাবে বস্তু ও পরিষেবার অন্তিম মূল্য নির্ধারিত হতে থাকবে। এই ব্যবস্থায় কাউকেই বেতন প্রদান করা হবে না। ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য অবশ্যই সঠিকভাবে সমস্তকিছুর গণনা হবে। যখন সরকার কোনো কাজের প্ল্যানিং করবে তখন সরকারের অভ্যন্তরীণ বিভাগে এই প্রকার হিসেব সহায়ক হবে। এই মূল্য নির্ধারণের সহায়তা নিয়েই সরকার কোনো বস্তুর অনাবশ্যক নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। প্রযুক্তি, মেশিন ইত্যাদির দ্বারা যা কিছু অন্তিম অবস্থায় প্রয়োগ হবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও এই নিয়ম মেনে চলা হবে। এই প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো সমস্যা হলে ওই হিসেবের দ্বারা সহজেই তা জানা যাবে এবং তৎক্ষণাৎ সমাধান করা যাবে। তাহলে আমরা এবার নতুন ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রয়োগ বুঝে নিয়েছি। সবশেষে আমি এটিই বলতে চাই যে মুদ্রার প্রয়োগ এইসব বিষয় মাথায় রেখেই করা হবে যেন সকলের জীবন-যাপন সহজ হয়, আরামদায়ক হয়, স্পষ্টতা ও পারদর্শিতা বৃদ্ধি পায় এবং সব মিলিয়ে যেন সুখ বৃদ্ধি পায়। কোনোপ্রকার দুঃখ যেন উৎপন্ন না হয়। এই মুদ্রাকে নিয়ে পরেও যদি কোনো সমস্যা উৎপন্ন হয় তার সমাধানও এই উপায়েই করা হবে। আর আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি এর থেকে অন্য কোনো ভাল উপায় থাকে কিংবা যদি ভবিষ্যতেও আসে তবে তা আমি স্বীকার করে নেব। এই ব্যবস্থায় সরকারকে কোনোপ্রকার ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় করতে হবে না। তাই ট্যাক্স তোলার জন্য কোনো বিভাগও খুলতে হবে না। মানুষের জন্য পুলিশ ব্যবহার করতে হবে না। কারণ কেউ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাবে না। ফলে কাউকে তল্লাসি করতে হবে না। সবকিছু অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ তো সকলের জন্য সমানভাবে বিনামূল্যেই রয়েছে। নতুন অর্থশাস্ত্র খুবই সরল হবে এবং সহজেই সকলে বুঝতে পারবে।

পারিমাণ রাশির গণনা

এই ব্যবস্থায় পরিমাণ রাশি সকলের জন্য সমান থাকবে। সরকার দ্বারা সকলের একাউন্টে সমান অর্থরাশি প্রতি বছরের পয়লা তারিখে প্রদান করা হবে। শিশুদের জন্য অর্থরাশি তাদের বয়স অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ২৫ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সীরা জীবিকা নির্বাহ করবে। কেউ চাইলে তার কার্যকাল কমিয়ে নিতে পারেন, তাহলে সরকার তার জন্য সেই অনুযায়ী অর্থরাশির সীমা নির্ধারণ করে দেবে। উদাহরণস্বরূপ ধরে নিন সরকার প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা কাজের সাধারণ সময় নির্ধারণ করে দিল। যদি কাজের জন্য সপ্তাহে ৫ দিন নির্ধারিত হয় তবে এই হিসেবে একজনকে মাসে ২০ দিন কর্ম করতে হবে। অর্থাৎ মাসে ১০০ ঘণ্টা কর্ম করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দিনে ৩ ঘণ্টা কর্ম করতে চান সরকারও সেই হিসেবে অর্থরাশির পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে। উদাহরণ হিসেবে ধরে নিন সরকার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১ লক্ষ অর্থরাশি নির্ধারণ করে দিল ঐ বছরের জন্য। তাহলে এই হিসেব অনুযায়ী সরকার ৩ ঘণ্টা কাজের জন্য ৬০০০০ অর্থরাশি অবধি সীমা নির্ধারণ করে দেবে। এবার সেই ব্যক্তি এই অর্থরাশির সীমা অবধি সুবিধা নিতে পারবে। যদিও আমার অনুসন্ধান অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি নির্ধারিত সময় অবধি কর্ম করতে চাইবেন না। যেহেতু বর্তমান সময়ের ব্যবস্থা সঠিক নেই তাই বেশীরভাগ মানুষ বাধ্য হয়ে অস্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে। এর ফলে অনেকেই বিভিন্ন কারণে কর্ম করতে চান না অথবা পছন্দের কর্ম পাননা বলে কাজে ফাঁকি দেন এবং সমাজের উপরই নির্ভরশীল থাকতে চান। যখন এই ভুল ব্যবস্থা থেকে সঠিক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকবে সেইসময়ও এই ধরণের সমস্যা আসতে পারে। শুরুতে কিছুটা দায়িত্ব সকলেকে নিতে হবে। হয় আমরা সরকারকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব অথবা নিজেদের সহযোগিতার ভিত্তিতেই সরকারের কাছে আশা রাখব। যখনই নতুন ব্যবস্থা পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়ে যাবে তখন কি করার প্রয়োজন পড়বে সে বিষয়ে সরকার বিচার বিবেচনা করবে। সরকার দেখবে এই কথার অর্থ হচ্ছে জনগণই দেখবে। এই ব্যবস্থায় জনগণই অন্তিম সিদ্ধান্ত নেবে। কখনো কোনো বস্তুর অভাব হবে না তার কারণ অর্ডার বা চাহিদা জনগণের কাছ থেকে প্রথমেই নিয়ে নেওয়া হবে। অর্ডার গ্রহণ করার পরেই তো কোনো বস্তু নির্মিত হবে, ফলে অনাবশ্যক গুদামঘর তৈরির প্রয়োজনও থাকবে না। প্রায় সমস্ত বস্তু সরাসরি তাদের আবাসিক স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। বড় কোনো বাজারের প্রয়োজনও থাকবে না। মানুষের উপর কাজের ভারও কম থাকবে কেননা সকলেই নিজেদের প্রস্তাবিত কর্ম করবে এবং কেউই কোনো অনাবশ্যক কর্ম করবে না। এতে মানুষ অবসর সময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সুখ

উপভোগ করতে পারবে। সকল বস্তু এবং পরিষেবার মূল্য মোটামুটি স্থায়ী থাকবে। তাহলে মূল্যবৃদ্ধি বা মূল্যহ্রাসের অবস্থা কখনো হবে না। বার বার বেতন কখনোই বাড়াতে হবে না। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য বা অন্য কোনো সংকটে ভর্তুকি দিতে হবে না। কৃষকগণ কখনো বলবে না যে আমরা ফসলের সঠিক মূল্য পাচ্ছি না। গ্রাহকগণও কখনো মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ করবে না। সবকিছুর সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য বজায় থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে একবার যা চূড়ান্ত হয়ে যাবে বারবার তা বদলানোর প্রয়োজন পড়বে না। এখন যেমন সরকার ও জনগণ পরস্পরের মধ্যে চোর পুলিশের খেলা খেলতে থাকে এবং ব্যবস্থার অজুহাত দিয়ে সকলেই একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। এইসব অভিযোগ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এমনকি প্রয়োজনও আর থাকবে না। কেননা মন্দ ব্যবস্থাতেই জনগণকে চোর সাজতে বাধ্য হতে হয়। তাই সরকারকে বাধ্য হয়ে পুলিশ রাখতে হয় এবং অনাবশ্যক খরচ বাড়তে থাকে, যার প্রভাব গ্রাহকের উপর পড়ে। সেইজন্য আসুন আমরা সকলে প্রথমে ব্যবস্থাকেই সঠিক করে নিই। যেখানে সকলের মান একসমান থাকবে। এই পুস্তকে আমি তাই উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা করেছি। এখানে আমি যা কিছু সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছি তা আমার দ্বিতীয় পুস্তক ‘সম্পূর্ণ জীবন দর্শনে’ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ওই পুস্তকে আপনি এই ব্যবস্থা রচনার পেছনের কারণসমূহকে বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারবেন। কিন্তু এই পুস্তকে আমি ব্যবস্থার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থেকেছি।

শাসনের স্বরূপ

এই জগতে শাসনের চার প্রকার রূপ রয়েছে।

১. ব্যক্তিগত
২. বংশগত
৩. দলগত
৪. সমষ্টিগত

ব্যক্তিগত শাসনের অর্থ হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয় তবে ব্যবস্থা কিছুটা ঠিকঠাক চলে, কিন্তু ব্যক্তি যদি অজ্ঞানী হয় তবে ব্যবস্থাকে নরকে পরিণত করে। অতীতে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বেশীরভাগ ব্যক্তিগত ব্যবস্থা থাকত। সর্দার কিছুটা দুর্বল হলেই অন্য কোনো ব্যক্তি এসে তার যায়গায় সর্দার বনে যেত। তখন শারীরিক শক্তিকেই সর্দার হবার যোগ্যতা হিসেবে ধরা হতো। ব্যক্তিগত

শাসনে শিক্ষাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হতো না। যার ফলে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদয় সম্ভব হয়নি। সাধারণ কৃষি ও পশু শিকারের উপরেই সকলের জীবন-জীবিকা নির্ভর করত। সমস্ত সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র বলশক্তি দ্বারা নির্ধারিত হতো। বাজার নামক কোনো ব্যবস্থা ছিল না। জীবন সকল দিক থেকে সুরক্ষাবিহীন অবস্থায় ছিল। তখন জন্মের হার অনেক বেশী হবার পরও জনসংখ্যা কখনো অধিক হতে পারত না। কারণ মৃত্যুর হার অনেক বেশী ছিল। কোনোপ্রকার সামাজিক সুখসুবিধা ছিল না। অর্থাৎ মানুষের জীবন মোটামুটি জংলী পশুদের মতই ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকলে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

বংশগত শাসনে একই পরিবারের সদস্য শাসন করতে থাকে যতক্ষণ না তাকে কেউ বলপূর্বক সরিয়ে না দেয়। পরিণাম এখানে ব্যক্তিগত জীবনের মতই হয়, তবে কিছুটা উদারতার সম্ভাবনা থাকে। কেননা রাজা নিজের ভাবমূর্তি ভাল বানিয়ে রাখতে চায় যেন প্রজা তার বংশধরদের সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। এর থেকে খুব ভিন্ন কিছু হয় না। রাজকার্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের কিছু সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা প্রারম্ভ হয়। যেন রাজকার্য কিছুটা সঠিকভাবে চলতে পারে। রাজ্যের সীমানার ব্যপ্তিও কিছুটা অধিক হয়ে থাকে। যা সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। ছোটখাটো বাজার উৎপন্ন হতে শুরু করে। সাংগঠনিকভাবে কার্য পরিচালনার ফলে কিছুটা উন্নয়নও প্রারম্ভ হয়ে যায়। উন্নয়নকেই বাজার নামে সকলে জানে। মানুষ কিছুটা বৈষয়িক হতে শুরু করে এবং পূর্বের তুলনায় কিছুটা অধিক সুখী হতে শুরু করে। নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত শাসনের তুলনায় বংশগত শাসনে কিছুটা অধিক সুখ থাকে। মানুষের সুরক্ষাও অনেকটা বেড়ে যায় এবং সুখসুবিধাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। জীবন-যাপন কিছুটা প্রকৃতির স্তর থেকে উপরে উঠতে শুরু করে। কিছুটা শিক্ষার প্রসারে মানুষ চিন্তন-মনন করতে শুরু করে। চিন্তন-মনন করার একটি শ্রেণী উৎপন্ন হতেও শুরু করে। এরপর জনগণ গণতান্ত্রিক শাসনের দাবী তুলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে গণতন্ত্রাতিক শাসন ব্যবস্থা আসতে শুরু করে। কিন্তু বাস্তবে তা প্রকৃত গণতান্ত্রিক হয় না। বরং তাকে আমরা দলতান্ত্রিক শাসন বলতে পারি। কেননা এতে প্রকৃত জনতার শাসন না হয়ে দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দলগত শাসনে অনেক দল তৈরি হয়ে যায়। তারা জনগণ দ্বারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে শাসন করতে শুরু করে। কখনো কখনো দলগত শাসনকে গণতান্ত্রিক শাসন বলে ভ্রমও হয়ে যায়। এতে প্রজা হয়ে যায় জনগণ। শাসন বংশগত থেকে বেরিয়ে কোনো একটি দলের অধীন হয়ে যায়। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে দেখলে দলতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও উপরোক্ত দুটি বিষয় লুকিয়ে থাকে।

ব্যবস্থার স্বরূপ

ব্যবস্থা

গোষ্ঠীতন্ত্র	রাজতন্ত্র	দলতন্ত্র	গণতন্ত্র
ব্যক্তি কেন্দ্রীক	পারিবার কেন্দ্রীক	দল কেন্দ্রীক	জনগণ কেন্দ্রীক
এক ব্যক্তি সর্বেসর্বা	এক পরিবার সর্বেসর্বা	এক দল সর্বেসর্বা	সকল জনগণ সর্বেসর্বা
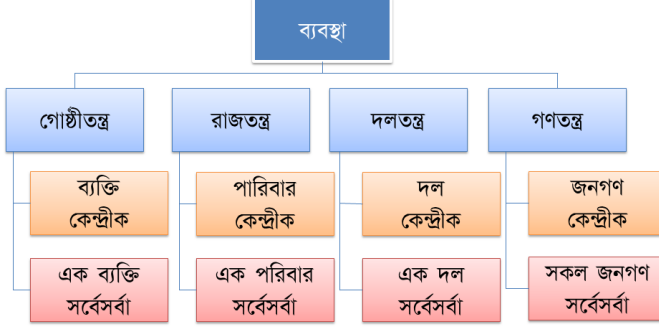
দলতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কোনো একটি মুখ্য দল থাকে এবং তা দলতন্ত্র/বংশগত দু-প্রকারের হতে পারে। দলকে যেহেতু জনগণ নির্বাচন করে সেই কারণে জনগণের বিপরীত কোনো পরিণাম আসে তেমন কার্য দল সরাসরি করে না। কিন্তু বিপক্ষ ও অন্যান্য দল থেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে নিজের দলকে শক্তিশালী এবং অন্য দলকে দুর্বল করার জন্য নৈতিক/অনৈতিক দু-উপায়ই অবলম্বন করে থাকে। যেন অন্য কোনো দল ক্ষমতায় না আসতে পারে। এক দল অন্য দলকে নিচু দেখানোর জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস করতে থাকে। প্রথমদিকে দু-ধরনের শাসন (গোষ্ঠীতন্ত্র, রাজতন্ত্র) থেকে জনতা বিশেষ কিছু সুবিধা পায় না কিন্তু দলতান্ত্রিক শাসনে দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে জনগণের সুখসুবিধাও বাড়তে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ সংশোধন হতে শুরু করে। প্রযুক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উন্নতি হতে শুরু করে। শিক্ষার প্রভাবে মানুষের চিন্তন-মননের ক্ষমতাও বাড়তে শুরু করে। কিছুকাল পর যখন মূল প্রসঙ্গগুলি সামনে চলে আসে তখন দলতান্ত্রিক শাসনের ত্রুটিগুলিও প্রকাশিত হতে থাকে। দেখা যায় সমস্ত দল নিজেদেরকেই শক্তিশালী করার কাজে লিপ্ত থাকে। এর ফলে জনতার সুবিধা তলানিতে নামতে থাকে। একটি সময় আসে যখন দলতান্ত্রিক শাসনের দ্বারা যতটুকু উন্নয়ন হবার তা হয়ে যায়। এরপর আর উন্নয়নের গতি অগ্রসর হতে দেখা যায় না। কেননা যে কোনো শাসনকালে উন্নয়নের একটি সীমা থাকে। সেই পরিধির অধিক বিকাশ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ কোনো কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম এবং হার্ডওয়ার সিস্টেম কতটা সীমা অবধি সফটওয়্যারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবে তার একটি নিজস্ব ক্ষমতা থাকে। এর অধিক ডাটা প্রসেস করতে চাইলে আপনাকে অপারেটিং সিস্টেম এবং হার্ডওয়ার সিস্টেমকে অধিক আপডেট করে নিতে হয়। তবেই আপনি অধিক এবং জটিল কর্ম সরলভাবে সম্পাদন করতে পারবেন। তখন আর পুরনো সিস্টেম দিয়ে কর্ম করা সম্ভব হয় না। একইভাবে শাসন ব্যবস্থাকেও অধিক বিকশিত করতে হয় তবেই আমরা

বৃহৎ স্তরে উন্নয়ন করতে সক্ষম হতে পারব। আমরা তো সকলে অধিক সুখসুবিধাই চাই। যেন অধিক থেকে অধিকতর সুখী হতে পারি। যেমনভাবে অধিক সুবিধাসম্পন্ন নতুন কোনো বস্তু বাজারে আসতেই বিচার বিবেচনা না করে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সাথে সাথে তা কিনে নিই এবং ব্যবহার করে সুখী হই। অন্যকেও বলি সেই বস্তুটি ভাল, আপনিও কিনুন এবং সুবিধা উপভোগ করুন। এইভাবে কেউ যদি আমাদের সুখী এবং সমৃদ্ধশালী শাসন ব্যবস্থা প্রদান করে তাহলে সেই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় কি? সকলেকে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সহযোগিতা করা উচিত নয় কি? বর্তমান সময়ে দলতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং তা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। উন্নয়ন প্রায় রুদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। দেখা যাচ্ছে দলের অধিকাংশ নেতা ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। দলতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এর চাইতে অধিক বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমানে নিশ্চিতভাবেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় এসে গিয়েছে। আমি যে প্রকার ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ করেছি তা নিয়ে আপনারা সকলে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। যদি আপনাদের মনে হয় এই ব্যবস্থা সঠিক তাহলে আপনার ক্ষমতানুযায়ী নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করুন। আমরা সুখী জীবন-যাপনের জন্য যেন অধিক বিলম্ব না করি। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কোনো দল থাকে না। সেখানে সর্বপ্রথমে আপনার যোগ্যতা প্রাধান্য পাবে। এরপর সেই যোগ্যতার আধারে আপনাকে কর্ম সম্পাদন করার সুযোগ দেওয়া হবে। অধিকার সকলের সমান হবে। সেখানে কেউ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না, কেউ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হবে না, কেউ সুযোগ-সুবিধা থাকে বঞ্চিত হবে না, কেউ সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যখন চরম অবস্থায় পৌঁছাবে তখন যার যে বস্তু বা পরিষেবার ইচ্ছে হবে তা সহজেই উপলব্ধ হয়ে যাবে। ফলে দুঃখ নামক শব্দ কেবলমাত্র পুস্তকেই রয়ে যাবে। জীবনে কোনো সংঘর্ষ আর দেখা যাবে না। ৬ থেকে ২০ বছর বয়স অবধি সকল শিশুর জন্য সমান শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার জন্য পূর্ণ শিক্ষা মিলবে। কোনো পরীক্ষায় কাউকেই অনুত্তীর্ণ করা হবে না। সাধারণ প্রণালীতে ভাষা, গণিত, সংজ্ঞান এবং দর্শন– এই চার প্রকার পাঠ্যক্রম থাকবে। শিক্ষা অবশ্যই সকলের জন্য সমান থাকবে। যে শিশু নিজের ব্যক্তিত্বকে যতটা বিকশিত করতে পারবে তাকে তার যোগ্যতা এবং ইচ্ছে অনুযায়ী কোনো একটি কর্ম সম্পাদনের জন্য ৫ বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যখন তারা ২৫ বছরের মধ্যে পূর্ণ শিক্ষিত এবং পূর্ণ প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবে তখন বিদ্যালয়ের অন্তিম দিনেই পছন্দের চাকরি প্রদান করা হবে। যেন পরের দিন থেকেই তারা রোজগারের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। সকল সুখসুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে বিকশিত করা হবে। সকল বিভাগ এমনভাবে বিকশিত হবে যেন ব্যক্তিকে এক

স্থান থেকে অপর স্থানে জীবিকার জন্য ছোটাছুটি করতে না হয়। সকল স্থানেই সমান জীবিকা এবং সমান সুখসুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে একই স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হবে না। সকলে সমুচিতভাবে সকল প্রকার সুযোগসুবিধা এবং সুরক্ষা পেতে থাকবে। এইভাবে জীবনের এমন কোনো দিক অসম্পূর্ণ থাকবে না যার সমাধান হবে না। আমি এইপ্রকার এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই লিখেছি। এরপর অন্য কোনো শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। শাসন ব্যবস্থায় এটি হবে অন্তিম প্রকার ব্যবস্থা। আমার জ্ঞান অনুযায়ী যা কিছু উপরে বর্ণনা করেছি তাতে আপনারা বুঝে গিয়েছেন যে সকলকে সুখী করা কোনো কঠিন কর্ম নয়। এটি কেবলমাত্র নীতি-প্রণালীর ব্যপার। নীতি-প্রণালী যত সঠিক হবে সুখ ততই বাড়তে থাকবে এবং জীবনযাপন সহজ হতে থাকবে। নীতি-প্রণালী যদি পূর্ণরূপে সঠিক হয় তবে পূর্ণ এবং সর্বাধিক সুখ সহজভাবে আসতে থাকবে। সঠিক নীতির ফলে পরিশ্রম কম হতে থাকবে, সবকিছু সহজ হতে থাকবে এবং জ্ঞান-কর্ম-ভোগ অধিক উৎপন্ন হতে থাকবে। এইসকল কারণের ফলে সুখ অধিক থেকে অধিকতর প্রাপ্ত হতে থাকবে। যা সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা এবং আমাদের জীবনেরও পরম উদ্দেশ্য।

***

অধ্যায় ১১

গণতান্ত্রিক শাসনের লাভ

নতুন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সর্বদা জনগণই হবে শক্তির কেন্দ্র এবং নেতৃত্ব সর্বদা যোগ্য নেতৃত্বের হাতে ন্যস্ত থাকবে। কেননা ১০ শতাংশ নাগরিক যদি কোনো নেতার কাজে সন্তুষ্ট না হয় তবে জনগণ সেই নেতাকে পুনরায় নির্বাচনে প্রেরণ করতে পারবে। এই কারণে সকল নেতাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সকল নাগরিক যেন তাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তির সন্তুষ্টিসূচক মাপদণ্ড থাকবে যা সরাসরি জনগণ দ্বারা প্রেরিত হতে থাকবে। এর মাধ্যমে সর্বদাই জানতে পারা যাবে যে এই ব্যবস্থায় কতজন সন্তুষ্ট আর কতজন নয়। প্রথমত— যে কোনো নীতি প্রণয়ন করার সময় নেতাদের মাথায় রাখতে হবে সেই নীতির দ্বারা সকলের যেন লাভ হয়। দ্বিতীয়ত— নেতারা যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসহ সবকিছুর ব্যখ্যা ইন্টারনেটে রাখা থাকবে। ফলে জনগণ যে কোনো সময় ইন্টারনেট থেকে যে কোনো তথ্য দেখতে এবং পড়তে পারবে। তারা বুঝতে পারবে যে কী প্রকার নীতি অথবা সিদ্ধান্ত নেতারা নিয়েছেন এবং কেন নিয়েছেন। তাতে সকলের কী লাভ হবে ইত্যাদি। জনগণের কাছে নেতাদের সকল নীতি এবং সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ থাকবে। সরকার এবং জনগণের মাঝে কোনো প্রাচীর না থাকার কারণে কোনোপ্রকার ভ্রম উৎপন্ন হবে না। সবকিছুই স্বচ্ছ থাকবে। সকল সুখসুবিধা সকলের জন্য একসমান থাকবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট থাকবে। তাই নিজের জন্য অথবা পরিবারের জন্য ভিন্নভাবে কিছু করার প্রয়োজন পড়বে না। দুর্নীতি করার জন্য কেউ বাধ্য হবে না। স্বচ্ছ পরিকাঠামো থাকার ফলে তেমন কিছু করা সম্ভবও হবে না। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় এবং মুখ্য লাভ যেটি হবে তা হল নেতারা কখনোই নিরঙ্কুশ হতে পারবে না। তারা কখনোই নিজেদের দায়িত্বের প্রতি অলসতা এবং উদাসীনতা দেখাতে পারবে না। নতুন ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তিই নিজ কর্মের প্রতি অলসতা দেখাতে পারবে না। যদি এমনটি করার প্রয়াসও করে জনগণ তা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কারভাবে ধরে ফেলবে। কেননা সকলের কাজের তথ্য ইন্টারনেটে রাখা থাকবে যা সকলে দেখতে সর্বদা পারবে। এমনটি নয় যে তার জন্য আর.টি.আই. (R.T.I.– Right to Information) তথ্য গ্রহণের অধিকার) করতে হবে। যে কোনো সময় সকলেই তা ইন্টারনেট থেকে

দেখতে পারবে। নেতা-নেত্রীসহ অন্য সকলকেও তাদের যোগ্যতা ও পছন্দের কর্মই প্রদান করা হবে। যে কারণে সেই কর্ম সম্পাদন করে তারা সুখ অনুভব করবে। এই কারণেই কারোর নিজের কর্ম করতে স্বাভাবিকভাবেই কোনোপ্রকার অলসতা এবং উদাসীনতা আসবে না। কেননা আমরা যে কর্ম করে সুখী হই সেই কর্ম বিনা পারিশ্রমিকে করার জন্যও তৈরি থাকি।

একদিকে পছন্দের কর্ম পাবার কারণে এবং অন্যদিকে সেই কর্ম সম্পর্কিত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ থাকার ফলে উচ্চ গুণসম্পন্ন বস্তু, পরিষেবা এবং সুখসুবিধার নির্মাণ হবে। যা ভোগ করে সকলে সুখী এবং সন্তুষ্ট হবে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী যে ব্যক্তি যেমন জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে গ্রহণ করতে পারবে। এইভাবে আমরা দেখতে পাব যে সকলে নিজেদের পছন্দের জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ প্রাপ্ত করতে থাকবে। ফলে প্রত্যেক স্তরেই সকলে সর্বদা সুখী অবস্থায় থাকবে। কারণ সবকিছুর মান সমান থাকবে। জ্ঞান এবং কর্ম নির্বাচনের সময় আমাদেরকে কেবলমাত্র নিজেদের পছন্দের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমান সময়ের মত ভাবতে হবে না— আমার তো ড্রাইভার হবার ইচ্ছে কিন্তু আজকাল তো অন্য কোনো কাজের তুলনায় ড্রাইভারের বেতন খুবই কম; যদি আমি নিজের পছন্দ অনুযায়ী চলি তবে কম বেতনের জন্য অধিক সুখসুবিধা উপভোগ করতে পারব না। আর যদি অধিক বেতনের কর্ম করার প্রয়াস করি তবে সেই কাজের প্রতি রুচি না থাকার কারণে নিজের সর্বাধিক দক্ষতা প্রদান করতে পারব না। যার ফলে সেখানে কর্মের গুণগত মান ও সফলতা অনিশ্চিত থাকবে। অনেক কষ্ট করে সংরক্ষণের সাহায্য নিয়ে কিছু দূর অবধি সফল হলেও অতঃপর সেই রোজগার দ্বারা প্রসন্ন হতে পারব না। কেননা তাতে আমার রুচি নেই। অন্যমনস্ক হয়ে সেই কর্ম করতে হবে। যার কারণে অন্যকে সন্তুষ্ট করতে পারব না বরং সকলের রোষের মুখে পড়ব। এর থেকে পারিশ্রমিক অধিক পেয়ে যাব এবং অধিক সুখসুবিধাও ভোগ করব কিন্তু জীবনে পূর্ণ সন্তুষ্টি মিলবে না। কেননা কর্মটি আমার রুচি ও পছন্দের হবে না। অধিকাংশ মানুষ অপছন্দের কর্ম করে আসছে বলে তারা আমারই মত উচ্চ গুণসম্পন্ন ভোগের নির্মাণ করতে পারছে না। এই কারণেই মনে হবে আমি উচ্চ বেতন পাওয়া সত্ত্বেও উচ্চগুণসম্পন্ন সুখসুবিধা উপভোগ করতে পারছি না। অর্থাৎ সুখসুবিধার উপকরণও ভেজাল হবে। সকলের বেতন একসমান না হবার কারণে যখন আমি অন্য সহকর্মীদের দেখব, তখন একই কারণে আমি দুঃখ অনুভব করব। কেননা সকলে নিজেদের আশেপাশের মানুষজনকেও সুখী দেখতে চায়। আমার কথার অর্থ এই— যদি কোনো কারণে কিছু লোক অধিক সুখসুবিধা পেয়েও যায় তারপরও এই অসমান অর্থব্যবস্থায় অন্যান্য দুঃখগুলির কোনো সমাধান হবে না। সেইজন্য যতদিন সকলের আর্থিক স্তর সমান না হবে ততদিন সকলের মান সমান হবে না। ততদিন

আমাদের জন্য সকল প্রকার দুঃখের দরজা উন্মুক্তই থাকবে। তিনি ধনী হন বা নির্ধন, ভাল হন বা মন্দ, উঁচু পদে থাকুন বা নিম্ন পদে থাকুন, অথবা বিনা পদে থাকুন না কেন। তাই বর্তমান সময়ের অসমান আর্থিক স্তরের ব্যবস্থায় সকলেই দুঃখী। অর্থাৎ ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয় তবে সকল প্রকার মানুষের দুঃখী হওয়াটা নিশ্চিৎ। একইভাবে যদি ব্যবস্থা সঠিক হয় তবে সকল প্রকার মানুষের সুখী হওয়া নিশ্চিৎ। অতএব সব মিলিয়ে ব্যবস্থাই হচ্ছে আমাদের দুঃখী ও সুখী হবার মূল কারণ। এইজন্য আমাদের সকলের দুঃখের জন্য একে অপরের প্রতি দোষারোপের পরিবর্তে সঠিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা করা উচিত। পছন্দের জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ থাকার কারণে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে সুখী হবে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করার কোনো কারণ থাকবে না। এতে আমাদের সম্পর্ক মধুর থাকবে। পারিবারিক সুখের প্রাপ্তি হতে থাকবে। অপরজনকে অসত্য বলার প্রয়োজন হবে না এবং সকলের সবকিছুতে বিশ্বাস অটুট থাকবে। আমাদের মধ্যে কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপন্ন হবে না, কেননা তা করার কোনো কারণ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

ব্যক্তিগত সুখের প্রাপ্তি

নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, বিশ্রাম ইত্যাদি সকল সুখসুবিধা সর্বদা মিলতে থাকবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সকলে সুরক্ষাও সর্বদা পেতে থাকবে। শিশুরা নিজের মাতা পিতার সাথে থাকুক বা আলাদা স্থানে সরকারের কাছে থাকুক— সকল শিশুর সম্পূর্ণ লালন-পালন, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সরকার নির্বাহ করবে। এই নীতির লাভ এটিই হবে যে সকল শিশুদের জীবনের মাপদন্ড একইরকম হবে। কোনো শিশু নিজেকে অন্য শিশুর তুলনায় মহান বা তুচ্ছ অনুভব করবে না। কেননা সকলের আর্থিক জীবনস্তর সমান থাকবে। ছোটবেলা থেকেই কোনো শিশু নিজেকে অন্য শিশুর সাথে তুলনা করতে পারবে না। এমনকি বড়দের ক্ষেত্রেও অন্যের সাথে তুলনা করার কোনো কারণ থাকবে না। কোনো শিশু সে যে বিষয়ই নির্বাচন করুক না কেন এবং যতই অধ্যয়ন করুক না কেন সমস্ত শ্রেণীতে সকলের মান বরাবর থাকবে। এমনকি মেধার মূল্যায়নও কারোর কম হবে না কারোর অধিকও হবে না। এমনকি সমাজেও সকল বিষয়ের মান একসমান থাকবে। ফলে শিশুদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছে জাগ্রত হবে না। একে অপরের প্রতি বড় বা ছোটো মনোভাব উৎপন্ন হবে না। একে অপরের প্রতি ঈর্ষা উৎপন্ন হবে না, একে অপরের প্রতি শত্রুভাব উৎপন্ন হবে না, অন্যের বস্তু চুরি করার মনোভাব উৎপন্ন হবে না, অনাবশ্যক কিছু সংগ্রহ করার মনোভাব উৎপন্ন হবে না, মাতা-পিতা এবং অন্য কারোর সম্পর্কে হীন ভাবনা অথবা উচ্চ ভাবনা উৎপন্ন হবে না ইত্যাদি

ইত্যাদি। যখন কোনো নেতিবাচক মনোভাব উৎপন্নই হবে না তখন এইসব মনোভাব সম্পর্কিত ভাবনারও উদয় হবে না। এইসব মনোভাব এবং ভাবনা সম্পর্কিত কর্মেরও উদয় হবে না। কেননা নেতিবাচক ভাবনা উৎপন্ন হবার জন্য যেসব কারণগুলি থাকে সেইসব নতুন ব্যবস্থায় উৎপন্নই হবে না। সব মিলিয়ে সকল শিশুদের মধ্যে একে অপরের প্রতি মৈত্রীর মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা বজায় থাকবে। যখন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সমাজে তাদের পেশাদার ব্যক্তির মর্যাদা স্থাপিত হয়ে যাবে। কেননা তাদের যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী একটি জীবিকা তারা পেয়ে যাবে। যার যা জীবিকা হবে সেটিই তার পরিচয় হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কেউ চুল কাটার কর্ম করে তাহলে লোকে তাকে ক্ষৌরকার হিসেবে জানবে এবং যিনি চাষের কর্ম করবে তাকে কৃষক হিসেবে জানবে। এইভাবে সকলের জীবিকাই মূল পরিচয় এই বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া উচিত। কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও সকলের মূল্য একসমানই থাকবে। অর্থাৎ সমস্ত প্রকার জীবিকার মূল্য একসমান হবে। এর অর্থ হচ্ছে পেশা বা পদ যাই হোক না কেন সকলের জীবনস্তর সমান থাকবে। বিভিন্ন পেশার মর্যাদাও একসমান থাকবে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল প্রকার কর্মসংস্থানের মান-মর্যাদাও একসমান থাকবে। যে সকল ব্যক্তি কর্ম করতে অক্ষম তাদের জীবনেও মান-মর্যাদা সমান থাকবে। তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারি যে কারোর উপর ক্রোধ করা, লোভ করা অথবা মোহ করার কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা ক্রোধ তখনই আসে যখন কেউ আমাদের ইচ্ছেপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লোভ তখন উৎপন্ন হয় যখন সময়মত আমাদের ইচ্ছেপূরণ হয় না অথবা ভবিষ্যতের প্রতি নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা তৈরি হয়। এই ভেবে তৈরি হয়— জানি না আমাদের ইচ্ছেপূরণ কবে হবে নাকি আর হবেই না। আর মোহ তখন উৎপন্ন হয় যখন কারোর আশ্রয়ে থাকতে হয় এবং ভাবনা আসে যে আমার পিতা অথবা আমার ভাই অথবা আমার পুত্র অথবা আমার স্বামী বর্তমানে বা বৃদ্ধাবস্থায় আমার সেবা করবে। এই সকল কারণে তাদের প্রতি মোহ উৎপন্ন হয়। নতুন ব্যবস্থায় কেউ কারোর আত্মীয় পরিজনের উপর কোনো ব্যক্তিগত সুখের জন্য আশ্রিত থাকবে না। সময়মত সকলের সমস্ত ইচ্ছেপূরণ হতে থাকবে, কারোর ইচ্ছেপূরণে অন্য কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কেননা এইসবের কোনো কারণই থাকবে না। আমরা এটি নিশ্চয় বুঝতেই পেরেছি।

শুদ্ধ এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন ভোজনের প্রাপ্তি

সুস্থ্য জীবনের জন্য শুদ্ধ এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন ভোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একথা তো আমরা সকলেই জানি। যদি আমরা ক্রমাগত মন্দ ভোজন গ্রহণ করি তবে আমাদের স্বাস্থ্য এবং আয়ু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। এরফলে আমাদের সমস্ত অর্থ এবং সময় কেবলমাত্র অসুখের সাথে লড়াই করতেই খরচ হয়ে যাবে। এরপর শুধুমাত্র মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করতে হবে। একজনের অসুস্থ্য অবস্থা দেখে আশেপাশের সকলেও এই ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকে যে খুব দ্রুত তাদেরও এমনতর মন্দ অবস্থা হতে চলেছে। এইসব বিষয়কে জানার জন্য আমাদের বুঝতে হবে কোন কোন স্তরে ভেজাল বস্তু তৈরি হয় এবং কেন তৈরি হয়? নতুন ব্যবস্থায় কী এমন থাকবে যার ফলে ভেজাল বস্তু তৈরিই হবে না? আসুন তা বুঝে নিই। বর্তমান সময়ের অসমান আর্থিক পরিস্থিতির কারণে অধিকাংশ মানুষকে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকার সন্ধান করে আর্থিক ব্যবস্থা করে নিতে হয়। ফলে সকলের রোজগার একরকম থাকে না। বিশেষ করে তাদের যারা খাদ্য সম্পর্কিত বস্তু নির্মাণ ও বিতরণ করে থাকে। তারা নিজেদের লাভের জন্য খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল মেশাতে থাকে। যা থেকে তারা অধিক অর্থ আয়ের সুযোগ পায়। কারণ তাদেরও তো পরিবার রয়েছে যাদেরকে তাঁরা ভালোভাবে রাখতে চায়। কেননা সকলেই নিজেদের পরিবারকে ভালবাসে। পরিবারের সুখের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অধিক অর্থ সংগ্রহ করার উপায় এটিই যে খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল মেশানো, দুর্নীতি করা এবং কিছু অপরাধমূলক কর্ম করা যা থেকে অধিক অর্থ আসে। উদাহরণ হিসেবে ধরে নিন যারা দুধের কারবার করে তারা যদি সমস্ত দুধ গোরু বা অন্যান্য গবাদি পশুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তাহলে মূল্য অনেকগুণ বেড়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রতিযোগিতার কারণে বাজার থেকে বিশুদ্ধ দুধের উচিত মূল্যও তারা পায় না। যা মূল্য পায় তাতে পরিবার খুব টানাপড়েনের মধ্যে চলে। যখন তারা দেখে অন্য লোকেরা সচ্ছলভাবে জীবন-যাপন করছে তখন তারাও অধিক অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। এই চেষ্টাতেই তারা নকল দুধ তৈরি করে বিক্রয় করে থাকে। অর্থাৎ নিজেদের পরিবারের কিছু সদস্যকে সুখী করার জন্য তারা সমাজের অনেক সদস্যকে দুঃখের দিকে ঠেলে দেয়। নকল দুধ খুব সস্তায় তৈরি হয়ে যায়। ফলে তারা কম সময়ে অধিক অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পেয়ে যায়। একইভাবে আমরা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর অবস্থাটিও বুঝে নিতে পারি।

এমন একটি সময় আসে যখন আমাদের অধিকাংশ খাদ্যবস্তু বিষাক্ত হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে ফেলে। খাদ্য পদার্থের তালিকায় যত প্রকারের ভেজাল রয়েছে সেইসব

কাজে যুক্ত ব্যক্তিরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভেজাল মিশিয়ে থাকে। ফলে খাদ্য সামগ্রী অধিক থেকে অধিকতর বিষাক্ত হতে থাকে। যতদিন অবধি আর্থিক ব্যবস্থা এমন থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে। শুধুমাত্র কড়া নীতিনিয়ম প্রণয়ন করে দিলেই দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না। সরকার সমস্ত খাদ্যবস্তুর জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করে দিলে দুর্নীতি অধিক বাড়বে। কারণ পরিদর্শকের কাজে যুক্ত ব্যক্তিরাও তো মানুষ। তাদেরও পরিবার রয়েছে। তারাও অধিক অর্থ উপার্জন করতে চায়। তারা জানে কেবলমাত্র দুর্নীতি করেই অধিক অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। যত বেশী দুর্নীতি হবে তত বেশী ভেজাল হবে। সুতরাং দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এটি সঠিক উপায় নয়। অর্থাৎ উপদেশ দিয়ে, আইন প্রণয়ন করে অথবা পদাধিকারী নিযুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর কারণ যে ব্যক্তি দুর্নীতি বন্ধ করার দায়িত্বে থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং দুর্নীতি করে সেই পদে নিযুক্ত হন। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি বিধানসভা প্রতিনিধির নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রচারের জন্য নির্বাচন কমিশন ২৮ লক্ষ টাকার পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবার আপনিই বলুন যদি কোনো ব্যক্তি ২৮ লক্ষ টাকার মত বড় অর্থরাশি খরচ করে নির্বাচনে জয়লাভ করে তাও কেবলমাত্র পাঁচ বছরের জন্য, তাহলে সে কেন ১ কোটি টাকার দুর্নীতি করবে না? আর যদি দুর্নীতি না করে তবে তিনি নিজের এবং নিজের পরিবার নিয়ে সুখী জীবন কাটাবেন কীভাবে? পাঁচ বছর পর পুনরায় তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে এবং আবারও যে জয়লাভ করবেন তা সুনিশ্চিত নয়। এইভাবে দুর্নীতি তো নেতাদের থেকেই প্রারম্ভ হয়ে যায়। যাদের উপর দুর্নীতি বন্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তারা দুর্নীতি করার কোনো না কোনো উপায় বের করেই নেয়। সেইজন্য সঠিক ব্যবস্থা ছাড়া কোনো দুর্নীতিবিহীন সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। যে নতুন ব্যবস্থা উপরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে দুর্নীতি করার প্রয়োজন হবে না এবং সেখানে কেউ দুর্নীতি করতেও পারবে না। তা কীভাবে সম্ভব আসুন তা বুঝে নিই। এই নতুন ব্যবস্থায় সকলেই আর্থিক দিক দিয়ে সমান হবে। সকলের চাহিদা অনুযায়ী বস্তু এবং পরিষেবা অর্ডার করার একসমান অধিকার থাকবে। অর্থাৎ যার যা কিছু প্রয়োজন হবে তা অর্ডার করতে পারবে এবং গ্রহণ করতে পারবে। কেননা সরকার প্রতি বছরের প্রথম দিনেই পুরো বছরের অর্থরাশি সকলের একাউন্টে জমা করে দেবে। নতুন ব্যবস্থায় মুদ্রা শুধুমাত্র ডিজিটাল হবে এবং কেবলমাত্র সরকার এই মুদ্রাকে আর্থিক গণনার জন্য ব্যবহার করবে। মানুষ কেবলমাত্র নিজের ব্যাংক একাউন্ট দেখতে পারবে। নতুন ব্যবস্থায় মুদ্রার ব্যবহার কেবলমাত্র আর্থিক গননার জন্যই ব্যবহার হবে এবং তা হবে শুধুমাত্র সরকার দ্বারা পরিচালিত। মানুষ নিজেদের মধ্যে মুদ্রার লেনদেন করতে পারবে না। যার কারণে মুদ্রার জন্য কোনো দুর্নীতি করা সম্ভব হবে না। মুদ্রার জন্য কোনো অপরাধ করাও সম্ভব হবে না। প্রথমত— বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে থাকে সেই কারণটিই আর থাকবে না। অর্থাৎ অপরাধ করার কোনো প্রয়োজনই

হবে না। কারণ যেসব কারণে অপরাধ সংঘটিত হয় সেসবের কোনো কারণ নতুন ব্যবস্থায় উৎপন্নই হবে না। সমস্ত সম্পদ সরকারের অন্তর্গত থাকবে। মানুষ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন এবং পছন্দ অনুযায়ী সবকিছু সমানভাবে ব্যবহার করবে। ব্যবহার করাই তো মুখ্য বিষয়। নতুন ব্যবস্থায় কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোনো সম্পদের মালিক হবে না। কেউ হতেও পারবে না। এমনকি মালিক হবার কারণও থাকবে না। আপনি হয়তো একটি প্রবাদ শুনে থাকবেন ভোগ্য বস্তু, নারী এবং জমির জন্যই সমস্ত বিবাদ ঘটে থাকে। এখানে ভোগ্য বস্তু এবং জমির ক্ষেত্রে তো আপনি বুঝেই গিয়েছেন যে সেখানে সবকিছুই সরকারি হবে। নতুন ব্যবস্থায় ভোগ্য বস্তু এবং জমির জন্য বিবাদ সৃষ্টি হবার কোনোরূপ সম্ভাবনাই থাকবে না। এবার রইল নারী। নতুন ব্যবস্থায় এই সমস্যারও সমস্ত কারণ সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। নারী বলতে বোঝানো হচ্ছে মহিলা জীবন সাথী। নারীর ক্ষেত্রেও বিবাদের সেই একই কারণ তা হচ্ছে মালিকানা-মনোভাব। মালিকানা-মনোভাব এইজন্য উৎপন্ন হয় কারণ বর্তমান ব্যবস্থায় এমনটি করেই আমাদের সুখ সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। বর্তমান ব্যবস্থায় যা কিছুর আপনি মালিক হন তার ভোগ যখন ইচ্ছে তখন পূরণ করে নিতে পারেন এবং কোনোরূপ বাধা ছাড়াই সুখ উপভোগ করে নিতে পারেন। যদিও তা ১০০ শতাংশ সত্য নয়। তাই বর্তমান ব্যবস্থায় মালিক হলে সুখী হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আপনি মালিক নাহলে কোনোকিছু থেকে সুখ পাবেন কিনা তা নিশ্চিত থাকে না। এইজন্য সকলেই মালিক হবার চেষ্টা করে থাকে। তার জন্য যুদ্ধে নামার প্রয়োজন হলেও রাজি। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় আমরা কোনোকিছুর মালিক না হয়েও সমস্ত প্রকার সুখ উপভোগ করতে পারব যা এখন মালিক হয়েও পারছি না। কেননা মালিক হলে তার দেখভাল ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় এইসব সমস্যা উৎপন্নই হবে না। দেখভাল ও নিরাপত্তার তো প্রশ্নই নেই। ভবিষ্যতের জন্য নিরাপত্তাহীনতার ভাবনা থাকবে না। কেননা যখন যা কিছু আপনার প্রয়োজন হবে পেতে থাকবেন। যখন আপনি বারবার এমনটি অনুভব করবেন যে আপনি যখনই কিছু চাইছেন পেয়ে যাচ্ছেন, এতে আপনার মধ্যে সুরক্ষার ভাবনা উৎপন্ন হবে। এরপর আপনি কোনোকিছুই আর সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে রাখতে চাইবেন না। সংগ্রহ করা থেকেই মালিকানার প্রারম্ভ হয়। সংগ্রহ করা এবং মালিক হওয়া একই ব্যাপার, আলাদা কিছু নয়। অর্থাৎ সংগ্রহ করা এবং মালিক হওয়া একসমান। বর্তমান সময়ে মহিলাদের নিয়ে যে বিবাদ তৈরি হয় নতুন ব্যবস্থায় সঠিক শিক্ষা এবং সঠিক পরিবেশের মাধ্যমে তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় নিজেদের সম্বন্ধ নিয়ে যারা একে অপরের মালিক হবার চেষ্টা করে নতুন ব্যবস্থায় তার কোনো প্রয়োজন হবে না। এমনটি কেউ করতে চাইবেও না। কেউ এমনতর চেষ্টা করলেও নিজের আচরণে তা দেখাতে পারবে না। কেননা বাস্তবে এমনটি করা সম্ভব হবে না। এইভাবে মহিলাদের নিয়ে পুরুষের যে মালিক হবার বিবাদ চলতে থাকে তা আর থাকবে না।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অথবা প্রেমের অনুভব থাকবে। স্ত্রী-পুরুষ সকলে আর্থিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হবে। ফলে কেউ আর্থিক কারণে একে অপরের প্রতি মালিকানা মনোভাব দেখাবে না। তখন একে অপরের সাথে থাকার কেবলমাত্র একটিই কারণ থাকবে এবং একটিই প্রয়োজন থাকবে তা হল বাস্তবিক প্রেম। আর এরও কোনো সময়সীমা থাকবে না। যতদিন প্রেম রয়েছে একসাথে থাকবে। যখন প্রেম সমাপ্ত সম্পর্কও সমাপ্ত। সম্পর্ক যখন সমাপ্ত সহাবস্থানও সমাপ্ত। শুধুমাত্র যার সাথে প্রেম অনুভব হবে তার সাথে জীবন কাটাবে। ফলে কোনো সমস্যা ছাড়াই সকলের জীবন সুখপূর্ণভাবে চলতে থাকবে।

সকল প্রকার আবর্জনা থেকে মুক্তি

এখন যেমন হয় সকলে নিজেদের বসবাসের স্থান নিজেরা তৈরি করে নেয়। নিজেরাই একে অপরের সাথে জমি-জায়গা কেনাবেচা করে। কোন স্থানের ক্ষেত্রফল কতটা হবে, সড়ক কতটা চওড়া রাখতে হবে, পার্কের জন্য জায়গা ছাড়তে হবে কিনা, যদি ছাড়তে হয় তবে কতটুকু ছাড়তে হবে, বাড়ি তৈরির জন্য নক্সা কেমন হবে, এমনকি বাড়ি নির্মাণের জন্য কোন মানের দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে মানুষকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এইভাবে আরও অনেক সিদ্ধান্ত মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঠিক করে নেয়। এরপর যেসব জায়গাগুলি পড়ে থাকে সেখানে সড়ক ও পার্কের জন্য যা কিছু সামাজিক সুখসুবিধা তৈরি করা সম্ভব হয় সরকার তার জন্য প্রয়াস করে। সেই সমস্ত যায়গায় মুখ্য সড়ক, গাড়ি রাখার ব্যবস্থা, বাজার এবং অন্যান্য সুখসুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে হয় যা সরকারের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। নতুন ব্যবস্থায় যা হবে বাড়িঘর তৈরির সকল ব্যবস্থা সরকার করবে। বাড়ি তৈরির জন্য কতটা স্থান প্রয়োজন তা সরকার ঠিক করবে। এমনকি সড়ক, পার্ক, পার্কিং, পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, স্টেডিয়াম, সামাজিক স্থান, বাজার, নিকাশি ইত্যাদি সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করবে। বাড়ির নক্সা, বাড়ি তৈরির জন্য যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী এবং তার মান নির্ধারণ ইত্যাদিও সরকার ঠিক করবে। এর ফলে সকল প্রকার সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে এবং পর্যাপ্ত গাছপালা থাকবে। বাড়িঘরের মাঝখান দিয়ে মুখ্য সড়ক থাকবে না ফলে পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হবে। আবাস স্থানের উচ্চতা সঠিক থাকলে নিকাশি ব্যবস্থাও সঠিকভাবে হবে। ফলে কোথাও জল জমবে না, দুর্গন্ধ উৎপন্ন হবে না এবং বায়ু দূষণ হবে না। আবাসন ব্যবস্থার কর্ম সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে গেলে তবেই সরকার মানুষকে সেখানে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ করবে, তার পূর্বে নয়। অনেক সময় কম গুণমানের বিদ্যুতের তার আমরা বাড়িতে

ব্যবহার করি, ফলে আগুন ধরে যাবার বিপদ অনেকগুণ বেড়ে যায়। অনেক সময় আমরা শুনেও থাকি যে শর্ট-সার্কিটের কারণে কোথাও আগুন লেগেছে। এইভাবে অন্যান্য সমস্যাগুলিও মন্দ ব্যবস্থার কারণেই উৎপন্ন হয়ে চলেছে। নতুন ব্যবস্থায় এমন সমস্যা উৎপন্নই হবে না। এই সকল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রচুর সময় ও অর্থ নিরন্তর খরচ হতে থাকে। এই প্রকার অসুবিধা থেকে মুক্তি মিলবে এবং জীবন অধিক সুখময় হবে। কারোর ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা বা পরিশ্রম ছাড়াই এসব কর্ম স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকবে। নিরাপত্তার জন্যও সময় ও অর্থ খরচ করতে হবে না। ফলে বহু সংখ্যায় মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ রক্ষা হবে। ব্যবহারের পর উপকারী যেসব সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে যা মানুষ সাধারণত ফেলে দেয় সরকার সেইসব একত্রিত করবে। তারপর রিসাইকেল সিস্টেমে কম্পোষ্ট সার তৈরি করে চাষের জমিতে ব্যবহার করবে। এইসব বলার তাৎপর্য এই যে সরকারই সমস্ত ব্যবস্থা দেখভাল করবে। জনগণের অথবা ব্যক্তিগত স্তরে কিছু দেখভাল করতে হবে না। সব কাজের জন্য কর্মী সরকার নিযুক্ত করবে। সরকার এমনটি কখনো বলবে না যে শহর পরিষ্কার কর। যে কোনো সমস্যাকে সরকারের সমস্যা বলে ধরা হবে এবং সরকারকেই তার সমাধান করতে হবে। সকলে মিলেই সরকার। সরকারের বাইরে কিছুই থাকবে না।

সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবিক প্রেম থাকবে

উপরে আপনি বুঝে গিয়েছেন যে নতুন ব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের কোনো কারণ উৎপন্নই হবে না। বাধ্য হয়ে সম্পর্কে জড়ানোর মত কোনো কারণ থাকবে না বরং নিজেদের সম্মতিতেই সম্পর্ক তৈরি হবে। বাধ্যবাধকতাবিহীন সম্পর্কের মধ্যেই তো বাস্তবিক প্রেম থাকে, যা কেবলমাত্র পরস্পরের সম্মতির উপর নির্ভরশীল থাকবে। যদি সম্পর্কের বিজ্ঞানকে বুঝতে চাই তাহলে জানা যাবে যে— আমরা নানারকম সম্পর্ক থেকে ভিন্ন-ভিন্ন সুখ পাবার জন্যই সকল প্রকার সম্পর্ক তৈরি করে থাকি। সম্পর্কের সুখ আমরা এমনতর পরিবেশ থেকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারি যেখানে কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতা থাকে না। আমাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র সেইসব সুখ উপভোগের জন্যই তৈরি হোক যার জন্য আমরা সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। উদাহরণ হিসেবে পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে ধরে নেওয়া যাক। এই সম্পর্ক দত্তক নেওয়া পিতা-পুত্র অথবা বাস্তবিক পিতা-পুত্র উভয়ই হতে পারে। পিতা পুত্রের থেকে এবং পুত্র পিতার থেকে পরস্পরের সাথে বসবাসের ফলে যা কিছু সুখ পেয়ে থাকে সেই সুখ সর্বাধিক হয়ে যাবে যদি দুজনেই আর্থিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হয়।

তখনই নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার সুখ উপভোগ করা সম্ভব। যেমন পুত্র পিতার থেকে বাৎসল্য সুখ পেয়ে থাকে। একইভাবে পিতা পুত্রের থেকে শিশুসুলভ ক্রীড়া ইত্যাদির সুখ পেয়ে থাকে। প্রথমত— দুজনেই যেন সমৃদ্ধশালী এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাধীন হয়। সম্পর্কের মধ্যে আর্থিক পরনির্ভরতা যত অধিক হবে ততই সেই সম্পর্ক বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকবে এবং উক্ত সম্পর্ক থেকে সুখের পরিবর্তে দুঃখ অধিক উৎপন্ন হবে। বর্তমানে পিতা পুত্রকে সর্বাধিক ভালবাসা এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করতে সঙ্কোচ বোধ করে, কারণ— যদি তিনি অধিক প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন তবে পুত্র এমন কোনো বস্তু দাবী করে বসতে পারে যা পিতার আর্থিক পরিস্থিতির বাইরে। এমনটি হলে পিতা সঙ্কোচ অনুভব করবেই এবং অধিক ভালবাসা থেকে বিরত থাকবে। যখন পিতা অধিক ভালবাসা দিতে সঙ্কোচ করবে সেখানে পুত্র কীভাবে অধিক প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করবে? দ্বিতীয়ত— পুত্রকে ভালবাসার কারণ হচ্ছে পিতা সর্বদাই পুত্রের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ তৈরির ইচ্ছেয় সেইরূপ শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করতে থাকবে। হতে পারে পুত্রের তাতে রুচি নেই। ফলে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব বাড়বে, সঙ্কোচ তৈরি হবে এবং দুজনে একে অপরের থেকে দূরে থাকতে চাইবে। কখনো অজুহাত দেখাবে, কখনো মিথ্যে বলবে, কখনো একে অপরের প্রতি ক্রোধ উৎপন্ন হবে কেননা পুত্র পিতার ইচ্ছে অনুযায়ী কর্ম করছে না। এইভাবে আমরা যদি সকল সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করি তবে দেখব— পিতার কাছে যদি পর্যাপ্ত অর্থ না থাকে, যদি পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত না থাকে এবং যদি দুজনে একে অপরের কাছে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকে তাহলেও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয় না। সেখানে দূরত্ব যেমন থাকবে তেমনি একটি আলগা মনোভাব তৈরি হবে। ভেতর থেকে দুজন দুজনকে কাছে চাইছে কিন্তু পরিস্থিতি সেখানে দুজনকে বিপরীত দিকে প্রেরিত হতে বাধ্য করে দিচ্ছে। এমনতর সম্পর্ক গভীরে যেতে পারে না। তারা এই সমস্যাকে ব্যক্তও করতে পারবে না। অন্যান্য সকল সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একইভাবে বুঝে নিতে হবে। এইসব অভিজ্ঞতা আমরা নিজেদের জীবনে অনুভব করেই থাকি। যদিও এইসব বিষয় বুঝতে পারাটাও একেবারে কঠিন নয়। নতুন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি যেমন চরম শিখরে থাকবে এবং তেমনি সকলে আর্থিকভাবে স্বতন্ত্রও থাকবে। কোনো প্রকারের পরনির্ভরতা আমাদের জীবনে থাকবে না যার কারণে কোনো দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে। আশ্চর্যের কথা এই যে আর্থিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হোক বা পরতন্ত্র হোক সম্পদ একইরকম খরচ হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সঠিক ব্যবস্থা এলেই এত বড় পার্থক্য আসবে যে 'পরনির্ভরতা' থাকবে না শুধুমাত্র 'স্বাধীনতা' থাকবে। খাবার তো সকলে গ্রহণ করছে তা সে যেভাবেই হোক না কেন, আবার কোনো না কোনো স্থানে তো তারা বসবাস করছেই। সেখানে ঘর থাকুক বা না থাকুক। কাপড়ও পরছে তা সে পুরনো হোক বা ছেঁড়া। মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন কাটাক বা অপরাধের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে জীবন কাটাক, জীবন-যাপন তো তারা

করছে। তাহলে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ ও মানব সম্পদের ব্যবহার তো হয়েই চলেছে। ব্যবহারই নয় অপব্যবহারও হয়ে চলেছে। তাহলে কেন একটি সঠিক ব্যবস্থা স্থাপন করে সবকিছু সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবস্থিত করব না? যেখানে কোনোপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হবে না কেবলমাত্র সুখ উৎপন্ন হবে। যার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ এবং মানব সম্পদের সদুপয়োগ হবে এবং পরিণাম স্বরূপ আসবে কেবলমাত্রই সুখ।

ছোট বড় সকল যুদ্ধের চিরকালীন অবসান

সকল প্রকার দ্বন্দ্ব, বিবাদ, ছোট বড় যুদ্ধ, কলহ, লড়াই ইত্যাদির মূল কারণ এটিই যে সকলে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী জীবন-যাপনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না। বর্তমান ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে সর্বদা সকল বস্তুর অভাবই প্রতীয়মান হচ্ছে। যার কারণে সকলে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করার জন্য নিজের মত করে প্রয়াস করতে থাকে। আগামীকাল পাব কিনা এই ভয়ে সে অধিক সংগ্রহ করে রাখতে চায়। সে পুরো জীবন সংগ্রহ করা সেইসব বস্তুর সুরক্ষা দিতেই কাটিয়ে দেয়। এই জন্যই সমাজে বিভিন্ন বস্তুর অভাব অধিক হতে থাকে। একদিকে মন্দ ব্যবস্থার কারণে সকলের কেনাকাটা করার সামর্থ্য থাকে না, যে কারণে বাজারে চাহিদা এবং বস্তুর নির্মাণ অনেক কম থাকে। এরপর সংগ্রহ করার প্রবণতার জন্য কিছু মানুষ সমস্তকিছু সংগ্রহ করে নেয়। ফলে সকল বস্তুর শুধুমাত্রই অভাব দেখা দেয়। আমরা সকলে জানি যে বিশ্বের ১ শতাংশ লোকের কাছে প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থ রয়েছে। যার কাছে সোজা পথে রোজগারের ব্যবস্থা নেই সে ভাবতে থাকে অর্থ কোথা থেকে আসবে এবং সোজা পথ না পেয়ে একসময় সে অন্য কোনো পথের সন্ধান করতে থাকে। বলার প্রয়োজন নেই যে ওইসব পথগুলি আইনের বিপরীত দিকের হয়। অর্থাৎ অপরাধের পথ। অপরাধ যখন একটি সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তা ছোট বড় যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়। অপরাধ যে স্তরের হয় সেই স্তরের যুদ্ধের জন্ম দেয়। ব্যক্তিগত যুদ্ধ, পারিবারিক যুদ্ধ, সামাজিক যুদ্ধ এবং সমষ্টিগত যুদ্ধ— এই চার স্তরের যুদ্ধ জগতে দেখা যায়। এইভাবে আমরা বুঝে নিতে পারি যে মুখ্য সমস্যা মূলত কোথায় রয়েছে। সেটি হচ্ছে ভুল ব্যবস্থা দ্বারা তৈরি অসমান অর্থশাস্ত্র।

ক্ষতিকারক উৎপাদন সামগ্রী থেকে মুক্তি

বোমা, যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, ভেজাল খাদ্য পদার্থ, ধূমপান সম্পর্কিত উৎপাদন সামগ্রী, নেশা সম্পর্কিত বস্তু ইত্যাদি যা কিছু থেকে সমাজে কোনোপ্রকার দূষণ ছড়ায় সেইসব বস্তু সরকার উৎপাদনই করবে না। এইসবের মধ্যে যেসব বস্তুসামগ্রী সমাজের জন্য জরুরী সেসবের বিতরণ সরকার সামাজিক ক্ষেত্রে করবে। যেন কম উৎপাদন দিয়েই সকলের চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। সেইসব বস্তুর সঠিক বিকল্প হিসেবে সরকার বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমে গবেষণা করাবে, ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং দূষণ কম হবে। অবশিষ্ট দূষণকে সরকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঠিক করে নেবে। কেননা নতুন ব্যবস্থায় সকল প্রকার উৎপাদন সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ সমস্ত প্রকার দূষণ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ফলে দূষণ হয়তো উৎপন্নই হবে না অথবা হলেও ন্যূনতম হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়েও দূষণের উপর সমতা প্রদান করা হবে।

সুস্বাস্থ্য এবং আয়ু বৃদ্ধি

আমরা তো সকলেই জানি ভ্রষ্ট ব্যবস্থায় মানুষ সর্বদা কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। অধিকাংশ মানুষের কাছে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা এতই স্বল্প যে তারা ভালোভাবে জীবন-যাপন করতেই পারে না। খাদ্য সামগ্রী, জল, বায়ু ইত্যাদি দূষিত অবস্থায় থাকে। এমনকি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরী পরিষেবাগুলিও সঠিকভাবে উপলব্ধ থাকে না। শিক্ষাও সকলের জন্য ঠিকঠাক উপলব্ধ থাকে না। ফলে অধিকাংশ মানুষ জানেই না আয়ুর বৃদ্ধি এবং আয়ুর হ্রাস কী কারণে হয়ে থাকে। তাই তারা এইসব দিকে খেয়াল রাখতে পারে না এবং বহু অসুখের সাথে জীবন কাটায়। তৎসহ আয়ুও কমতে থাকে। নতুন ব্যবস্থায় এইসব বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে না। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা উচ্চমানের হবে। বৈজ্ঞানিকরাও আয়ু বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান করবে। নতুন ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না যে আগামীকালের জন্য খাবার কোথা থেকে আসবে, সন্তানদের শিক্ষার বন্দোবস্ত কীভাবে হবে, তাদের লালন পালন কীভাবে হবে, বড় হলে চাকরি হবে কিনা ইত্যাদি। সমস্ত দিক দিয়ে জীবন সুরক্ষিত থাকবে এবং সকল প্রকার সুখ সর্বদা ভরপুর থাকবে। আর্থিক দিক দিয়ে সকলে স্বাধীন হবে। এই প্রকার চিন্তামুক্ত ব্যবস্থায় সকলের সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং জীবনের আয়ু আপনিই বাড়তে থাকবে। ইতিহাস পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে সকল দেশে সুখ প্রদানকারী

ব্যবস্থা অধিক মাত্রায় রয়েছে সেইসব দেশের গড় আয়ু বেড়েছে। সুতরাং আমাদের নতুন ব্যবস্থায় গড় আয়ু দ্রুত বেড়ে যাবে।

মানসিক সুখ প্রাপ্তি

মানসিক সুখ প্রাপ্তির জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের অন্তঃকরণের বিকাশ আবশ্যক। সঠিক শিক্ষা দ্বারা অন্তঃকরণের বিকাশ হয়। অন্তঃকরণ চতুষ্টয়— অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের বিকাশ করতে হয় বা তাদের সংস্কার করতে হয়। শিক্ষার মাধ্যমে অবগত করাতে হয় যে এই জীবন কীসের জন্য এবং কীভাবে জীবনের সেইসব লক্ষ্য পূরণ করে জীবন কাটাতে হয় ইত্যাদি। তার জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন হয়, যার মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে বার্তালাপ করতে পারি এবং সকল শিক্ষাকে সহজেই গ্রহণ করতে পারি। গণিত— যার মাধ্যমে আমরা গণনা করতে পারি এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সংজ্ঞান— যার মাধ্যমে জীবনের জন্য আবশ্যক সকল তথ্য নিজের স্মৃতিতে রাখতে পারি এবং জীবনযাপনের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তা যেন প্রয়োগ করতে পারি। আর জীবন দর্শন— যার মাধ্যমে আমরা জীবনের সারমর্ম এবং দিশানির্দেশজনিত জ্ঞান যেন গ্রহণ করতে পারি। এই প্রকার সঠিক দিশা প্রদানকারী শিক্ষা থেকে আমরা একে অপরের সহযোগিতায় সুখী জীবন-যাপন করতে পারব। তাহলে নিজেদের মধ্যে কোনো অন্তর্বিরোধ উৎপন্ন হবে না, যার ফলে সকলের মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। মানসিক শান্তিতে থিতু হয়ে আমরা সকল প্রকার 'মানসিক সুখ' উৎপন্ন করতে পারব এবং নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী সেই সুখ উপভোগ করে সুখী হতে পারব। এতে আমাদের মন ও বুদ্ধি এক গতিপথে থাকবে। ভাষার মাধ্যমে মনের বিকাশ হয়, গণিতের মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ হয়, সজ্ঞানের মাধ্যমে চিত্তের বিকাশ হয় এবং দর্শনের মাধ্যমে অহংকারের বিকাশ হয়ে থাকে। মানসিক সুখের জন্য মন ও বুদ্ধিই হচ্ছে মুখ্য ভিত। জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগের উপর মন ও বুদ্ধির বিশেষ যোগদান রয়েছে। নিজেদের রুচি অনুযায়ী মানসিক স্তরের ক্রীড়া থেকেও আমরা জ্ঞান, কর্ম, ভোগ, বিশ্রাম ইত্যাদির সুখ গ্রহণ করতে পারব।

ভবিষ্যতের প্রতি সুরক্ষার ভাবনা

বর্তমানে সময়ে আপনি দেখছেন সকল মানুষ ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন রয়েছে এই ভেবে— জানি না আগামীকাল কি হবে। আগামীকালের জন্য সুখ

সুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারব কিনা ইত্যাদি। যাদের কাছে সম্পদ মজুত রয়েছে তারাও ভাবছে কেউ এসে না আবার সব চুরি করে নেয় অথবা ছিনিয়ে না চলে যায়। ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ এই প্রকার বহু দুশ্চিন্তা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভয়ে ভয়ে থাকে। তারা যখন নতুন ব্যবস্থায় কিছুকাল জীবন-যাপন করে অনুভব করবে যে তাদের যখন যা কিছু প্রয়োজন হচ্ছে সহজেই পেয়ে যাচ্ছে তখন ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের প্রতি সুরক্ষার ভাবনা আসতে থাকবে। বলতে গেলে তারা নিশ্চিত হতে থাকবে যে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। যখন যা কিছুর প্রয়োজন হবে তা তো সকলে পেয়েই যাবে। এরপর জীবনে 'হায় হায় কি হবে' এইসব নেতিবাচক ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং মানুষ এক সন্তুষ্টির ভাবনা প্রাপ্ত করবে। সর্বদা তাদের জীবনে ভরপুর সুখ অবস্থান করে থাকবে। কারোর জীবনে কোনোপ্রকার পীড়া থাকবে না। ফলে জীবন শান্তিময় হবে।

আত্মিক সুখের প্রাপ্তি

আত্মিক সুখ প্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের মধ্যে চিত্ত এবং অহংকারের বিশেষ যোগদান থাকে। জীবন সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছে সকলের সমানরূপে থাকে। চারপাশে আমরা সেই জ্ঞানেরই অনুরূপ জীবন অনুভব করি। অর্থাৎ আমরা চারিদিকে যতদূর অবধি দেখতে পাই সকলকে সুখী দেখতে পাই। নিজের সুখী জীবন, আপনজনদের সুখী জীবন, এমনকি আমাদের দৃষ্টি যতদূর অবধি যায় সেই পর্যন্ত যেন সকলে সুখী অনুভব করতে পারে। এতে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য আমাদের ভেতরে এক শান্তি ও সন্তুষ্টির বাতাবরণ উদয় হয়। কোনো প্রকারের দুশ্চিন্তা থাকে না। আমাদের সকল ইচ্ছে সময়মত পূরণ হতে থাকে। ভবিষ্যতের জন্য কোনো সমস্যা আর দেখা দেয় না। এই প্রকার অবস্থার কারণে আমরা নিজেকে আত্মিক দিক দিয়ে তৃপ্ত মনে করি। আপন মনে জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হয়। এমনটি আর মনে হয় না— জগৎ হচ্ছে দুঃখের সাগর। বরং এমন মনে হয় যে এই জগৎ শুধুমাত্র সুখেরই সাগর। মূলত অধিকাংশ মানুষের জীবনে সর্বদা দুঃখ থাকার কারণে তারা জীবন মরণের চক্র থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। যাকে আমরা মোক্ষ বলে জানি তা প্রাপ্তির চেষ্টাই সম্পূর্ণ জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। এমন ভাবনার ফলে জীবনের বাস্তবিক কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে কোনো পাপ করে ফেলেছি অথবা কেউ আমাদের শাস্তি দেবার জন্যই জন্ম দিয়েছেন, সেই সাজা আমরা এই জীবনে পূরণ করে চলেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে চলেছি— হে ঈশ্বর আমাদের এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। এর ভিত্তিতেই আমাদের পূর্বপুরুষরা জগতে সকল দর্শনশাস্ত্র নির্মাণ করেছেন এবং নানা

উপায় খুঁজে বের করেছেন— কীভাবে এই সংসারের চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে ১০টিরও অধিক মুখ্য দর্শনশাস্ত্র প্রচলিত রয়েছে। সেসবে এটিই বলা হয়েছে যে মোক্ষ কীভাবে প্রাপ্তি হবে। সেইসব দর্শনশাস্ত্রগুলি এই প্রকার মুক্তিলাভের আধারেই নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে ৬টির অধিক তো ভারতেই রয়েছে। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে 'স্বর্গ অথবা বৈকুণ্ঠ' নামক কোনো এক স্থানের কথাই বলা হয়েছে। যা এই জগতে নেই কিন্তু অন্য কোথাও রয়েছে। তার বাস্তবিক অবস্থান জানা নেই কিন্তু সমস্ত সুখ, শান্তি এবং আনন্দ সেই স্থানেই রয়েছে। আপনি কেবলমাত্র মৃত্যুর পরেই সেখানে পৌঁছাতে পারবেন। তার পূর্বে নয়। ভয়কে নিয়েও 'নরক' নামের আরেকটি স্থানের কথা বলা আছে যেখানে পৃথিবীর চাইতে অনেক বেশী দুঃখ রয়েছে। সেখানেও আপনি মৃত্যুর পরেই প্রবেশ করতে পারবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই স্বর্গ এই পৃথিবীতে কেন হতে পারে না। অবশ্য এই বিষয়ে দর্শন কিছুই বলে না। জীবনের উদ্দেশ্য কী এই বিষয়েও দর্শন সঠিক কোনো উত্তর দেয় না। মানুষের সমগ্র জীবন অসঙ্গতি এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাপ্ত হয়ে যায়। কোনো সঠিক জ্ঞান সে অর্জন করতে পারে না।

যদি সঠিকভাবে চিন্তা করা যায় তবে বোঝা যাবে যে দর্শন একটিই হওয়া উচিত। ভিন্ন-ভিন্ন দর্শন থাকলে মানুষ সর্বদা সন্দেহের মধ্যে থাকে এই ভেবে কোন দর্শনটি মূলত সঠিক। বহু প্রয়াস করার পরও যখন সে সঠিক দর্শনের খোঁজ পায় না তখন কোনো একটি দর্শনকে নির্বাচন করে বেঁচে থাকার অসফল প্রয়াস করতে থাকে। সঠিক দর্শন দিয়ে এইসব অজ্ঞানের নিবারণ করা সম্ভব। এমনটি হলে মানুষের জীবনে কোনো অসঙ্গতি থাকবে না। মানুষ নিশ্চিতভাবে সুখী এবং সফল জীবন-যাপন করতে পারবে। এমন ব্যবস্থায় মানুষ পূর্ণরূপে সুখ অনুভব করতে পারবে। তখন আমরা নিজেকে ভেতর এবং বাহির উভয় দিক থেকে প্রকৃত অর্থে সুখী অনুভব করব। এই অবস্থাকেই আমরা আত্মিক স্তরের সুখ বলতে পারি। প্রত্যেক স্তরের মানুষ সকল প্রকার জ্ঞান, কর্ম, ভোগ এবং বিশ্রামকে প্রাপ্ত করে নিজেদের সুখী অনুভব করতে পারে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাপ্তি

সমাজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখনই উৎপন্ন হয় যখন জ্ঞান, কর্ম, ভোগ এবং বিশ্রামের অভাব দেখা দেয়। অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম, ভোগ এবং বিশ্রামের যত অভাব হবে তা পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে তত বেশি টক্কর হবে। এই টক্করকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে। এমনতর অবস্থা যখন ঘটে তখন অধিকাংশ মানুষ যারা নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযুক্ত মনে করে

না তারা বলহীন হয়ে চুপচাপ ওই সকল লোকদের কাড়াকাড়ির লড়াইটা দেখতে থাকে। কিছু লোক ক্ষমতানুযায়ী সবকিছু দখল করে বসে। পরিণাম এটিই হয় যে কিছু লোকের কারণে অধিকাংশ মানুষের জীবন দাসত্বে পরিণত হয়। যারা সম্পদ দখল করে বসে পড়ে তারা এদের দাস বানিয়ে ফেলে। এই দাসদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য মূলত খাবারটুকুই প্রদান করা হয়, তার বদলে সব রকম শোষণ করতে থাকে। এমনকি সমস্ত প্রকার পরিষেবাও এদের থেকেই পেয়ে থাকে। শারীরিক, মানসিক, ভাবনাত্মক, আত্মিক— সকল প্রকারের শোষণ চলতে থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ শোষিত হতে বাধ্য থাকে। সমস্ত কর্ম দাস করে দেয় কিন্তু তার ফল গুটিকয়েক লোক ভোগ করে থাকে। একটি কথা আমরা বলতে শুনি— বীর ভোগ্য বসুন্ধরা, যার অর্থ কেবলমাত্র বীরপুরুষরাই দুনিয়ার সবকিছু ভোগ করতে পারে। ভ্রষ্ট ব্যবস্থায় এমনটিই হয়ে থাকে। কখনো সখনো দাসদের মধ্য থেকে কোনো বলশালী মানুষ তৈরি হয়ে যায়। সে তিনি তথাকথিত বীরদের সাথে লড়াই করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করে। কেননা বলশালীদের কাছে নানা রকমের সুরক্ষার সরঞ্জাম থাকে। সেইসব ঠেকানো অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। কখনো কখনো আবার কেউ জিতেও যায়। তার ফলে ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য এসে যায়। নাহলে এই শোষক-শোষিত ব্যবস্থা এমন ভাবেই চলতে থাকে। এইভাবেই সামাজিক জীবন চলতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলের মনোযোগ ওইসব সীমিত সম্পদকে ছিনিয়ে নেবার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। তারা এটি চিন্তা করে না বা বোঝার চেষ্টা করে না যে— আমরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদকে বিকশিত করে নিই এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লড়াই, বিবাদ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে যাই। এর ফলে সম্পদ সর্বদাই সীমিত হতে থাকে, তৎসহ আমাদের জীবনে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও লেগেই থাকে। এইভাবে আমরা না বুঝে পরিস্থিতির বশে একে অপরের জন্য দুঃখ উৎপন্ন করতে থাকি। এটি ততদিন অবধি চলতে থাকে যতদিন অবধি আমাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান কেউ উঠে না আসে। যিনি এই ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তন-মনন করবেন এবং সমাধান বের করবেন। একসময় কেউ না কেউ সমাধান বের করে নেন এবং জনগণের সামনে এসে সেই সমাধানকে ব্যাখ্যা করেন। যদি জনগণ সেই সমাধানকে বুঝে নেয় এবং স্বীকার করে নেয় তবে তা ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে যায়। এভাবেই নিরন্তর ব্যবস্থা তৈরি হতে থাকে এবং সংশোধন হতে থাকে। আর এই সংশোধন ততদিন অবধি চলতে থাকে যতদিন অবধি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের ঘাটতি পূরণ না হয়। নতুন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি খুব সহজেই পূরণ হয়ে যাবে। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের সহযোগিতার উদয় হবে। আরেকটি ভাববার বিষয় এই— যারা সম্পদ দখল করে রয়েছে তারাও সম্পদকে সঠিকভাবে ভোগ করতে পারছে না। এমনকি তাদের জীবনও সর্বদা আতঙ্কের মধ্যে কাটছে। তবে এটি ঠিক যে তাদের জীবন এইসব দাসদের

থেকে অনেকগুণ ভাল। এদের মধ্যেও এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যা আবার দাসদের মধ্যে নেই। তাহলে সব মিলিয়ে বলতে হয় সকলেই দুঃখী এবং অসন্তুষ্ট জীবন কাটাচ্ছে। এবার উপায় একটিই রয়েছে তা হল ব্যবস্থাকে সঠিক করে নেওয়া। অন্যের উপর দোষ চাপানো নয়। দুই পক্ষ একে অপরের প্রতি আরোপ-প্রত্যারোপ করলে কাজের কর্ম কিছু হয় কি? এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। কেবলমাত্র অর্থ, সময় এবং সম্পদেরই অপচয় হয়। আবার অভিযোগ করলেও তো সেই ব্যবস্থাকেই সর্বাগ্রে সঠিক করে নিতে হবে তাই না? ব্যবস্থা সঠিক হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্মই হবে না।

সহযোগিতা স্থাপন

আমরা সকলে পরস্পরকে সহযোগিতা করলে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু, পরিষেবা এবং সমস্ত সুখসুবিধা ইচ্ছানুযায়ী উপলব্ধ হতে থাকবে। নতুন ব্যবস্থাকে বুঝে নিলে এমনটি অনুভবও হবে।

This portal will be available on various digital platforms such as mobile app, web portal etc.

এতে মানুষ সহযোগিতার সুবিধা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার লোকসানকে বুঝতে পারবে। এরপর তারা স্বাভাবিকভাবেই সহযোগিতার প্রতি উৎসুক হবে এবং অগ্রসর হবে। ব্যবস্থাও তাদের সেই দিকেই প্রেরিত করবে। কেননা আমি নতুন ব্যবস্থায় সেইসব কারণগুলিকে নির্মূল করে দিয়েছি যা মানুষকে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে বাধ্য করে। এই ব্যবস্থার কাঠামো আমি এমনভাবে তৈরি করেছি যার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবই হবে

না। সকলে স্বেচ্ছায় কেবলমাত্র সহযোগিতার জন্যই অগ্রসর হবে। এইভাবে সহযোগিতার ভাবনা স্থাপিত হবে যার মাধ্যমে ‘বসুধৈব কুটুম্বকমের’ অভিপ্রায় বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারই আমাদেরে হচ্ছে কুটুম্ব। আমরা সকলে একই বৃক্ষের বিভিন্ন বীজ।

সমস্ত অপরাধের কারণ গোড়া থেকে নির্মূল হবে

সকল অপরাধ সুখসুবিধা অর্জনের জন্যই সংঘটিত হয়ে থাকে। নতুন ব্যবস্থায় তো সকল প্রকার সুখসুবিধা অতি সহজেই সকলের পছন্দ অনুযায়ী প্রাপ্ত হতে থাকবে। ফলে সমাজে সমস্ত অপরাধের অবসান হয়ে যাবে। নতুন ব্যবস্থা এমন করেই তৈরি করা হয়েছে যে কেউ চাইলেও কোনোপ্রকার অপরাধ করতে পারবে না। কারণ এমনটি করে তার অতিরিক্ত কিছুই লাভও হবে না। কেননা সকলে সমস্ত প্রয়োজনীয় লাভ তো আপনা আপনি পেতেই থাকবে। অপরাধ থেকে যখন অতিরিক্ত কিছুই লাভ হবে না বরং ক্ষতিই হবে তখন মানুষ কেন অপরাধ করার কথা ভাববে। মানুষ এখন মিথ্যে এইজন্য বলে কেননা এতে তাৎক্ষণিক বা ভবিষ্যতের জন্য কোনো না কোনো লাভের সম্ভাবনা জড়িয়ে থাকে। কোনোপ্রকার লাভ ছাড়া বড় কোনো অপরাধের সম্ভাবনা কীভাবে উদয় হবে? একইরকমভাবে আমরা বুঝে নিতে পারি যে নতুন ব্যবস্থায় কোনো অপরাধের জন্মই হবে না। সকলে নির্ভয়ে ন্যায়পূর্ণ জীবন-যাপন করবে।

সকল প্রকার নেতিবাচকতার সমাপ্তি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝে গিয়েছি যে সীমিত সম্পদের অসম্পূর্ণ বণ্টনই হচ্ছে আমাদের জীবনের সকল প্রকার নেতিবাচকতার কারণ। সম্পদ বিকশিত না করতে পারার কারণ হচ্ছে আমাদের ভেতরে জ্ঞানের অভাব। আরেকটু খুলে বললে বাইরে একটি কারণ রয়েছে এবং ভেতরে আরেকটি কারণ রয়েছে। আমাদের ভেতরে বোধের অভাব এই যে প্রাকৃতিকভাবে সীমিত সম্পদ রয়েছে— আমরা এই ভাবনাকে মুখ্য কারণ বলে মনে করি। যখন আমাদের ভেতরে বোধ উৎপন্ন হবে যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সেইসব সম্পদগুলিকে ভাল করে ভোগ করতে পারছি না যেসব ইতিমধ্যে আমাদের কাছে রয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়িই হচ্ছে এর কারণ। তাহলে একটি সঠিক ব্যবস্থা তৈরি নেওয়া হোক। প্রথমত— আমাদের কাছে যে সকল সম্পদ রয়েছে তা সমানভাবে বিতরণ করে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত— যে সম্পদ কম

রয়েছে তা ব্যক্তিগত ভোগের বদলে সামাজিক স্তরে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এতে সমস্ত সম্পদ সকলে ভোগ করতে পারবে এবং কখনো অভাব অনুভব হবে না। যেসব সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে সেসবের ব্যবহার সকলে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে করতে পারবে। যেমন যুদ্ধে সকল প্রকার সম্পদ বিনষ্ট হয়ে থাকে। সঠিক ব্যবস্থা এলে আমাদের জীবন থেকে সকল প্রকার নেতিবাচকতা উৎপন্ন হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে এবং একটি ইতিবাচক পরিবেশের উদয় হবে। এক নতুন জীবনের সঞ্চার ঘটবে। বলা যায় এক নতুন যুগের সূত্রপাত হবে। যা সম্ভবত এর পূর্বে কখনো হয়নি।

সকল প্রকার প্রচার থেকে মুক্তি

এই যে টিভিতে আমরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিন্ন-ভিন্ন প্রচার বা বিজ্ঞাপন দেখে থাকি, অথবা পথে পথে হোর্ডিং দেখে থাকি— নতুন ব্যবস্থায় এইসব সমস্যাও থাকবে না। প্রচারের জন্য একটি ওয়েবসাইট থাকবে যেখানে আপনি নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো প্রোডাক্ট অথবা পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। আমি দেখেছি টেলিভিশনে যখন কোনো অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় তখন অনবরত বিজ্ঞাপন আসতে থাকে, এতে আমরা খুবই অসুবিধে অনুভব করি। প্রথমত— আমরা কোনো বিজ্ঞাপন বিরতি ছাড়াই সকল অনুষ্ঠান দেখতে চাই। দ্বিতীয়ত— পথে টাঙানো বিজ্ঞাপন বোর্ডের কারণে বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। কেননা বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ অনেক সময় মানুষের নজর কেড়ে নেয়। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কখনো প্রবল বাতাসের প্রবাহে এইসব হোর্ডিং মানুষের উপর আছড়ে পড়ে। একদিকে প্রাণ অপরদিকে অর্থের হানি হয়। নতুন ব্যবস্থায় কাগজ, রঙ ইত্যাদি বস্তুর বিরাট সাশ্রয় হবে। এইসব হোর্ডিং তৈরি করতে যেসব মেশিন ব্যবহার হয় তারও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। ফলে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ সাশ্রয় হবে। সেসব সম্পদ আমরা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারব। এসব কাজে মানুষের যে শ্রমশক্তি ব্যবহার হয় তা থেকেও মুক্তি মিলবে। ফলে আমাদের কাছে পছন্দসই জীবন-যাপন করার সময় অধিক থাকবে। সকলের গৃহে সর্বাধুনিক এবং বড় মাপের টেলিভিশন থাকবে। আমরা অধিক সুখ উপভোগ করতে পারব কোনো বিজ্ঞাপনের বাধা ছাড়াই।

সত্য, প্রেম, ন্যায় এবং পুণ্যের উদয়

আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে সঠিক ব্যবস্থা থাকলে ব্যক্তি সত্যকে কেন্দ্র করে জীবন-যাপন করবে। পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে ভালবাসবে, সমাজে সকল নাগরিক ন্যায়ের পথে জীবন কাটাবে এবং সমষ্টির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সমতা বজায় থাকবে, বাধ্য হয়ে বা জোরপূর্বক নয়। বাইরে এবং ভেতরে সকল প্রকার শান্তি সর্বদা বজায় থাকবে। জীবনে লড়াই বিবাদের কোনো কারণই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সকলে যখন সমস্ত সুখসুবিধা সমানভাবে পেতে থাকবে তখন সকলের জীবনস্তর একসমান হবে। সকলে যা জানতে চাইবে সহজেই জেনে নিতে পারবে, যা করতে চাইবে করতে পারবে, যা ভোগ করতে চাইবে ভোগ করতে পারবে। পারিবারিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকবে না, সামাজিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকবে না, সমস্যা উদয় হলেও সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। এরপর আর কি নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করব? কীসের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব? কীসের জন্য চুরি বা অপহরণের কথা ভাবব? কারোর নেতিবাচক কারণে অন্যরা কীসের জন্য কষ্ট পাবে? আমি তো এইসবের কোনো কারণ দেখছি না। এরপরও যদি আপনাদের মনে কারণ দেখা দেয় তবে অবশ্যই আমার জ্ঞানবর্ধন করাবেন। আমি এতে অত্যন্ত প্রসন্ন হব। সেই নির্দিষ্ট কারণকে দূর করে এই ব্যবস্থাকে অধিক সুখকর বানানো যাবে।

পারিবারিক সুখ প্রাপ্তি

পরিবারের ভেতরেও সকল বিবাদের মূলে আর্থিক কারণই থাকে। সে দরিদ্র হোক অথবা ধনী হোক। ভবিষ্যতের ভয় নিয়ে দু-পক্ষের মনই এই ভেবে অশান্ত থাকে যে ভবিষ্যতের জন্য কি জানি কতটা অর্থ পর্যাপ্ত থাকবে। সকলে এই দুশ্চিন্তায় নিজ নিজ সম্ভাবনার কথা ভেবে সর্বাধিক অর্থ একত্রিত করে রাখতে চায়। বিষয়টি এমন যে তারা নিশ্চিত হতে পারে না ঠিক কতটা অর্থ নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত হবে। অনবরত তারা অর্থ একত্রিত করেই যায়। এমনটি কখনও চিন্তা করে না যে কবে সেই অর্থ ব্যবহার করবে। নাকি একত্রিত করাটাই শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নতুন ব্যবস্থাকে আমি অনেকটা এইরকমভাবে নির্মাণ করেছি যেখানে অর্থ একত্রিত করার না কোনো কারণ থাকবে, না কেউ একত্রিত করতে পারবে। যেখানে পরিবারের কোনো সদস্যই একে অপরের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকবে না। তারা কেবলমাত্র তখনই একে অপরের সাথে থাকবে যখন তারা অনুভব করবে একে

অপরের সাথে থাকলে সুখ পাওয়া যায়। পরিবার তৈরির পেছনেও একমাত্র কারণ থাকবে 'প্রেম'। যারা একে অপরকে দেখে অনুভব করবে যে, 'একে অপরের সাথে থাকলে সুখী হব তারাই কেবলমাত্র পরিবারের মত বসবাস করবে'। পরে যদি মনে হয় একে অপরের সাথে সুখ অনুভব করছে না তবে তারা স্বেচ্ছায় আলাদা হতে পারবে এবং আরেকটি নতুন পরিবার তৈরির খোঁজ করতে পারবে। এতে সকলের পারিবারিক জীবন সর্বদা সুখী থাকবে। এমনটি তো ভালই, যারা যেমন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্বন্ধ তৈরি করেছে তাদের তেমন কারণেই জন্যই একসাথে বসবাস করা উচিত। তবেই সম্পর্কের সার্থকতা থাকে। যদি সকলের আর্থিক অবস্থা সমান থাকে, সঠিক শিক্ষা থাকে তবেই তো পরিবার সুখে থাকবে। পরিশেষে, প্রেমই পারিবারিক সম্বন্ধের আধার হওয়া উচিত অন্য কিছু নয়।

সামাজিক সুখ প্রাপ্তি

সামাজিকভাবে সকলে সুখী তখনই হবে যখন সকলের আয় সমান হবে এবং সকলের কাছে তাদের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু থাকবে। সকলের কাছে ভরপুর সুখসুবিধা থাকবে এবং সকলে সুরক্ষিত থাকবে। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানও সঠিক পথে চালিত হতে থাকবে। এমন ব্যবস্থায় সুখের নতুন নতুন উপকরণ নিরন্তর উৎপন্ন হতে থাকবে। এর বাইরে অন্য কোনো কারণ অবশিষ্ট থাকে না যাতে সামাজিক স্তরে দুঃখ উৎপন্ন হয়। সমাজের আধার হচ্ছে ন্যায়, যার অর্থ হচ্ছে সকলের সমান অধিকার। অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা এবং ইচ্ছানুযায়ী যা কিছু প্রয়োজন তা মিলতে থাকা। সার্বজনিক সুখসুবিধাও সকলে সর্বদা সমানভাবে পেতে থাকবে। এই প্রকার সমাজে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকে। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলে রাত-দিন যে কোনো সময় নিজেকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত অনুভব করাটাই হচ্ছে কোনো সমাজে সুখের আদর্শ অবস্থা। আমার গবেষণা অনুযায়ী নতুন ব্যবস্থায় এই সুরক্ষিত অবস্থার বিষয়টি অতি শীঘ্রই এসে যাবে। আপনার কি মনে হয়? যদি আপনাদের মধ্যে কারোর সিদ্ধান্ত ভিন্ন হয় তবে তার কারণসহ আমায় অবশ্যই জানান।

সমষ্টিগত সুখ প্রাপ্তি

যদি পৃথিবীতে সবকিছু র মধ্যে সুখ এবং ভারসাম্য থাকে তাহলে বুঝবেন এটি আদর্শ অবস্থা। এই ব্যবস্থায় না কোনো দুঃখ থাকবে— না কোনো দূষণ থাকবে। সকল মানুষ

এবং সকল পশু-পক্ষী সুখী হোক, বৃক্ষ-বনস্পতি চারিদিকে সবুজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, কোনো বস্তু বা পদার্থ দূষিত না হোক— অর্থাৎ জল, বায়ু, খাদ্য ইত্যাদি সবকিছু দূষণমুক্ত হোক তাহলেই বুঝবেন আমরা সকলে সমষ্টিগত দিক থেকে ভরপুর সুখী। সমষ্টিগত সুখের আধার হচ্ছে পুণ্য।

প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের সুনিশ্চিত সদুপয়োগ

মানুষ এমনটি বলে থাকে যে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ হচ্ছে সীমিত। চলুন কিছুক্ষণের জন্য এটি মেনে নিই এবং বোঝার চেষ্টা করি কীভাবে নতুন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের সুনিশ্চিত সদুপয়োগ হবে। কিছু উদাহরণের মাধ্যমে এটি জানার চেষ্টা করি কীভাবে বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের অপপ্রয়োগ হচ্ছে। চলুন একটি সড়কের উদাহরণ নিই। আজকাল সড়ক তৈরি হবার পর খুব বেশী হলে ৬ মাস থেকে ১ বছর অবধি ঠিক থাকে। অর্থাৎ ভেঙ্গে যায়। তারপর ভাঙা সড়কের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলে সেই পথ আরও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় নতুন করে তৈরি করতে হয়। এমনকি যানবাহনের টায়ারও দ্রুত ক্ষয়ে যাবার ফলে ঘনঘন বদলাতে হয়। পথে গর্ত থাকার কারণে যাত্রীগণের সমস্যা তো আলাদা। যানবাহনের ইঞ্জিন এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশও দ্রুত মন্দ হয়ে যায়। যে বাহন ২৫ বছর চলার কথা তা ১০ বছর পর ব্যবহারের উপযোগী থাকে না। এইভাবে প্রতি বছর যানবাহনসহ অন্যান্য সম্পদের অযাচিত ব্যবহার চলতে থাকলে দুদিকেই প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের অধিক ব্যবহার হবে এবং দূষণও অধিক হবে। আমরা যদি একইরকমভাবে নতুন ব্যবস্থায় যানবাহন এবং সড়কের উদাহরণ নিয়েই বোঝার চেষ্টা করি তাহলে পার্থক্য করাটা সহজ হবে। নতুন ব্যবস্থায় সমস্ত গাড়ি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং নতুন অর্থশাস্ত্র সামাজিক লাভের ভিত্তিতেই সমস্ত কার্য পরিচালনা করবে। ফলে উন্নতমানের সড়ক তৈরি হবে। যা এখন বিভিন্ন রকম দুর্নীতির কারণে তৈরি হতে পারে না। প্রথমত— আমার তথ্য যদি সঠিক হয় তবে আমাদের এখন কাছে যতটা আধুনিক কলাকৌশল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে যার মাধ্যমে ২০ বছর অবধি টিকে থাকবে এমন সড়ক নির্মাণ করতে পারি। চলুন এর অর্ধেক ধরে নিই তাহলেও ১০ বছর তো দ্বিতীয়বার সড়ক মেরামতের প্রয়োজন হবে না। এতে ১০ গুণ প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের সাশ্রয় হবে। দ্বিতীয়ত— এতে ১০ গুণ সময় সাশ্রয় হবে, ফলে আমরা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কর্ম করতে পারব অথবা অন্য কোনো সুখ উপভোগ করতে পারব যা সময়ের অভাবে উপভোগ করা হয়ে ওঠেনা। এতে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের সাথে সাথে মানব সম্পদেরও সাশ্রয় হবে। যানবাহনও ২৫ বছর অবধি ভাল থাকবে। সড়ক তৈরি করার মেশিনও অধিক ব্যবহার হবে না। মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিকভাবে সম্পদের অপপ্রয়োগ হবে না। নতুন

ব্যবস্থায় এইভাবে সকল সম্পদের সঠিক ব্যবহার হবে। খাদ্য পদার্থের ক্ষেত্রেও আমরা একইরকমভাবে বুঝে নিয়েছি। বর্তমান ব্যবস্থায় কোন খাদ্য পদার্থের কতটা চাহদা রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কতটা চাহিদা হতে পারে সে সম্পর্কে সরকারের কাছে সঠিক তথ্য থাকে না।

বর্তমানে কৃষক বন্ধুরা একপ্রকার অনুমান করে ফসল চাষ করে এবং উৎপাদন হয়ে গেলে বুঝতে পারে কিছু ফসল অধিক উৎপন্ন হয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারে ফসল চাহিদার তুলনায় অধিক হবার কারণে সঠিক মূল্য পাওয়া যাবে না। তখন কৃষক বন্ধুরা তাদের প্রিয় ফসল বাজারে এবং সড়কে ফেলে চলে যায়। এতে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ এবং মানব সম্পদের শুধুমাত্র অপপ্রয়োগই হয়ে চলেছে। এর ফলে যেসব দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে তার কথা আলাদা। এবার এই সমস্যাটিকে নতুন ব্যবস্থায় বোঝার চেষ্টা করি। নতুন ব্যবস্থায় চাহিদার দিকটি মুক্ত থাকবে। চাহিদার পরিমাণ পূর্ব হতেই জানা যাবে। এরপর সরকারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের জানিয়ে দেওয়া হবে কোথায় কোন ফসল কতটা পরিমাণে উৎপন্ন করতে হবে। এতে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন হবার কারণে এবং সম্পূর্ণ কার্য সরকার দ্বারা পরিদর্শকের কারণে কোনো ফসল অধিক উৎপন্ন হবে না অথবা কমও উৎপন্ন হবে না। ব্যক্তিগত হানির সম্ভাবনা তো থাকবেই না। প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ এবং মানব সম্পদের অপপ্রয়োগও হবে না, বস্তুর মানও বজায় থাকবে। এইরকমভাবে অন্য সব প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও বুঝে নিতে পারি যেখানে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ এবং মানব সম্পদের অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। শুধুই অপচয় হতে থাকলে প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ সীমিত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। অপরদিকে মানব সম্পদেরও অনাবশ্যক অপপ্রয়োগ হতে থাকে। প্রাকৃতিকভাবে সম্পদ সীমিত— এই সমস্যাটি নতুন ব্যবস্থায় থাকবে না এবং থাকলেও খুবই ন্যূনতম থাকবে। তাহলে উপরের চিন্তন-মনন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নতুন ব্যবস্থায় সবকিছু ঘনিষ্টভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকবে। একটি মন্দ হয়ে গেলে অন্যটিও মন্দ হয়ে যায়। সেইজন্য আমাদের সবকিছুই সঠিক অবস্থায় রাখতে হবে। এমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যেন মন্দ হবার কারণই না থাকে অথবা মন্দ কিছু উৎপন্ন হতেই না পারে। সর্বদা কারণের উপর কার্য করা উচিত, প্রভাবের উপর নয়। এই বিষয় নিয়ে অমূলক কিছু বলে থাকলে আমার সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনাদের সকলকে আগাম স্বাগত। আমার কোনো কথায় কেউ যদি আঘাত পেয়ে থাকেন তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। মন্দ ব্যবস্থায় যতই না সঠিক বলার চেষ্টা করা হয় তাতে কোনো না কোনো উপায়ে আঘাত লেগেই যায়। এটিকে মন্দ ব্যবস্থার নেতিবাচক ফল বলা যায়। কাউকে আঘাত করা আমার অভিপ্রায় নয়। সকলে কীভাবে সর্বদা সুখী থাকবে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই আমি প্রয়াস করে চলেছি। যদি কারোর মনে হয় তার কাছে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত করবার এর থেকেও ভাল কিছু আছে যাতে মানুষ অধিক সুখী হতে পারে তবে

আমার প্রার্থনা এই— আপনি আমার কাছে আসুন। এই পুস্তককে অধিক উৎকৃষ্ট করতে আমায় সহযোগিতা করুন। আপনাকে বক্তব্য পরিবেশনের পুরো সুযোগ প্রদান করা হবে। আরও ভাল হবে যদি আপনি তার একটি খসড়া বানিয়ে নিয়ে আসেন। এতে আপনার কথা সহজেই বুঝতে পারব এবং আপনিও সহজে বুঝে নিতে পারবেন।

আপনার জন্য অন্তর থেকে ধন্যবাদ রইল।

***

অধ্যায় ১২

মনুষ্যের বর্গীকরণ

সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করে সেই ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের চার প্রকারে শ্রেণীবিভক্ত করা যেতে পারে। এদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নিম্নে বর্ণনা করেছি। আমি এই কারণে মনুষ্যের বর্গীকরণ করেছি যেন নিজেদের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ক আরও সহজ ও সরল হয়। এটি অধ্যয়ন করে অতি সহজেই জেনে যাবেন যে আপনি কোন প্রকারের মানুষ এবং অন্য মানুষের সাথে আপনার কি প্রকারের ব্যবহার করা উচিত। যা বুঝে নিলে আপনার এবং অপরের মধ্যে সর্বাধিক সুখ অবস্থান করবে। আসুন তা জানার চেষ্টা করি। এই বিষয়টি বুঝে নেওয়া অত্যন্ত্য জরুরী কারণ এটির প্রয়োজন রয়েছে। মানব সমাজে কর্মের নির্ধারণ এবং সেইসব কর্ম থেকে উৎপন্ন ভোগ বিতরণের জন্য মানুষের প্রকারভেদ করা পরম আবশ্যক। কেননা সকল মানুষ প্রাকৃতিকভাবে এবং সাংস্কৃতিক প্রভেদের কারণে ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের জন্য একপ্রকার বিশেষ যোগ্যতা, ক্ষমতা, কুশলতা এবং পছন্দের প্রয়োজন হয়। যেন সেইসব কর্মকে সমাজের জন্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং ত্রুটির সম্ভাবনাও যেন ন্যূনতম থাকে। মানুষ মুখ্যত চার প্রকারের হয়। এমনকি চার প্রকারের যোগ্যতাগুলিও ক্রমানুযায়ী হয়ে থাকে। এই যোগ্যতাগুলি হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, ভাবনাত্মক এবং চেতনাত্মক ক্ষমতা। মানব সমাজ তা থেকে চার প্রকারের শক্তি প্রাপ্ত করে থাকে— ক্রিয়াশক্তি, বিচারশক্তি, ভাবনাশক্তি এবং চিত্তশক্তি। এই চার প্রকার শক্তির বিশেষ গুণাবলী রয়েছে— বল, বানী, সংবেদনা এবং বিবেক। কর্মের জন্য এদের চার প্রকারের সামর্থ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। ফলে সমাজে চার প্রকারের কর্ম সম্পাদিত হয়। যেমন— কৃষি, উৎপাদনশিল্প, প্রশাসন এবং নেতৃত্ব। বল থেকে কৃষি, বানী থেকে উৎপাদনশিল্প, সংবেদনা থেকে প্রশাসনিক পরিষেবা এবং বিবেক থেকে নেতৃত্ব। চার প্রকারের ক্ষমতার মাধ্যমে চার প্রকারের কর্ম সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে সমাজ পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত করতে পারে। চার প্রকারের যোগ্যতায় প্রবেশাধিকারের ক্ষমতা সকল মনুষ্যের মধ্যেই থাকে। জন্মের সময় কেবলমাত্র শরীরী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ শরীরের জন্ম হয়। কিন্তু যে কোনো মানুষ নিজের রুচি অনুযায়ী এবং নিজের প্রয়াস দ্বারা যে কোনো যোগ্যতা প্রাপ্ত করতে পারে।

শরীরী অবস্থা থেকে মনের অবস্থা, মনের অবস্থা থেকে ভাবনা অবস্থা এবং ভাবনা অবস্থা থেকে চেতনা অবস্থায় প্রবেশ সম্ভব। সমস্ত যোগ্যতার মান এবং মূল্য সমান হবে। শারীরিক বিকাশ হলে বল প্রাপ্ত হয়। মনের বিকাশ হলে বানী প্রাপ্ত হয়। ভাবনার বিকাশ হলে সংবেদনা প্রাপ্ত হয় এবং চেতনার বিকাশ হলে বিবেক প্রাপ্ত হয়। এর অর্থ এই নয় যে এসবের মধ্যে কোনোটি ছোট রয়েছে অথবা কোনোটি বড় রয়েছে। সকল স্তরের সুখ প্রাপ্তির জন্য সকল স্তরের কর্ম সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। এর জন্য সকল স্তরের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। এর তাৎপর্য এই যে সকলের কোনো না কোনো কর্মের যোগ্যতা থাকা উচিত। তবেই সকলে একে অপরের সহায়তায় সকল প্রকারের ভোগ নির্মাণ করতে পারবে। এর ফলে না কেউ মহান হবে, না কেউ তুচ্ছ হবে। সমাজে যেন সকল প্রকার সুখ উৎপন্ন হতে পারে সেই প্রয়োজনে মনুষ্যের এই বর্গীকরণ। অন্য কোনো অর্থ ভাবা উচিত নয়। এই জগতে প্রতিটি মানুষ আপন বৈশিষ্টে অদ্বিতীয়। একজনের সাথে অপর মানুষের তুলনা করার কোনো অর্থ নেই। উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি একজন দোকানদার এবং একজন গ্রাহককে ধরে নিই এই ভেবে যে এদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার কখন সুখদায়ি হবে? তখনই হবে যখন এদের বর্গীকরণ হবে অর্থাৎ সকলের একটি পরিচয় হবে। যখন কোনো বর্গীকরণ হবে না তখন কোনো পরিচয়ও থাকবে না। বর্গীকরণ বা পরিচয় ছাড়া কে কোন জিনিস বিক্রি করবে এবং কে কোন জিনিস কিনবে তা জানতে পারা যাবে না। যখন পরস্পরের কাছে কোনো পরিচয় থাকবে না তখন আমাদের কতই না সময় একে অপরকে খোঁজার জন্য ব্যয় হয়ে যাবে এবং প্রতিবার খুঁজতে হবে। কিছু মানুষ যখন তার আশেপাশে থাকবে এবং দোকানদার হিসেবে জানবে তখনই তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। খোঁজার জন্য তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে লোকজন যেন বলতে পারে— হ্যাঁ এখানে একজন বিক্রেতা থাকে। বিক্রেতাও তখনই বিক্রি করতে পারবে যখন সে অন্য স্থান থেকে প্রথমে কিছু কিনে আনবে। তাহলে সব মিলিয়ে যদি আপনি লক্ষ্য করেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন যে একটি পরিচয় ছাড়া সঠিক ব্যবহার করা শুধুমাত্র কঠিন নয় অসম্ভবও বটে। এবার দ্বিতীয় উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। ধরুন যদি জানা না থাকে আমাদের সমাজে ডাক্তারবাবু মূলত কে। ভাবুন একজন রোগীর কতই না অসুবিধে হবে। একে তো সে অসুখের কারণে কষ্টে রয়েছে, অপরদিকে এই অবস্থায় যদি খুঁজে বেড়াতে হয় যে ডাক্তারবাবুকে কোথায় থাকেন তবে তো ভীষণ অসুবিধে হবে। সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে মানুষের বর্গীকরণ কোন প্রয়োজনে করা হচ্ছে। এই ধরণের বর্গীকরণের যে প্রয়োজন রয়েছে তা বুঝে নেওয়া উচিত। এটিকে অন্য কোনো অর্থে ধরা উচিত নয়। এইসব বিষয় বোঝার জন্যই তো শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজন। যেন সকলে সঠিকভাবে একটি কথার সমান অর্থ বুঝতে পারে— নিজের মত করে নয়। তাহলে এখন আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে

নতুন ব্যবস্থায় আমি কেন মানুষের বর্গীকরণ করেছি। এটি নিজেদের সকল প্রকার ব্যবহারকে পূর্ণরূপে স্পষ্ট এবং সহজ করে দেয়। আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য রয়েছে তা অর্জন করতে সহজ করে তোলে। এর অর্থ কাউকে মহান অথবা কাউকে তুচ্ছ বানানো নয়। এখানে কেউ তুচ্ছও নয় মহানও নয়। সকলে যখন একই তত্ত্ব থেকে অনেক হয়েছে তবে তো সকলে সমান তাই না? আপনার নিজের ভেতর দেখলে কি মনে হয় আপনার মধ্যে কোনোকিছুর অভাব রয়েছে? অথবা অন্য কারোর ভেতর কিছু অধিক রয়েছে? অথবা আমার কাছে কি অন্যের চাইতে অধিক কিছু রয়েছে? তা কিন্তু নয়। সকলের আমি এক সমান। তবে একথা সত্য আমরা একসমান হয়েও বিভিন্নতা রেখেছি। যেমন আমাদের পছন্দ-অপছন্দ ভিন্ন, গঠন ভিন্ন, নাম ভিন্ন, কর্মের রুচি ভিন্ন– এমনকি সমাজের মধ্যে আমাদের উপযোগিতাও ভিন্ন-ভিন্ন। আপনাদের বুঝতে হবে যে এই বিভিন্নতার প্রয়োজনও রয়েছে। আমাদের মধ্যে যদি বিভিন্নতা না থাকতো তাহলে আমরা বিভিন্ন প্রকার বস্তু অথবা পরিষেবা তৈরি করতে পারতাম না এবং সেসব ভোগ করতে পারতাম না। এমনকি বিভিন্নভাবে সুখীও হতে পারতাম না। আমাদের বিভিন্নতার কারণে নানা প্রকার সুখসুবিধার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যা আমাদের সুখকে বহুগুন বাড়িয়ে দেয়। তাহলে বিভিন্নতা নিতান্তই ভালো বিষয় মন্দ কিছু নয়। এবার আমরা স্পষ্টভাবে বুঝে গিয়েছি যে মনুষ্যের বর্গীকরণের প্রয়োজনীয়তা মূলত কোথায় রয়েছে। সমাজের সুখসুবিধার ভিত্তিতে আমি মনুষ্যকে চার ভাগে বিভাজিত করেছি। সাধারণত সমাজে আমরা চার প্রকারের মানুষ দেখে থাকি। আমি নিম্নে তাদেরকে শব্দের মাধ্যমে ব্যখ্যা করেছি।

১. শারীরিক স্তরের মনুষ্য (Physical Quotient– PQ)
২. মানসিক স্তরের মনুষ্য (Intelligence Quotient– IQ)
৩. ভাবনাত্মক স্তরের মনুষ্য (Emotional Quotient– EQ)
৪. চেতনাত্মক স্তরের মনুষ্য (Consciousness Quotient– CQ)

শারীরিক স্তর

শারীরিক স্তরের ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্তির পরও মানসিক স্তরের বিকাশ নিম্ন স্তরেই থাকে। অর্থাৎ শিক্ষায় রুচি কম থাকে। তাদের শারীরিক বিকাশই শুধুমাত্র সঠিকভাবে হয়ে থাকে যা মুলত আহার বিহারের মাধ্যমেই পূরণ হয়ে যায়। এইসব ব্যক্তিরা কেবলমাত্র শারীরিক শ্রম সম্পর্কিত কর্মই করতে পারে। যেমন কৃষিক্ষেত্রের অন্তর্গত কর্ম। তাদের

ইচ্ছেও মুলত খাবার, নিদ্রা ইত্যাদি নির্ভর হয়ে থাকে। শারীরিক মনোরঞ্জন এবং শারীরিক প্রয়োজন মেটানোই এদের মূল ইচ্ছে হয়ে থাকে। এদের খাবার দাবারও অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। চাট, পকোড়া, ভাজাভুজি বা হাল্কা খাবারে এদের বিশেষ রুচি থাকে না। শারীরিক স্তরের ব্যক্তিরা কেবলমাত্র নিজের জন্যই বাঁচে। এদের বিয়েও মূলত পিতা-মাতার ইচ্ছেতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। পরিবার সম্বন্ধে গভীর অর্থ এরা জানে না। এরা খুব সাদা সিধে হয় এবং এদের ব্যবহারও খুব সাধারণ হয়ে থাকে। এদের দেখে মনে হবে যেন এরা সংসার থেকে সন্যাস নিয়ে নিয়েছে। না এরা অধিক বিষয়ভোগী হয়, না বাকপটু হয়, না এদের বিশেষ কোনো বন্ধুবান্ধব আপনি দেখতে পাবেন। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কের প্রতি এদের বিশেষ রুচি থাকে না। এদের দেখে এমন মনে হবে যেন কোনোপ্রকার মোহ নেই, কোনোপ্রকার বাসনা নেই। বাইরে থেকে মনে হবে এদের সাথে যেন অন্য কারোর কোনোপ্রকার লেনদেন নেই। এরা শান্তভাবে শুধুমাত্র নিজের নির্দিষ্ট কর্ম করতে থাকে এবং শারীরিক মনোরঞ্জন অবধিই সীমিত থাকে। এই স্তরের ব্যক্তিরা ৬ ঘণ্টা অবধি অবিরত কর্ম করতে পারে। এর অতিরিক্ত হলে অসুবিধে অনুভব করে থাকে।

মানসিক স্তর

এই স্তরের ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্তির পর মানসিক স্তরের বিকাশ ঘটে। এরা কেবলমাত্র উৎপাদনশিল্প সম্পর্কিত কর্ম করতে পছন্দ করে এবং এই প্রকার কর্মেরই তারা যোগ্য হয়। এদের বানী'র বিকাশ হয়ে থাকে, ফলে এরা কল্পনাপ্রবণ হয়। এরা যে কোনো বস্তুর আকার প্রকারের সঠিক কল্পনা করে নিতে পারে। এইজন্য এরা বিভিন্ন প্রকারের বস্তু তৈরি করতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকলার বিকাশ ঘটে থাকে। যদিও তা গভীর অবধি পৌঁছায় না। এরা বিভিন্ন প্রকার ভোজন পছন্দ করে। নানারকম কাপড় পরিধান করে। এটিরও খেয়াল রাখে যেন নিজেকে এবং অপরকে সুন্দর দেখায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে ভোগ বিলাসকে নেতিবাচক বা ভুল ভাবা উচিত নয়। কেননা ভোগ বিলাশের জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করার পরই পরবর্তী স্তরের বিকাশ সম্ভব হয়। ভোগ্য বস্তুকে উপভোগ করার পরই তার ভেতর সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটে। সংবেদনশীলতা বিকাশের কারণে সে অন্যের সুখ-দুঃখকে গভীরভাবে বুঝতে পারে। অন্যকে নিয়ে ভাবতে পারে, অন্যের জন্য বাঁচতে পারে। মানসিক স্তরের ব্যক্তিরা পরিবারের জন্যই বাঁচে। কোনো একটি ভোগ থেকে দ্রুত মন ভরে গেলে অন্য কোনো ভোগের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকর্ষণ চলে আসে। এই জগৎ সংসারও পরিবর্তনশীল নিয়মের কারণেই এক থেকে বহুত্বে রূপান্তরিত হতে সক্ষম

হয়েছে। এই নিয়মের কারণেই সংসার স্থির রয়েছে। এই নিয়ম সরিয়ে দিলে সমস্ত জগত-সংসার সমাপ্ত হয়ে যাবে। একইভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ও সেই একই পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে তৈরি হয়েছে এবং স্থির রয়েছে। এই নিয়মের কারণেই পছন্দ অনুযায়ী ভোগের পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং মানুষ এক ভোগ থেকে অন্য ভোগে যাওয়া-আসা করে। কেউ যদি হঠকারী হয়ে কোনো একটি ভোগের সাথে দীর্ঘ সময় অবধি থাকার চেষ্টা করে তবে কিছু সময়ের মধ্যেই উক্ত বিষয় সম্পর্কিত ইন্দ্রিয় ওই ভোগের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। যার কারণে সেই ইন্দ্রিয়ের ওই প্রকার ভোগ থেকে সুখ উপভোগ করার ক্ষমতা কমে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে সমস্ত জীবন সুখী থাকতে চাইলে আমাদের একে অপরকে স্বাধীনতা দিতেই হবে। তাই ভোগ-বিলাসকে নেতিবাচকভাবে দেখা বন্ধ করতে হবে। তা না হলে আমরা একে অপরকে দুঃখী করে তুলব এবং নিজেরাও দুঃখী হব। অবশিষ্ট সব ভোগের প্রতিও এমনটি ভাবা উচিত। মানসিক স্তরের ব্যক্তিরা নিজ স্বভাবেই ভোগ বিলাসী হয়ে থাকে। ভোগের প্রতি এদের প্রবল আকর্ষণ থাকে। যার ফলে ভোগের জন্য এরা যা খুশি করে ফেলে। এদের জীবন হয় পারিবারিক স্তরের। অর্থাৎ পরিবারের অন্য সদস্যদের সুখ-দুঃখের কারণে এরা নিজেরাও সুখী-দুঃখী হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে এদের সংবেদনশীলতা পরিবারের সদস্য অবধিই সীমিত থাকে। মনোরঞ্জনই হচ্ছে এদের প্রিয় ইচ্ছে। এরা ১২ ঘণ্টা অবধি অবিরত কর্ম করতে পারে। এর অতিরিক্ত হলে এদের অসুবিধে হয়।

ভাবনাত্মক স্তর

এই স্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রাপ্তির পর মানসিক স্তরের সাথে সাথে ভাবনারও বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ ভাবের সাথে সম্বন্ধ তৈরি হয়। এরা সাহসী হন। বদনাম এবং মৃত্যুর মধ্যে যদি কোনো একটিকে নির্বাচন করতে হয় তবে এরা মৃত্যুকেই নির্বাচন করে। এরা জেনে বুঝে এমন কর্ম কখনও করে না যা বদনামের কারণ হয়। এরা না জেনে ভুল করতে পারে জেনে কখনও নয়। এরা নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং অনুশোচনাও করে আনন্দের সাথে। এরা যে প্রকার চরিত্র ধারণ করে তাকে পূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করে। পূর্বের দুটি স্তরের ব্যক্তিদের কাছে চরিত্র থাকে না। চরিত্র কেবলমাত্র ভাবনা স্তর থেকেই প্রারম্ভ হয়। এখানে চরিত্রের তাৎপর্য হচ্ছে যেসব মানুষ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক লাভ-ক্ষতির জন্য নৈতিকতা বিসর্জন দেয় না। পূর্বের দুই প্রকার ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে জীবন-যাপন করে। পরের দু-প্রকার মানুষ পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির আধারে নয় বরং সমাজ এবং

সমষ্টির লাভ-ক্ষতির আধারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেইজন্য এরা যা বলে মৃত্যু অবধি তাই করে যায়। যে শপথ গ্রহণ করে তা স্বপ্নেও লঙ্ঘন করে না। ভাবনাপ্রবণ হবার কারণে এরা একে অপরের সুখ-দুঃখ ঠিকমত বুঝতে পারে। অন্যের দুঃখ এরা সহ্য করতে পারে না। অন্যের দুঃখ দূর করার জন্য এরা সবকিছু করার জন্য তৎপর থাকে। এরা অত্যন্ত সংবেদনশীল হয় এবং যে কোনো কথায় অনড় থাকার ক্ষমতা রাখে। এরা প্রশাসন সম্পর্কিত কর্মই করতে চায় এবং তার যোগ্যতাও রাখে। এদের ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি মানসিক অবস্থার মানুষদের তুলনায় কিছু কম মাত্রায় থাকে। এরা তখনই সুখে থাকতে পারে যখন তাদের নিজ অঞ্চলের মানুষ সুখে জীবন-যাপন করে। এমন প্রকারের ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করা উচিত। এরা দুর্নীতিপরায়ণ হয় না, কেননা এতে বদনাম হয়। আর এটি সকলেই জানে যে দুর্নীতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে সকলের সুখ সমাপ্ত হয়ে যায়, যা এরা কখনই চায় না। এরা সমাজের জন্যই বাঁচে। এরা সামাজিক সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। স্বভাবে এরা সমাজপ্রেমী হয়। এরা সমাজের জন্য জীবন কাটাতে অধিক সুখ অনুভব করে। অনুশাসন এদের প্রিয়। এরা আত্মিক স্তরের মানুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়, অতঃপর তাদের শাসন স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়। শাসন বলতে সমাজের নিয়ম নীতিকেই বোঝায়। ভাবরঞ্জন এদের প্রিয় হয়ে থাকে। এরা ১৮ ঘণ্টা অবধি অবিরত কর্ম করতে পারে। তার চেয়ে অতিরিক্ত হলে অসুবিধে অনুভব করে।

চেতনাত্মক স্তর

এই স্তরের মানুষের সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্তির পর মানসিক স্তর এবং ভাবনাত্মক স্তরের সাথে আত্মিক স্তরেরও বিকাশ ঘটে থাকে। এমন ব্যক্তিরা ঠিক এবং ভুলকে পূর্ণরূপে জানতে সক্ষম হয় তথা সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে। কেবলমাত্র এই স্তরের ব্যক্তিরাই সঠিক নীতির নির্মাণ করতে পারে। কেননা এরা যে কোনো সমস্যার মুল কারণ জেনে সেই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করতে পারে। যেহেতু এরা সমস্ত সমষ্টির জন্য বাঁচে সেইজন্য কেবলমাত্র সঠিকের পক্ষ নেয়। না পরিবারের পক্ষ নেয়, না কোনো সমাজের পক্ষ নেয়। এরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখতে পায়। নিজেদের ভেতরে বিবেক জাগ্রত থাকার কারণে এরা সবকিছুই পরিস্কারভাবে দেখতে পারে এবং জানতে পারে। দূরদর্শী হবার ফলে সঠিক নীতিসমূহের খোঁজ করতে পারে এবং সকলের হিত ভেবে নীতিনিয়ম তৈরি করতে পারে। কেবলমাত্র এদের ভেতরেই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। এদের জীবন সাধারণত খুবই সরল প্রকৃতির হয়।

আত্মরঞ্জন এদের প্রিয়। এরা স্বয়ং অথবা আপনার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকে। এদের নিজস্ব কোনো স্বভাব থাকে না। প্রয়োজন অনুযায়ী এরা কোনো একটি ভাবকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। কেননা সকল ভাবের মধ্যেই এদের নিয়ন্ত্রন থাকে। সর্বদা সমষ্টির হিত ভেবে এরা কর্ম করে। যখন সমষ্টি পরিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী হয় তখন এরা সকল স্বাস্থ্যবর্ধক ভোগ থেকে সুখ প্রাপ্ত করে। এরা ২৪ ঘণ্টা অবধি অবিরত কর্ম করতে পারে। ২৪ ঘণ্টা ধরে কর্ম করতে এদের কোনো অসুবিধে হয় না।

মানব জীবন বিকাশের যাত্রা

সৃষ্টির উৎপত্তি এক পরম সত্যের ক্রমিক বিকাশ মাত্র। এই পরম তত্ত্বই হচ্ছে সম্পূর্ণ জগতের অভিব্যক্তির আধার। এই পরমতত্ত্বই হচ্ছে প্রাণ। এই প্রাণ প্রকৃতিকে ধারণ করে প্রকৃতি অনুসারে পদার্থে অর্থাৎ সংসারে রূপান্তরিত হয়। আলো হচ্ছে প্রাণ। ইচ্ছে হচ্ছে প্রকৃতি। অস্তিত্ব হচ্ছে পদার্থ। পদার্থ পাঁচ প্রকারের হয়— আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী। এই পঞ্চ পদার্থকেই পঞ্চতত্ব বলা হয়। এই পঞ্চতত্ব থেকেই সকল বস্তু নির্মিত হয়েছে। জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টিতেই এই পঞ্চতত্ত্বের সমাবেশ রয়েছে। এই শরীরে যা কিছু স্থূল তত্ত্ব রয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবী, যা কিছু দ্রব্য তত্ত্ব রয়েছে তা হচ্ছে জল, শরীরে যে তাপ রয়েছে তা হচ্ছে অগ্নি, যা কিছু বল-শক্তি রয়েছে তা হচ্ছে বায়ু এবং শরীরে যে শূন্য ভাগ রয়েছে তা হচ্ছে আকাশ। সৃষ্টির প্রতিটি অংশ নির্মাণে এই পঞ্চতত্ত্বের মূল সামগ্রী সংযুক্ত হয়। পঞ্চতত্ব দ্বারা নির্মিত এই শরীর চার মাত্রিক। কেননা এতে আদি, মধ্য, অন্ত এবং এই তিনের দ্বারা মিলিত অস্তিত্ব সংযুক্ত রয়েছে। অন্য ভাষায় বললে জন্ম, জীবন, মৃত্যু এবং এই তিনের মিলিত আধারকেই ক্রমশ চার মাত্রিক বলা হয়ে থাকে। যে কোনো সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই চার স্তরের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। যা লম্বা, চওড়া, মোটা এবং এই তিনের সংযুক্ত স্তরে সমাহিত। এই চার স্তরের আধারেই জীবনচেতনা চার স্তরীয় হয়ে থাকে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। এই চার স্তর থেকেই চার প্রকার শক্তির উদয় হয়— ক্রিয়াশক্তি, বাক্‌শক্তি, ভাবশক্তি এবং চিত্তশক্তি। এই চার প্রকার শক্তির বিকাশকেই মানব জীবনের সমগ্র বিকাশ বলা হয়। শরীরে ক্রিয়াশক্তি, মনে বাক্‌শক্তি, প্রাণে ভাবশক্তি ও আত্মায় চিত্তশক্তি সমাহিত থাকে। শরীর থেকে কর্ম, মন থেকে বাণী, প্রাণ থেকে সংকল্প এবং আত্মা থেকে সাক্ষীর উদয় হয়ে থাকে। এটিই মানবজীবন বিকাশের পরিণাম। মানব জীবন বিকশিত হবার কারণেই যোগ্য সিদ্ধ হয়। এই চার স্তর উত্তরোত্তর উচ্চ যোগ্যতার স্তরে অগ্রসর হয়। শারীরিক ক্ষমতা দ্বারা কৃষিকর্ম, মানসিক ক্ষমতা দ্বারা উৎপাদনশিল্প কর্ম, ভাবনাত্মক ক্ষমতা দ্বারা প্রশাসনিক কর্ম এবং চেতনাত্মক

ক্ষমতা দ্বারা নেতৃত্ব কর্ম সম্ভব হয়। এই ক্ষমতাসমূহের দ্বারাই শরীরী অবস্থা, মানসিক অবস্থা, ভাবনা অবস্থা এবং চেতনা অবস্থা নির্ধারিত হয়। যার মধ্যে যেমন ক্ষমতা বিকশিত হবে সে তেমন কর্ম সম্পাদন করবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে— কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার বিকাশ ঘটানো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ক্রিয়া শক্তির মাধ্যমে কৃষি কর্ম, বাক্‌শক্তির মাধ্যমে উৎপাদনশিল্প কর্ম, সংকল্প শক্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্ম এবং বিবেক শক্তির মাধ্যমে নেতৃত্ব কর্ম সম্পাদিত হয়। মানবজীবন বিকাশ যাত্রার বিস্তৃত পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

***

অধ্যায় ১৩

মানবজীবন বিকাশের চার স্তর

তন, মন, প্রাণ ও আত্মাই হচ্ছে জীবনের চারটি স্তর। এই চারের সংযোগের মাধ্যমেই জৈবিক অস্তিত্ব প্রকট হয়। পদার্থ দ্বারা তন নির্মিত হয়। প্রকৃতি দ্বারা মন নির্মিত হয়। আলো দ্বারা প্রাণ নির্মিত হয়। অস্তিত্ব দ্বারা আত্মা নির্মিত হয়। তন, মন, প্রাণ ও আত্মার বিকাশই হচ্ছে মানব জীবনের সমগ্র বিকাশ।

১. তন = ক্রিয়াশক্তিই হচ্ছে তন।
২. মন = বাক্‌শক্তিই হচ্ছে মন।
৩. প্রাণ = ভাবশক্তিই হচ্ছে প্রাণ।
৪. আত্মা = চিত্তশক্তিই হচ্ছে আত্মা।

মানব জীবন বিকাশের লক্ষণ

১. শারীরিক বিকাশের লক্ষণ

মানুষের ভৌতিক অস্তিত্বকেই শরীর বলা হয়। অঙ্গ, ইন্দ্রিয়, অনুভূতি, বল ইত্যাদির সমুচিত বিকাশকেই শারীরিক বিকাশ বলা হয়। যার নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকট হয়।

ক) অঙ্গ বিকাশ— পঞ্চ অঙ্গের বিকাশ।
খ) ইন্দ্রিয় বিকাশ— পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিকাশ।
গ) আবেগ বিকাশ— পঞ্চ আবেগের বিকাশ।
ঘ) বল বিকাশ— পঞ্চ বলের বিকাশ।

২. মানসিক বিকাশের লক্ষণ

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারের মানবীয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের প্রকাশ অথবা পরিষ্কারকেই মানসিক বিকাশ বলা হয়। মননশক্তিই হচ্ছে মন। বোধশক্তিই হচ্ছে বুদ্ধি। স্মরণশক্তিই হচ্ছে চিত্ত। আত্মশক্তিই হচ্ছে অহংকার। এই চার লক্ষণ পরিষ্কার করাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

ক) মননশক্তির বিকাশ— বিচারশীলতা, তর্কশীলতা, বাকপটুতার বিকাশ।

খ) বোধশক্তির বিকাশ— অর্থ, বিষয়-আশয় নির্ণয়ের বিকাশ।

গ) স্মরণশক্তির বিকাশ— গ্রহণশীলতা, বিষয়াসক্তি, বিলাসিতার বিকাশ।

ঘ) স্বভিমানের বিকাশ— জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছে, কর্ম করার ইচ্ছে, ভোগ করার ইচ্ছে ইত্যাদি ঈশ্বরীয়তার বিকাশ।

৩. ভাবনাত্মক বিকাশের লক্ষণ

ভাবনাত্মক বিকাশই হচ্ছে প্রাণের বিকাশ। প্রাণশক্তিই ভাবতরঙ্গরূপে হৃদয়ের ভেতরে অনুভূত হয়।

ক) সংবেদনশক্তির বিকাশ— সরলতা, বিনম্রতা, উদারতা, দয়ালু ইত্যাদি ভাবশক্তির বিকাশ।

খ) শ্রদ্ধাশক্তির বিকাশ— স্বীকৃতি, আজ্ঞাকারী, অনুশাসনের বিকাশ।

গ) সংকল্পশক্তির বিকাশ— ব্রত, পণ, প্রতিজ্ঞা, শপথের বিকাশ।

ঘ) সংযোগশক্তির বিকাশ— একতা, বন্ধুতা, মিত্রতা, সহযোগিতার বিকাশ।

৪. চেতনাত্মক বিকাশের লক্ষণ

আত্মচেতনার সমুচিত বিকাশকেই আত্মিক বিকাশ বলা হয়। আত্মিক বিকাশের প্রভাবেই আত্মার মধ্যে ব্রহ্মত্ব, প্রত্যক্ষদর্শীতা, ঈশ্বরত্ব, চিদত্ত্বের উদয় হয়। যার লক্ষণ নিম্নলিখিত—

ক) ব্রহ্মত্ত্বের বিকাশ— সমদর্শিতা, সর্বব্যাপকতা, সর্বাত্মকতা, সর্বহিতকারিতার বিকাশ।

খ) প্রত্যক্ষদর্শীতার বিকাশ— নিষ্পক্ষ, নিরীক্ষণ, নির্লিপ্ততা, ন্যায়শীলতার বিকাশ।

গ) ঈশ্বরত্ত্বের বিকাশ— স্বাবলম্বিতা, স্ব-নিয়ন্ত্রণ, স্বতন্ত্রতা, সুস্থ্যতার বিকাশ।

ঘ) চিদত্ত্বের বিকাশ— একাগ্রতা, স্থিরতা, শূন্যতা, সমাধিতার বিকাশ।

মানবজীবন বিকাশের উপায়

১. শারীরিক বিকাশের উপায়

আহার বিহারই যে শারীরিক বিকাশের প্রধান উপায় তা জানা উচিত। পরিমিত আহার বিহারই হচ্ছে শারীরিক বিকাশের আধার। আহার বিহারের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে শারীরিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং রুগ্নতা ঘিরে ধরে। আহার এবং খেলাধুলো হচ্ছে শারীরিক বিকাশের প্রমুখ উপায়।

২. মানসিক বিকাশের উপায়

শিক্ষাই হচ্ছে মানসিক বিকাশের প্রমুখ উপায়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারের পরিচ্ছন্ন অবস্থাই হচ্ছে মানসিক বিকাশ। ভাষা, গনিত, সংজ্ঞান, দর্শন— এই চার বিষয়ে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ দ্বারা মানুষের মানসিক বিকাশ অর্জন করা যায়।

৩. ভাবনাত্মক বিকাশের উপায়

সমুচিত সম্বন্ধ এবং ব্যবহারই হচ্ছে প্রাণ বিকাশের প্রমুখ উপায়। প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ এবং ব্যবহারকে আপন করে প্রাণ বিকাশের লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করা যায়।

৪. চেতনাত্মক বিকাশের উপায়

সম্যক জ্ঞান এবং ধ্যানের আত্মিক বিকাশই হচ্ছে চেতনা বিকাশের প্রমুখ উপায়।

মানবজীবন বিকাশের লাভ

১. শারীরিক বিকাশের লাভ

শারীরিক বিকাশের প্রমুখ লাভ হচ্ছে ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াশক্তির মূলে রয়েছে বল। কর্মসামর্থ্যই হচ্ছে বল। মানুষ কর্মশীল প্রাণী। কর্মই হচ্ছে মানব শরীরের বিশিষ্টতা।

২. মানসিক বিকাশের লাভ

মানসিক বিকাশের প্রমুখ লাভ হচ্ছে বাক্‌শক্তি। বাণীই হচ্ছে বাক্‌শক্তি। তর্কসামর্থ্যই হচ্ছে বাণী। মানুষের মধ্যে তর্ক করার ক্ষমতা থাকে। যৌক্তিকতাই হচ্ছে মানবীয় মনের বিশিষ্টতা। বিচার বিবেচনাই হচ্ছে তর্ক। কোনো বস্তুর পক্ষে বা বিপক্ষে চিন্তা করাকেই তর্ক বলা হয়। ভাল-মন্দ, ঠিক-ভুল, উচিত-অনুচিৎ, ন্যায়-অন্যায়, বরেণ্য-ত্যাজ্য, সৎ-অসতের নির্ণয় এই বাক্‌শক্তির দ্বারা হয়ে থাকে।

৩. ভাবনাত্মক বিকাশের লাভ

প্রাণিক বিকাশ হচ্ছে ভাবনাত্মক বিকাশের অভিপ্রায়। ভাবনাত্মক বিকাশের প্রমুখ লাভ হচ্ছে সংকল্পশক্তি। ব্রত, পণ, প্রতিজ্ঞা, শপথই হচ্ছে সংকল্পশক্তি। প্রাণই ভাবনাত্মক তরঙ্গরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। প্রাণের মধ্যে সংকল্পকে ধারণ করার ক্ষমতা থাকে। এই সংকল্পকেই পণ বলা হয়। প্রাণ দ্বারা এই সংকল্প বরেণ্য হবার কারণেই একে ব্রত বলা হয়।

৪. চেতনাত্মক বিকাশের লাভ

চেতনাত্মক বিকাশের প্রমুখ লাভ হচ্ছে বিবেকশীলতা। আত্মচেতনার বিকাশই হচ্ছে আত্মিক বিকাশ। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

শারীরিক ক্ষমতা এবং তা প্রাপ্তির উপায়

১. অঙ্গ, ইন্দ্রিয়, আবেগ, বল ইত্যাদি পরিছন্ন করুন। এইসব হচ্ছে শারীরিক ক্ষমতা। এই স্তরের ব্যক্তিদের ৬ ঘণ্টা অবিরত কর্ম করার শক্তি থাকে।

২. আহার, বিহার, ব্যায়াম এবং বিশ্রাম সমতা অনুযায়ী প্রয়োগ করলে শারীরিক ক্ষমতা বিকশিত হয়।

৩. সুপুষ্টতা এবং বলিষ্ঠতাই হচ্ছে শারীরিক ক্ষমতা।

৪. ক্রিয়াশীল হোন, শ্রমশক্তি বাড়ান।

৫. শরীর দ্বারাই শ্রম করা হয়। শ্রমশীলতায় শরীর সবল হয়।

৬. ক্রিয়াশক্তি দ্বারা কৃষি কর্ম হয়। বল ছাড়া কৃষিকর্ম সম্ভব নয়। সেইজন্য বলবান হোন।

৭. অন্ন, ফল, দুগ্ধ উৎপাদনই কৃষিকর্মের মূল উদ্দেশ্য।

৮. চাষবাস, উদ্যান এবং পশুপালনই হচ্ছে কৃষিকর্ম।

৯. ইন্দ্রিয়ের মহিমান্বিত অবস্থাই হচ্ছে শরীর। তাই কর্মেন্দ্রিয়কে মজবুত করুন।

১০. আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী হচ্ছে পঞ্চপদার্থ। পঞ্চপদার্থ দ্বারাই শরীর নির্মিত হয়।

১১. অন্ন মধ্যে পঞ্চ পদার্থ নিহিত রয়েছে। অন্ন দ্বারাই শরীর নির্মিত হয়। অন্নবান হোন, অতঃপর ভোগী হোন।

১২. অন্ন উপভোগের ফলে শরীরে পঞ্চতত্ত্বের পূরণ হয়ে থাকে। পুষ্টিগত উপাদানকেই অন্ন বলা হয়। অন্ন, ফল, দুগ্ধ ইত্যাদি হচ্ছে পুষ্টিগত উপাদান যা শরীরকে স্বাস্থ্যবান তৈরি করে। পরিমিত আহার উপভোগ করুন।

১৩. প্রাকৃতিকভাবেভাবে শারীরিক প্রেরণা থেকেই ক্ষুধা, পিপাশা, নিদ্রা ইত্যাদির অনুভূতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এইসব আবেগগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

১৪. অন্ন দ্বারা ক্ষুধা শান্ত হয়। জল দ্বারা পিপাশা শান্ত হয়। বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তি দূর হয়। অন্ন, জল এবং বিশ্রামই হচ্ছে শরীরের প্রধান ভোগ। এই তিনের পরিমিত উপভোগ করুন।

১৫. শস্য উৎপাদন, উদ্যান এবং পশুপালন হচ্ছে কৃষিকর্ম। কৃষি কর্ম থেকেই অন্য উৎপন্ন হয়। কৃষিকাজের মাধ্যমে অন্ন উৎপাদন করুন। এর দ্বারা নিজের এবং অপরের শারীরিক বিকাশ করুন।

১৬. অন্ন উপভোগ না করে প্রাথমিক বলিষ্ঠতা অর্থাৎ শারীরিক পুষ্টতা পূর্ণ হয় না। বিভিন্ন প্রকার উপভোগের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়সমূহ সক্রিয় হয়।

১৭. উপভোগের মাধ্যমেই কর্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা মন সক্রিয় হয়। ইন্দ্রিয়সমূহকে সক্রিয় না করে মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়।

১৮. শারীরিক অবস্থাকে জয় করার জন্য মানসিক বিকাশ আবশ্যক। অতএবঃ উপভোগের মধ্যে সর্বদা সংলগ্ন থাকুন।

১৯. শরীরী উপভোগকে গুরুত্ব দিন। ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়েই হচ্ছে শরীর। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রয়োগের দ্বারা শরীরী উপভোগ হয়ে থাকে।

২০. শারীরিক প্রসন্নতার দ্বারা মনের বিকাশ দ্বার খুলে যায়। শরীরকে প্রসন্ন রাখুন। ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রজ্বলিত রাখুন।

২১. যাদের শরীর পুষ্ট নয় তাদের মন বিকশিত হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহের বিকাশ দ্বারাই মানসিক বিকাশের দরজা খুলে যায়। শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সক্রিয় রাখুন। শারীরিক মহিমার মূল উপাদান হচ্ছে অন্ন। অন্নবান হোন।

২২. অন্নই হচ্ছে পদার্থ। পদার্থই হচ্ছে শরীর।

২৩. অন্ন দ্বারা পৌষ্টিক উপাদানের পরিমিত উপভোগ করুন। নিজের ভোগসামর্থ্যের পৌষ্টিক উপাদানের উপভোগ কল্যাণকারী হয়ে থাকে।

২৪. পৌষ্টিক উপাদান দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের উত্তম বিকাশ হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর হয়। অনুভূতি শুদ্ধ হয়। বলশক্তি বৃদ্ধি হয়।

২৫. ক্ষুধা-পিপাশা হচ্ছে শরীরের মুখ্য অনুভূতি। ক্ষুধা-পিপাশাকে তৃপ্ত না করে শরীর পুষ্ট হতে পারে না। শারীরিক প্রয়োজনীয়তার অভিব্যক্তিই হচ্ছে ক্ষুধা পিপাশা। ক্ষুধা-পিপাশাকে অন্ন এবং জল দ্বারা তৃপ্ত করুন।

২৬. তামসিক অন্ন পরিত্যগ করুন। তামসিক অন্ন সেবনে শরীরে রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি হয়। বাসি, উচ্ছিষ্ট, মলিন, দুষিত ইত্যাদি তামসিক অন্নের অন্তর্ভুক্ত।

২৭. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়সমূহ, অনুভূতি, বল ইত্যাদি বিকাশের দ্বারাই অন্তঃকরণ বিকাশের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকারই হচ্ছে অন্তঃকরণ।

২৮. ভাষা, গণিত, সংজ্ঞান, দর্শনের দ্বারা মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকার পরিশুদ্ধ হয়। অতঃপর নিজ ক্ষমতানুযায়ী এই চার বিষয়কে অধ্যয়ন করে মানবিক অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করুন।

মানসিক ক্ষমতা এবং তা প্রাপ্তির উপায়

১. মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহংকারকে পরিচ্ছন্ন করুন। তর্ক, বোধ, স্মৃতি এবং স্বভিমানই হচ্ছে অন্তঃকরণ শুদ্ধিকরণের উপকরণ। এই স্তরের ব্যক্তিদের ১২ ঘণ্টা অবিরত কর্ম করার ক্ষমতা থাকে।

২. বোধসম্পন্ন হোন, কল্পনাশক্তি বাড়ান। এতে বাক্‌শক্তির উদয় হবে। বাক্‌শক্তির মাধ্যমেই মানসিক ক্ষমতা প্রখর হয়। আবার বোধশক্তিই হচ্ছে বুদ্ধি। কোনো বিষয় বোধের সামর্থ্যই হচ্ছে বুদ্ধি।

৩. বাণীর মাধ্যমেই তর্ক ব্যক্ত হয়। তার্কিক হোন, বাক্‌শক্তিকে উজ্জীবিত করুন। বাণীর মাধ্যমেই আদান-প্রদান হয়ে থাকে। বাকপটু হবার অভাস করুন।

৪. কোনো বিষয়ের সমষ্টিই হচ্ছে মন। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় বস্তু সেবনে মনের বিকাশ হয়। বিষয়বোধ বাড়ান, মানসিক ক্ষমতার জাগরণ ঘটবে।

৫. শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই হচ্ছে পঞ্চবিষয়।

৬. মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিষয়াত্মক হয়ে থাকে। বিষয়বাসনাই মানসিক ব্যক্তিদের প্রধান লক্ষণ। বিষয়লিপ্সা জাগিয়ে তুলুন।

৭. শব্দবোধ, স্পর্শবোধ, রূপবোধ, রসবোধ ও গন্ধবোধের দ্বারাই মন প্রখর হয়। মনের প্রখরতা বাড়ানোর জন্য বিষয়কে উপভোগ করুন।

৮. কর্ণ দ্বারা শব্দ, ত্বক দ্বারা স্পর্শ, নেত্র দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস ও নাসিকা দ্বারা গন্ধকে অনুভব করুন। বিষয়ের বিবিধ জ্ঞান বাড়ান।

৯. উৎপাদনশিল্প তিন প্রকারের— মৃদু, মধ্যম এবং উচ্চ। এই তিনটি উত্তরোত্তর উচ্চ কর্ম। নিজের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী উৎপাদনশিল্পকর্ম চয়ন করুন।

১০. বাণীর মাধ্যমেই আদান-প্রদান হয়। বাকপটুতা ছাড়া আদান-প্রদান সফল হয় না। বিচারশীলতা ছাড়া বাকপটুতা সিদ্ধ হয় না। ভাষাজ্ঞানকে প্রখর করে বাকপটু হোন।

১১. বাকপটুতার অর্থ হচ্ছে বিষয়বস্তুকে অন্যদের সামনে ভাল করে বিস্তৃতভাবে বোঝাতে পারা।

১২. বিষয়ভোগ থেকেই প্রাণ অলংকৃত হয়। প্রাণের জাগরণ থেকেই সংবেদনশীলতা বাড়ে। সংবেদনশীলতা থেকেই সম্বন্ধ বাড়ে। অতঃপর বিষয়ভোগের ত্যাগ না করে বরং তা সম্যকপূর্ণভাবে গ্রহণ করুন।

১৩. মনোরঞ্জক হোন। বিষয় হচ্ছে মন, বিষয়ভোগই হচ্ছে মনোরঞ্জন।

১৪. মনকে বিকশিত করার জন্য তনকে পুষ্ট বানান। সুপুষ্ট তনেই তো সুন্দর মনের বিকাশ হয়ে থাকে।

১৫. যাদের ইন্দ্রিয় বিকশিত নয় তাদের মনের যথোচিত বিকাশ হয় না। মনের বিকাশ ছাড়া বিষয়বোধ তৈরি হয় না। বিষয়বোধ ছাড়া মানসিক ক্ষমতা প্রাপ্তি হয় না।

১৬. সুখই হচ্ছে জীবনের অর্থ। সুখ বিষয় থেকে আসে। আর মন দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়ে থাকে। মনের সহায়তা দ্বারাই বিষয়ের অর্থবোধ তৈরি হয়। তাই মানসিক ক্ষমতাবান হোন।

১৭. নিষিদ্ধ বিষয় সেবনে মন কুণ্ঠিত হয়ে যায়। মনের বিষয়বোধ ক্ষীণ হয়ে যায়। মন কুণ্ঠিত হলে যোগ্যতার পতন ঘটতে থাকে।

১৮. তামসিক বিষয়ই নিষিদ্ধ বিষয়। কুশব্দ, কুস্পর্শ, কুরূপ, কুরস, কুগন্ধই হচ্ছে নিষিদ্ধ বিষয়। এসব থেকে দূরে থাকুন।

১৯. সুশব্দ, সুস্পর্শ, সুরূপ, সুরস, সুগন্ধই হচ্ছে প্রশস্ত বিষয়। এদের রমণ করুন। সুন্দর বিষয় রমণ করলে মন প্রতিভাবান হয়।

২০. বিষয়সেবনে মানসিক যোগ্যতা তৃতীয় চরণে প্রবেশ করে। নিম্ন, মধ্য, উচ্চ— এই তিন প্রকার মানসিক স্তর রয়েছে।

২১. উচ্চতম মানসিক অবস্থায় উপনীত হতে বিষয়ভোগে সংলগ্ন থাকুন।

২২. বিষয়ভোগ ছাড়া মনকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিষয়ভোগের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকুন। বিষয়ের অভাব উৎপন্ন হতে দেবেন না। এরজন্য পর্যাপ্ত প্রয়াস করুন। ইচ্ছানুযায়ী ভোগের জন্য সর্বদা তৎপর থাকুন।

২৩. ক্ষমতানুযায়ী উপার্জন এবং ক্ষমতানুযায়ী উপভোগ সর্বদা কল্যাণকারী হয়ে থাকে। হিত এবং অহিতকে মাথায় রেখে বিষয়ভোগ করুন।

২৪. নিজ ক্ষমতার ন্যূনতম অথবা নিজ ক্ষমতার অধিক বিষয়ভোগ হাণিকারক। পরিমিত বিষয়ভোগ সর্বদা হিতকারী হয়। অতঃপর বিষয়ভোগে সামঞ্জস্য বজায় রাখুন।

২৫. উপভোগ ছাড়া উপার্জন ব্যর্থ।

২৬. বাসনাই মানসিক অবস্থার লক্ষ্য। বিষয়বাসনাই মানসিক স্তরের মনুষ্যের প্রধান লক্ষণ। বিষয়ের লালসা উৎপন্ন করুন। মানসিক ক্ষমতার বিকাশ হবে।

২৭. ভোগের মাধ্যমেই বাসনার পূর্তি হয়ে থাকে। বাসনা থেকেই মানসিক ক্ষমতার সিদ্ধি হয়।

২৮. বাসনার জাগরণ থেকেই বাসস্থান তৈরি হয়। সুন্দর আবাস থাকা মানসিক ক্ষমতার পরিচায়ক।

২৯. মানসিক ক্ষমতার বিকাশ থেকেই বিশ্ব গঠন হয়। মানসিক ক্ষমতা ছাড়া বিশ্ব থিতু হতে পারে না।

৩০. মনুষ্য বিকাশের জন্য মানসিক ক্ষমতার বিকাশ আবশ্যক। বসতির বিকাশ মানসিক ক্ষমতার প্রতিফলন।

৩১. মনুষ্যই বসতির নির্মাতা। বসবাসযোগ্য ভবনের নির্মাণ বিচক্ষণ মনুষ্যের লক্ষণ।

৩২. বাসনাকেন্দ্রই হচ্ছে আবাস। বাসস্থানকেই আবাস অথবা নিবাস বলা হয়।

৩৩. অধিষ্ঠানের ইচ্ছেই হচ্ছে বাসনা। রমণ হচ্ছে অধিষ্ঠান। রমণের আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে বাসনা। জগতে রমণকারীদেরই মনুষ্য বলা হয়। বাসনাকে বিকশিত করুন, মানসিক ক্ষমতা প্রাপ্তি হবে।

৩৪. বাসনা থেকেই বস্ত্রের বিকাশ হয়ে থাকে। সুন্দর বস্ত্র ব্যবহার করুন।

৩৫. বস্ত্র থেকে সৌন্দর্য বিকশিত হয়। সৌন্দর্য প্রাপ্তির জন্য সুন্দর বস্ত্রের সৃজন করুন এবং সংগ্রহ করুন।

৩৬. সময়ানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র ধারণ করে নিজ রূপের প্রতি অন্যান্য রূপবানদের আকর্ষণ করুন। এতে বাসনা বৃদ্ধি পাবে, মানসিক ক্ষমতার জাগরণ ঘটবে।

৩৭. বিবিধ রঙের এবং বিবিধ ঢঙের বস্ত্র ব্যবহার করুন।

৩৮. বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য অধ্যয়ন করলে মানসিক বিকাশ হয়।

৩৯. প্রবেশ করা, জানা, গমন করা, ইচ্ছে হওয়া, চাওয়া, কামুক হওয়া, বিস্তৃত হওয়া, ব্যপক হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রসারিত হওয়াই মানসিক অবস্থা। যা জগৎকে থিতু করে রাখে।

৪০. নিজের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধকে পরিশুদ্ধ করুন। এদের সুন্দর এবং মধুর করে তুলুন। মনের বিকাশ হবে, মন উচ্চতায় অবস্থান করবে।

৪১. নিজ সৌন্দর্য অভিবর্ধনের উপর বিশেষ ধ্যান কেন্দ্রীভূত করুন। নিজের চারপাশে সুন্দর পরিবেশ নির্মাণ করুন। সুন্দর বিষয়কে গ্রহণ করুন।

৪২. নিজের ত্বক, নিজের নখ, নিজের কেশ, নিজের বস্ত্র, নিজের ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপুষ্ট, সুন্দর, সুখময়, শুভ রাখুন এবং সমুন্নত রাখুন। মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি হবে।

৪৩. বিষয়ভোগ এবং সাজসজ্জাতে অনাচার এবং অত্যাচার করবেন না। সম্যক আচার ব্যবহারই হচ্ছে সদাচার। সৌন্দর্য অভিবর্ধন, বিষয় অর্জন এবং বিষয়ভোগ সম্বন্ধীয় সমুচিত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

৪৪. বিষয় উপার্জন এবং উপভোগ সম্পর্কিত সম্যক পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করুন এবং সম্যক ব্যক্তিদের পরিচর্যা করে ক্ষমতাবোধ প্রাপ্তি করুন।

৪৫. বিষয়ের উপার্জন এবং উপভোগ নিয়ে যা কিছু জেনেছেন সেইসব অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই বলুন এবং না জানা বিষয় নিয়ে অন্যের কাছে বিনম্রতার সাথে জিজ্ঞেস করুন।

৪৬. সকল বিষয়ের একটিই অয়ন তা হচ্ছে স্পর্শ। বিষয়ভোগ করার সময় অন্ততঃ সকল বিষয় একই অয়নে বিলীন হয়ে যায়। বিষয়ের স্পর্শ অয়নে বিলীন হয়েই সংবেদনশীলতা জাগ্রত হয়, যার ফলে সম্বন্ধের উদয় হয়। অতঃপর বিষয়পরায়ণ হোন।

৪৭. বিষয়সমূহ ত্যাগ করবেন না। বিষয় ত্যাগে মানবতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অবরুদ্ধ বিকাশ জগতে বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪৮. সংস্পর্শ বিষয় থেকে শুদ্ধ প্রাণের জাগরণ হয়। জাগ্রত প্রাণ সংবেদনশীল হয়ে থাকে। সংস্পর্শ থেকে সম্পর্ক এবং সম্পর্ক থেকে সম্বন্ধ তৈরি হয়। সম্বন্ধ থেকে সভ্যতা উৎপন্ন হয়। বিষয়সেবন দ্বারা মানবীয় সভ্যতা প্রাপ্তি হয়। তাই বিষয়সেবী হোন।

৪৯. মনকে কুণ্ঠিত করবে এমন তামসিক বিষয় সেবন করবেন না। সাত্ত্বিক বিষয় সেবনেই মন প্রদীপ্ত হয়, প্রাণ জাগ্রত হয়।

৫০. যখন বিষয়ভোগ নিবৃত হতে থাকবে এবং সকল বিষয় একীভূত হয়ে সংস্পর্শে সমাহিত হতে থাকবে, তখনই সংবেদনশীলতা বা ভাবনাবস্থার লক্ষণ প্রকট হয়।

ভাবনাত্মক ক্ষমতা এবং তা প্রাপ্তির উপায়

১. প্রাণই হচ্ছে শক্তি। অর্থাৎ শক্তিশালী হোন।

২. প্রাণের ভেতর ধারণশক্তি রয়েছে, যাকে শ্রদ্ধা বলা হয়।

৩. প্রাণতরঙ্গই হচ্ছে ভাব, যাকে সংবেদনা বলা হয়।

৪. প্রাণে যা ধারণ করা হয় তাকে পণ বলা হয়। ব্রত বা সঙ্কল্পই হচ্ছে পণ।

৫. পণই হচ্ছে শপথ। পণই হচ্ছে প্রতিজ্ঞা।

৬. হঠকারী নয়, ব্রতচারী হোন। হঠতা হচ্ছে দুষ্টটা, ব্রত হচ্ছে বীরত্ব।

৭. বিবেকের সাথে বরণ করে নেওয়া সংকল্পই হচ্ছে ব্রত। অজ্ঞানতার সাথে গ্রহণ করা সংকল্পই হচ্ছে হঠকারিতা। সৎ বিবেক দ্বারা সৎব্রতী হোন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

৮. শূর নয় বীর হোন। দুঃসাহসই হচ্ছে অসুরত্ব। সৎসাহস হচ্ছে বীরত্ব।

৯. সৎজ্ঞানপূর্বক ধারণ করা ব্রত বীরত্বের লক্ষণ। মূর্খতাপূর্বক ধারণ করা হঠকারীতা অসুরতার লক্ষণ। সজ্জন হোন, বীর হোন।

১০. প্রাণই হচ্ছে ভাব। প্রাণই হচ্ছে বেদনা। প্রাণই হচ্ছে সূত্র। প্রাণই হচ্ছে সম্বন্ধ। প্রাণ জাগ্রত নাহলে সংবেদনশীল সম্বন্ধের উদয় হবে না। তাই প্রাণকে জাগ্রত করুন।

১১. প্রাণ হৃদয়ে নিবাস করে। হৃদয়ই হচ্ছে বৃক্ষ, বৃক্ষই হচ্ছে রক্ষক। আপন প্রাণকেন্দ্রের বিকাশ করুন।

১২. সংবেদনশীলতাই প্রাণকেন্দ্র বিকাশের লক্ষণ। ভাবপ্রবণই হচ্ছে সংবেদনশীলতা। হৃদয়কে সংবেদনশীল তৈরি করুন। ভাবপ্রবণ হোন, ভাবপ্রবণাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

১৩. সরলতা, বিনম্রতা, উদারতা এবং দয়াই সংবেদনশীলতার পরিচায়ক।

১৪. একসমান বেদনার অনুভূতিই হচ্ছে সংবেদনা। পরপীড়ার অনুভূতিই হচ্ছে সংবেদনা। পরোপকার এবং পরপীড়াকে অনুভব করুন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

১৫. বাসনা যখন সংবেদনায় পরিবর্তিত হয় তখন ভাবনাবস্থার উদয় হয়।

১৬. বিষয়াত্মকতাই বাসনা। সমবদ্ধতাই সংবেদনা। বাসনাতে বিষয়ত্ব এবং সংবেদনাতে আপনত্ব থাকে।

১৭. অধিষ্ঠানের ইচ্ছেই হচ্ছে বাসনা। অধিষ্ঠানের ভাবই হচ্ছে সংবেদনা। অন্যদের অধিষ্ঠান করে দিন। তাদের অধিকার রক্ষা করুন। এটিই হচ্ছে ভাবনাবস্থা।

১৮. পররক্ষক হোন, পরোপকারী হোন, পরহিতকারী হোন, পরসেবক হোন, পরপালক হোন, এটিই হচ্ছে ভাবনাবস্থা।

১৯. স্বহিত থেকে পরহিতে রূপান্তরই হচ্ছে ভাবনাবস্থা। স্বার্থকে পরমার্থে পরিবর্তনই হচ্ছে ভাবনাবস্থা। ‘স্ব’ কে পরের সাথে সম্মন্ধযুক্ত করুন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

২০. প্রাণই হচ্ছে সূত্র যা একজনের সাথে অপরজনকে জুড়ে রাখে। পারস্পরিক সম্মন্ধের অনুভূতিই হচ্ছে সংবেদনা। জাগ্রত প্রাণই সংবেদনশীলতা তৈরি করে। সম্মন্ধযুক্ত হোন। ভাবনাশীল হোন। পারস্পরিক সম্মন্ধকে বিকশিত করুন। বন্ধুত্বই হচ্ছে ভাবনাবস্থা।

২১. ব্রত, সংবেদনা, সংকল্প, শপথ, সম্বন্ধ, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, সহকারিতা, সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতাই ভাবনাবস্থার প্রমুখ লক্ষণ। এই লক্ষণসমূহকে বিকশিত করুন।

২২. জাগ্রত প্রাণেরই সুখ দুঃখ অনুভব হয়। সুখের অনুভবই হচ্ছে বেদনা। জাগ্রত প্রাণই সংবেদনশীল হয়ে থাকে।

২৩. প্রাণের কারণেই সকল জীবদের প্রাণী বলা হয়। জাগ্রত প্রাণের সংবেদনশীল মানুষদের সকল প্রাণীদের সাথে সম্বন্ধ অনুভব হয়। এটিই হচ্ছে প্রেম। প্রেমপূর্ণ হোন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

২৪. প্রেমই হচ্ছে ভাবনাবস্থা। সংবেদনশীলতাই হচ্ছে প্রেম। প্রেমকে বিকশিত করুন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

২৫. প্রাণ, অপান, বান, উদান এবং সমানই হচ্ছে পঞ্চপ্রাণের সমুচ্চয়। এই পঞ্চপ্রাণই দেহকে পালন করে থাকে। দেহ এবং দেশ একসমান। প্রাণবান ব্যক্তিই দেশকে পালন করে থাকে। জনগণ, সমাজ এবং রাষ্ট্রই হচ্ছেই দেশ। তাই সামাজিক হোন।

২৬. সংবেদনা দ্বারাই সেবা হয়ে থাকে। লোকপালনই হচ্ছে জনসেবা। সেবা প্রদানের জন্যই সেনা গঠন করা হয়। সেনাদেরই সৈনিক বলা হয়। সেবক অথবা সৈনিক সমার্থক শব্দ। সেবাভাবকে বিকশিত করুন। ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

২৭. জনসেবা দ্বারা প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে সেবকদের নিযুক্ত করা উচিত। সংবেদনশীল সেবাই হচ্ছে ভাবনাবস্থার ধর্ম।

২৮. সকল প্রাণীদের সুরক্ষা প্রদানকারীই হচ্ছে সেবক। প্রাণই হচ্ছে প্রাণীদের রক্ষক। সংরক্ষণের বিকাশ করুন।

২৯. প্রাণবান ব্যক্তিই প্রাণীদের রক্ষা করতে পারে। প্রাণই হচ্ছে সাহস, ধৈর্য, ধার্মিক, নিয়মশীলতা ও অনুশাসন। প্রাণবান হোন।

৩০. প্রাণের প্রিয় হচ্ছে যশ। যশই হচ্ছে কীর্তি। প্রাণ দ্বারাই সক্রিয়তা এবং সংবেদনা উৎপন্ন হয়। নিষ্ক্রিয় বস্তু প্রাণহীন হয়। সেইজন্য প্রাণই হচ্ছে কার্যপালক। কার্যপালক হোন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

৩১. নিয়মনীতি, নির্ণয়ই হচ্ছে কোনো সু-রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। সেইসবের পালন করার জন্য গঠিত নির্দিষ্ট বিভাগে সেবকদের নিযুক্ত করা উচিত। ভাবনাবস্থা প্রাপ্ত করুন, কার্যপালক হোন।

৩২. জনসেবাই হচ্ছে ভাবনাবস্থা। জনগণের সংরক্ষণই হচ্ছে ভাবনাবস্থা। ভাবনাবস্থা ছাড়া সেবকধর্ম পালন অসম্ভব। ভাবনাবস্থা প্রাপ্ত করুন।

৩৩. প্রশাসনিক কর্মই হচ্ছে সেবকের ধর্ম। জনগণের শিক্ষা, জীবিকা, সুবিধা, সংরক্ষন প্রদান করাই হচ্ছে প্রশাসন। ভাবনাবস্থা প্রাপ্ত করুন, দক্ষ প্রশাসক হোন।

৩৪. প্রশাসনের তিনটি ধর্ম— নিয়ম পালন, নীতি পালন এবং নির্ণয় পালন। এই তিন কর্মের জন্য প্রশাসনিক পদের সৃজন হয়। আপনার উত্তরদায়িত্ব পালন করুন। প্রশাসনই হচ্ছে রাজ্য। রাজ্যই হচ্ছে রক্ষণকর্ম। ভাবনাবস্থা প্রাপ্ত করুন।

৩৫. যাদের ইন্দ্রিয় ক্ষীণ, যাদের মন ক্ষীণ, তাদের প্রাণ বিকশিত হয় না। অতঃপর প্রাণের বিকাশ করার জন্য মন এবং ইন্দ্রিয় বিকাশ করুন। অর্থাৎ তন এবং মনকে বিকশিত করুন।

৩৬. যশই হচ্ছে সেবকের মহিমা। কীর্তি দ্বারাই সেবক মহিমামণ্ডিত হন। সৎকর্মী দ্বারা সুযশ এবং সুকীর্তি প্রাপ্তি হয়। দুষ্কর্ম দ্বারা অপযশ এবং অপকীর্তি প্রাপ্তি হয়। সৎকর্মী হোন।

৩৭. পদের অপহরণ কদাপি করবেন না। জনপদের অপহরণকারী জনতার মধ্যে কখনো সুযশ এবং সুকীর্তি প্রাপ্ত করতে পারে না।

৩৮. জনপদ, রাজ্যপদ এবং লোকপদে নিযুক্তির জন্য নিজেদের যথোচিৎ যোগ্যতার বিকাশ করুন। যোগ্যতা থেকেই পদের দায়িত্ব বহন করা যেতে পারে। অন্যথায় পদের গৌরব-গরিমা নষ্ট হয়ে যায়। তাই সুপাত্র হোন।

৩৯. যেসব মানুষ যশের উপভোগ করতে পারে না তারা সেবকপদ থেকে চ্যুত হয়ে যায়।

৪০. সৎভাব ধারণকারীরাই সংবেদনশীল হয়ে থাকে। অসৎভাব ধারণকারীরা কঠোর হয়ে থাকে। সৎভাব দ্বারা উত্থান, অসৎভাব দ্বারা পতন হয়। সৎভাব বিকশিত করুন, ভাবনাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

৪১. সংস্পর্শ থেকেই সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রাণীদের সাথে ব্যক্তির নিকট সম্বন্ধের মাধ্যমে সংস্পর্শ প্রাপ্তি হয়, সংবেদনশীলতা তৈরি হয়। সম্মন্ধের সংবর্ধন করুন, সংস্পর্শবান হোন।

৪২. সংস্পর্শ, সঙ্গম, সম্মন্ধ, সম্পর্ক এবং সম্ভোগ প্রাণের জাগরণে সহায়তাকারী হয়, যদি পারস্পরিক সহমতির ভিত্তিতে নির্মিত হয়। সহমত-সংস্পর্শবান্ হোন।

চেতনাত্মক ক্ষমতা এবং তা প্রাপ্তির উপায়

১. সকল প্রকার সুখ প্রাপ্তির জন্য এক তত্ত্ব থেকেই সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্যের জ্ঞান এবং বোধ থেকে সত্য প্রাপ্তি হয়। সত্যকে পূর্ণরূপে জেনে নিয়ে তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আত্মাবস্থা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

২. আত্মাবস্থাই হচ্ছে বিবেক। আত্মিক বিকাশ করুন, তাতে বিবেক প্রাপ্তি হয়।

৩. চেতনার অবস্থাই হচ্ছে আত্মাবস্থা। চিত্তকে জাগ্রত করুন।

৪. ক্রিয়াকলাপ, বিচার, ভাবনার অধ্যক্ষ হচ্ছে বিবেক। বিবেকই হচ্ছে আত্মাবস্থার প্রমুখ লক্ষণ।

৫. প্রবৃত্তির সাক্ষী হচ্ছে বিবেক। যেসব প্রবৃত্তি নিজেকে অনুকূল রাখে তাই হচ্ছে বিবেকবান। বিবেকবানই হচ্ছে আত্মাবস্থা। বিবেকবান হোন, তাতে প্রত্যক্ষদর্শীতার বিকাশ হবে।

৬. সংস্কার হচ্ছে প্রবৃত্তি, স্বভাবই হচ্ছে প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতিই হচ্ছে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির উপর বিবেকের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে আত্মাবস্থা।

৭. প্রজ্ঞাই হচ্ছে বিবেক। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই হচ্ছে প্রজ্ঞতা। প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই হচ্ছে স্থিতপ্রজ্ঞ। প্রজ্ঞাবান হোন, বিবেকবান হোন। আত্মাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

৮. সমদর্শীতাই হচ্ছে বিবেকশীলতা। সমদর্শীই সাক্ষীতে পরিবর্তিত হতে পারে। সঠিক পক্ষ অবলম্বনই হচ্ছে সমদর্শীতা। সমদর্শীই হোন। আত্মাবস্থা সিদ্ধ হবে।

৯. সঠিক পক্ষ নেওয়াই হচ্ছে ন্যায়শীলতা। ভ্রান্ত পক্ষকে সঙ্গ দেওয়া ন্যায়শীলতা হতে পারে না। ন্যায়শীলতা ছাড়া নিয়ম, নীতি, নির্ণয়, সম্যক হতে পারে না। ন্যায়শীল হোন। আত্মাবস্থা সিদ্ধ হবে।

১০. নিয়মই হচ্ছে বিধান, নীতি প্রণালীই হচ্ছে মন্ত্রণা এবং নির্ণয়ই হচ্ছে ন্যায়। নিয়ম, নীতি, নির্ণয়ই হচ্ছে নেতৃত্ব। সমদর্শী নয়নই হচ্ছে নেত্র। নেত্রবান হোন। নেতৃত্ব ক্ষমতা প্রাপ্তি হবে।

১১. জ্ঞানচক্ষুই হচ্ছে নয়ন। নয়নই হচ্ছে ন্যায়কারী নেত্র। সৎজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ন্যায়কারী নেত্র প্রাপ্তি হয় যা সমদর্শী এবং ন্যায়কারী হয়ে থাকে। জ্ঞানবান হোন, জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত করুন। আত্মাবস্থা সিদ্ধ হবে।

১২. নেত্র থেকেই নেতৃত্ব তৈরি হয়। জননেতৃত্বের জন্য লোকনেত্র আবশ্যক। সার্বজনিকতাই হচ্ছে লোক। সর্বোত্তম নয়নই হচ্ছে ন্যায়কারী নেত্র। সর্বাত্মকতা প্রাপ্তি করুন, জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হতে থাকবে।

১৩. ইচ্ছের অধিপতিই হচ্ছে ঈশ্বর। নিজের ইচ্ছের অধিপতিই হচ্ছে ঈশ্বর। ইচ্ছেই হচ্ছে প্রকৃতি, অধিপতিই হচ্ছে ঈশ্বর। ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি করুন। আত্মাবস্থা সিদ্ধ হবে।

১৪. ইশ্‌ই হচ্ছে ইচ্ছে, বর হচ্ছে পতি। ইশ্‌যুক্ত বর হচ্ছে ঈশ্বর। ইচ্ছের অধিপতি হোন, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি হবে।

১৫. অল্পশ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে শরীরী অবস্থা, অর্ধশ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে মানসিক অবস্থা, অধিশ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে ভাবনা অবস্থা, পূর্ণশ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আত্মাবস্থা। ঈশ্বরীয়তার বৃদ্ধি করুন।

১৬. ব্যপকতা ছাড়া প্রত্যক্ষতা প্রাপ্ত হয় না। সংকীর্ণ অবস্থায় প্রত্যক্ষদর্শীতা উৎপন্ন হয় না। সর্ববব্যাপকতাতেই প্রত্যক্ষদর্শীতা উদিত হয়। আত্মসঙ্কোচ থেকে আত্মবিস্তারের পথে চলুন। আত্মাবান হোন।

১৭. উদাসীন অবস্থাই হচ্ছে আত্মাবস্থা। উত + আসীন মিলেই হয় উদাসীন। যার অর্থ হচ্ছে আজ্ঞাচক্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এমন ব্যক্তিই আত্মাবস্থাযুক্ত হয়ে থাকে। আজ্ঞাচক্রই হচ্ছে তৃতীয় নেত্র। তৃতীয়নেত্রই হচ্ছে নায়ক। সৎ বা অসতের বিবেকই হচ্ছে তৃতীয় নেত্রের কার্য। নীর-ক্ষীরের বিবেকবান হংসতুল্য ব্যক্তিরই আত্মাবস্থা প্রাপ্তি হয়। বিবেকবান হোন, আত্মাবস্থা সিদ্ধ হবে।

১৮. শরীরী অবস্থা থেকে মানসিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা থেকে ভাবনা অবস্থা এবং ভাবনা অবস্থা থেকে আত্মাবস্থা প্রকট হয়।

১৯. ক্ষুধা পিপাসা থেকে বাসনা, বাসনা থেকে সংবেদনা, সংবেদনা থেকে সৎবিবেকের জাগরণ ঘটে।

২০. তন থেকে ক্ষুধা পিপাসা, মন থেকে বাসনা, প্রাণ থেকে সংবেদনা, আত্মা থেকে সৎবিবেক প্রাপ্তি হয়।

২১. তন থেকে অন্নলিপ্সা, মন থেকে বিষয়লিপ্সা, প্রাণ থেকে যশলিপ্সা, আত্মা থেকে শ্রেয়লিপ্সা প্রাপ্তি হয়।

২২. চেতনসত্ত্বা সুখ উপভোগ করার জন্য বার বার এই সংসারে শরীর ধারণ করে। সুখ উপভোগই চেতনসত্ত্বার পরম লক্ষ্য।

২৩. আত্মাবস্থাতেই সঠিক প্রকার নেতা, বৈজ্ঞানিক, যোগী বা সন্ত হয়ে উঠতে পারে। আত্মাবস্থাকে বিকশিত করুন। লোকনায়ক, লোকবিজ্ঞানী, লোকউদ্ধারক বা লোকপথপ্রদর্শক হোন।

২৪. আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সহজেই যোগ সিদ্ধ হয়ে যায়।

২৫. আত্মরঞ্জনই আত্মাবস্থার লক্ষণ। আত্মরঞ্জন করুন। আত্মাবস্থা প্রাপ্তি হবে।

২৬. শরীরী অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন যেমন প্রিয়, মানসিক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির বিষয় যেমন প্রিয়, ভাবনাবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির যশ যেমন প্রিয় তেমনই আত্মাবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির শ্রেয় হচ্ছে প্রিয়। প্রিয়তা প্রাপ্তি থেকে সুখ, সন্তুষ্টি, শান্তি এবং মোক্ষ গৃহীত হয়। তা নাহলে দুঃখ, অসন্তুষ্টি, অশান্তি এবং বন্ধনযুক্ত অবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই হচ্ছে এই জগৎ সংসারের সারমর্ম। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

***

অধ্যায় ১৪

সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশেষ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১।। মানুষ কি ব্যবস্থা ছাড়া চলতে পারবে না? কোনো ব্যবস্থা কি মানুষের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদিকে হনন করবে না?

উত্তর।। মানুষ ব্যবস্থা ছাড়াও চলতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় তার জীবন পরম দুঃখে ভরে যাবে। যা কোনো মানুষ চায় না। সেইজন্য মানুষ ব্যবস্থা ছাড়া থাকতে পারে না। তার ভেতর অন্তঃকরণ জাগ্রত থাকার কারণে নিজের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং নিবারণ করার জন্য অবিরত প্রয়াস করতে থাকে। আর যা কিছু কারণ সে খুঁজে পায় তা সমাধান করে দেখে নেয়। যদি সমাধান হয়ে যায় তাহলে নিজের জীবনে তা ব্যবহার করার চেষ্টা করে। যতদিন পর্যন্ত তার থেকে উত্তম সমাধান খুঁজে না পায়। একেই তো ব্যবস্থা বলে। এইভাবে সে অবিরত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য দুঃখ নিবারণ করার কারণ অনুসন্ধান করতে থাকে এবং সেসব প্রয়োগ করে দেখতে চায়। এইভাবে ব্যবস্থাগত বিকাশ চলতে থাকে। এতেই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষ ব্যবস্থা ছাড়া থাকতে চায় না। অন্তঃকরণে স্বাভাবিক চেতনা থাকার ফলে ব্যবস্থা ছাড়া সুখী জীবন-যাপন সম্ভব নয়। এরপরও যদি কেউ ব্যবস্থা ছাড়া জীবন-যাপন করে দেখতে চায় তাহলে সে বুঝতে পারবে আমি যা বলছি তাই-ই সঠিক। ব্যবস্থা বিহীন জীবন-যাপন হলে আমরা কীভাবে দুঃখে জর্জরিত হতে থাকব। আসুন এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে নিই। যদি আমরা প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করি তবে দেখতে পাব এখানে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যাদের আমরা সরাসরি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। যদি আহার সামগ্রিকে বাদ দিয়ে ধরা হয়। আহারের মধ্যেও ফল, ফুল, পাতা ইত্যাদি খুব একটা সুস্বাদু নয়, এটি ঠিক যে এদের সাহায্যে বেঁচে থাকা যেতে পারে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়। আমরা সকলে নানা প্রকারের সুখ উপভোগ করতে চাই যা সরাসরি প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত করতে পারি না। তাদের সৃজন করে নিতে হয়। সেজন্য কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি

ইত্যাদি বিকশিত করে নিতে হয়। এইভাবে একটি শৃঙ্খলার নির্মাণ হয়ে যায়— জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ। জ্ঞান ছাড়া কর্মের সার্থকতা নেই। জ্ঞানকে বাদ দিয়ে যদি কোনো কর্ম করা হয় তবে তার পরিণাম ভাল অথবা মন্দ যা কিছু আসতে পারে। অর্থাৎ সুখও আসতে পারে অথবা দুঃখও আসতে পারে। এইজন্য প্রথমে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন হয়। যার ফলে আমরা জানতে পারি কীভাবে কর্ম সম্পাদন করলে নিশ্চিতভাবেই আমাদের ঈপ্সিত ফল দেবে, যা ভোগ করে সুখী হতে পারব। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে জ্ঞান ছাড়া কর্মের কোনো সার্থকতা থাকে না এবং কর্ম ছাড়া কোনো ভোগ নির্মাণ হয় না। আর ভোগ ব্যতীত আমরা সুখী হতে পারব না। অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ অনুযায়ী আমাদের ব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হবে। কেননা ব্যবস্থা না থাকলে যা কিছু আমরা অনুসন্ধান করব তা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। তা না হলে সকলকে সেই জ্ঞান বারবার অনুসন্ধান করতে হবে। বারবার যেন খুঁজতে না হয় সেইজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। একইভাবে কর্মের বিভাজনের জন্য কর্মসংস্থান বিতরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর কর্মসংস্থানের ফলাফল অনুযায়ী যে ভোগের নির্মাণ হয় তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। আশা করি আমরা বুঝে গিয়েছি যে মানুষের কেন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আমরা ব্যবস্থা ছাড়া ঈপ্সিত জীবন-যাপন করতে পারব না। ব্যবস্থা ছাড়া কোনোপ্রকার সুখসুবিধা উৎপাদন করা শুধু কঠিন নয় অসম্ভবও বটে। সুখসুবিধা ছাড়া জীবনে কোনোপ্রকার আত্মনির্ভরতা, স্বতন্ত্রতা অথবা স্বাধীনতা ফলিত হয় না। যখন জীবনের উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না তখন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজস্বতা, স্বতন্ত্রতা, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদির প্রশ্নই বা ওঠে কি করে? আমরা প্রথমে এইসব শব্দগুলিকে বোঝার চেষ্টা করি। নিজস্বতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিগত স্তরে স্বাধীনতা। অর্থাৎ মানুষ কি খেতে চায়, কি পরিধান করতে চায়, কি শিখতে চায়, কি কর্ম করতে চায়, কীভাবে চলতে চায় ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপসমূহ। যা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর সরাসরি কোনো প্রভাব ফেলে না। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের জীবনে কারোর থেকে কোনো প্রকারের অবরোধ চায় না। দ্বিতীয় শব্দ হচ্ছে স্বাধীনতা। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত স্তরে আপনার সবকিছু করার অধিকার আছে যা থেকে নিজে সুখী হওয়া যায় অন্য কাউকে দুঃখ না দিয়ে। এইসব বিষয়গুলি নিজস্বতার মধ্যে পড়ে। এবার তৃতীয় শব্দ হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। এর অর্থ হচ্ছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা যখনই কিছু চাইব সময়মত পেয়ে যাব। এমনটি হলে আমরা আত্মনির্ভরতা অনুভব করি। চলুন এবার দেখা যাক ব্যবস্থা ছাড়া এসব সম্ভব হবে কিনা।

হিন্দিতে একটি প্রচলিত কথা আছে যে 'নাঙ্গা নাহায়েগা কেয়া অউর নিচোড়েগা কেয়া', (যে নিঃস্ব তার কাছ থেকে আর কি সাহায্য পাব)। প্রথমত— ব্যবস্থা ছাড়া সমাজে কোনো সুখসুবিধা উৎপন্ন হয় না যা আপনি ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত— সামান্য কিছু সুখসুবিধা নিজের ক্ষমতায় অর্জন করলেও অন্য কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি এসে সেই সুখসুবিধাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কেননা যখন কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না তখন তাদের কে বাধা দেবে এবং তারা কীসের ভয়ে ছিনিয়ে নিতে আসবে না? দলগত গোষ্ঠী বা তার পূর্বের কথা আমি বলছি যেখানে মানুষ জঙ্গলে একা অথবা খুব ছোট দলের মধ্যে বসবাস করত। যদিও ছোট দলের কথা উল্লেখ করার অর্থও হচ্ছে একটি ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া। কেননা যখন মানুষ অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন কোনো নীতিনিয়ম ছাড়া তা জীবন-যাপন সম্ভব হয় না। ধরে নিই— উক্ত দলে বিশেষ কোনো নীতিনিয়ম প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু ইতিহাসে আপনারা পড়েছেন যে পূর্বে একটি দল অন্য দলের সবকিছু ছিনিয়ে নিত অথবা ক্রীতদাস বানিয়ে নিত। তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ব্যবস্থা ছাড়া কোনো নিজস্বতা, স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা সম্ভব নয়। এবার দেখি যে এইসব ব্যবস্থার অধীনস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা। ব্যবস্থা তো দু-প্রকারেরই হয়— পর্যাপ্ত বা সঠিক ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত বা ভ্রষ্ট ব্যবস্থা। তাহলে মন্দ অথবা অপর্যাপ্ত ব্যবস্থায় তো সকল স্বাধীনতা একটি সীমা অবধি থাকে এবং সেই সীমার পর মনে হবে যেন কোনো স্বাধীনতাই নেই। যেমন বর্তমান সময়ে চলমান ব্যবস্থা একটি অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রষ্ট ব্যবস্থার মধ্যে একটি।

এবার একটি উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। বর্তমান ব্যবস্থার সংবিধানে লেখা রয়েছে যে শিক্ষা গ্রহণে সকলের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে কি সকলে সেই অধিকার পাচ্ছে? আমরা সকলে জানি যে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আসুন বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমত— সংবিধানে যখন লেখা রয়েছে তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে তেমনটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এর প্রথম কারণ হিসেবে দেখা যায় যে বাস্তবে সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিদ্যালয় স্থাপনই করেনি যেখানে সকলে শিক্ষার সমান অধিকার পেতে পারে। দ্বিতীয়ত— সকলের তো সুনিশ্চিত কোনো রোজগার নেই যার মাধ্যমে তারা প্রাইভেট স্কুল থেকে এই অধিকার প্রাপ্ত করতে সক্ষম হবে। এবার সরকারকে জিজ্ঞেস করুন তারা কেন পর্যাপ্ত বিদ্যালয়, শিক্ষক ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারছে না? এক্ষেত্রে সরকার বলবে তাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই যার দ্বারা সরকার সকল সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করতে পারে। এতে তো তাহলে সংবিধানের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। অর্থ এই দাঁড়ায় যে সকল সুখসুবিধা অর্থের দ্বারাই প্রাপ্তি হয়। তাহলে আপনি বলুন যতদিন অবধি সমস্ত জনগণ আর্থিক দিক দিয়ে একসমান না হবে ততদিন অবধি একসমান অধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হবে? তৃতীয়ত— সরকার যখন বলছে অর্থের মাধ্যমেই সম্ভব হবে, সরকার তবে এমন নীতি কেন প্রণয়ন করছে না যার মাধ্যমে অর্থের যেন অভাব না হয়? বর্তমান সমাজে তো ধনী এবং দরিদ্র দুইই বিদ্যমান রয়েছে। আর্থিক অসমানতার কারণে কখনই

কোনো অধিকার সমানভাবে সকলের জন্য উপযোগী হতে পারবে না। অপরদিকে সংবিধানেও এমন কোনো বিধান নেই যার দ্বারা সুনিশ্চিত করা যায় যে সকল নাগরিক আর্থিকভাবে একসমান হতে পারে। সংবিধান তো বলছে সকলের একসমান শিক্ষা পাওয়া উচিত। কিন্তু এটি তো বলতে পারছে না এই সুবিধা পাবে কীভাবে এবং কীভাবে এই সুবিধা সকলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যেন সকলে সমানভাবে তা গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য আমি একে অসম্পূর্ণ সংবিধান বা অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা বা বিষমবিধান বলছি। যা একদিকে বলছে সকলের সবকিছু তে সমান অধিকার থাকবে কিন্তু অপরদিকে এটি বলছে না কীভাবে তা সম্ভব হবে। যেভাবে পাওয়া যাবে বলছে সেভাবে বাস্তবে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ উল্টো হয়ে যাচ্ছে। সমতার উৎপন্ন হচ্ছে না বিষম অবস্থা উৎপন্ন হচ্ছে। এই কারণে আমি এটিকে ভ্রষ্ট ব্যবস্থা বলছি। এইজন্য সকলে তাদের নিজস্বতা, স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট সীমা অবধিই গ্রহণ করতে পারছে। এই সীমাও আবার সকলের জন্য একসমান নয়। এবার কথা হচ্ছে এই নিজস্বতা, স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ইত্যাদি কি একটি সঠিক ব্যবস্থায় প্রাপ্ত করা যেতে পারে? অথবা তা কি শুধুমাত্রই এক কল্পনা? হতে পারে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় সামান্য কিছু ব্যক্তি কিছু অধিকার পাচ্ছে। যদি সামান্য কিছু ব্যক্তি পেতে পারে তবে সকলে নয় কেন? উপরে আপনি তো সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা অধ্যয়ন করে দেখেছেন যেখানে বলা হয়েছে বাস্তবিক ক্ষেত্রে সকল অধিকার এবং সুখসুবিধা সকলের জন্য সমানভাবে রয়েছে। কীভাবে সকলে আর্থিকভাবে একসমান হবে তারও ব্যবহারিক সমাধান প্রদান করা হয়েছে। এবার আমরা বুঝে গিয়েছি কোনো ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সকলের জন্য সকল প্রকার অধিকার প্রদান করা। এবার এটি ভিন্ন বিষয় যে কোন ব্যবস্থা কতটা অধিকার কতজনের মধ্যে কতটা সীমা অবধি সহজলভ্য করাতে পারে। কোনো ব্যবস্থা ছাড়া তা অসম্ভব।

প্রশ্ন ২ ।। ব্যবস্থা যাচাই করার মাপকাঠি কি হওয়া উচিত?

উত্তর ।। যেমনটি আমরা উপরে আলোচনা করেছি যে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার ঈপ্সিত সুখ ভোগ করা এবং সে জন্যই ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর সুখই হবে ব্যবস্থাকে যাচাই করার মাপকাঠি। আমরা যা কিছু করব সেইসব থেকে যদি সার্বিকভাবে সুখ উৎপন্ন হতে থাকে তবে তাকে আমরা একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বলব। নাহলে আমরা তাকে একটি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাই বলব। অসম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে ততদিন অবধি সংশোধন করে যেতে হবে যতদিন উদ্দেশ্য পূরণ না হয়। তাহলে কোনোকিছুর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেই বিষয়কে যাচাই করার সঠিক মাপকাঠি। তাই সুখের মাপকাঠি হবে সঠিককে জানা,

একইসঙ্গে ভ্রান্তিকে জানা। যদি কোনোকিছু করে আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয় তাহলে সঠিক আছে বলা হবে অন্যথায় ভ্রান্ত বলা হবে।

প্রশ্ন ৩ ।। ব্যবস্থার মূল আধার কী?

উত্তর ।। ব্যবস্থার মূল আধার হচ্ছে যেখান থেকে কোনো ব্যবস্থা প্রারম্ভ হয়। জীবনের পরম উদ্দেশ্য কী এটি জানার পরই ব্যবস্থা প্রারম্ভ হয়। এবার পরম উদ্দেশ্য তো আমরা জেনে গিয়েছি। তা হল জীবনের সকল প্রকার ঈপ্সিত সুখ প্রাপ্ত করা। এটিও জেনে গিয়েছি যে তিন প্রকার সুখ জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগের মাধ্যমেই প্রাপ্তি করা সম্ভব। তাহলে জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ মানুষের ইচ্ছে অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে। জ্ঞান প্রথমে দর্শন দ্বারা প্রাপ্ত হয়। নির্মাণ এবং বিতরণের কর্মও অর্থশাস্ত্র মাধ্যমে খুবই সরলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। তাই অর্থশাস্ত্রকে অবশ্যই সঠিক হতে হবে। তবেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্মাণ এবং বিতরণ সম্ভব হবে। এই প্রকার অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে আপনি পূর্বেই অধ্যয়ন করে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে বলতে পারেন দর্শন শাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র থেকেই এটি প্রারম্ভ করা যেতে পারে। সঠিক দর্শনশাস্ত্র এবং সঠিক অর্থশাস্ত্র ছাড়া তা সম্ভব নয়। সংবিধানে বা পুস্তকে যতই আমরা মধুর ভাষায় নিয়মনীতি লিখে দিই না কেন। সঠিক অর্থশাস্ত্রই বাস্তব জীবনে আমাদের সকল সুখসুবিধার নির্মাণ করতে পারে এবং যথোচিত বিতরণ করতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি কোনো ব্যবস্থার মূল ভিত হচ্ছে তার অর্থশাস্ত্র। এরপর আসে দর্শনশাস্ত্র। যেখানে দর্শনশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র এই দুটি দিক সঠিক রয়েছে সেখানে আমাদের ঈপ্সিত জীবনের প্রাপ্তি স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হয়ে যাবে। এই দুটিই হচ্ছে মূল বিষয় অথবা বলা যায় মূল দর্শন। কেননা যেমন দর্শন হবে তেমন প্রকারের অর্থশাস্ত্র তৈরি হবে।

প্রশ্ন ৪ ।। কোনো ব্যবস্থায় দর্শনশাস্ত্রের গুরুত্ব কী? মানুষের ব্যবহারিক জীবনে দর্শনশাস্ত্রের উপযোগিতাই বা কোথায়?

উত্তর ।। যে কোনো ব্যবস্থায় জীবন দর্শনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের পরম উদ্দেশ্য কী— এই কথা জীবন দর্শন ছাড়া জানা সম্ভব নয়। জীবন দর্শনই নিশ্চিত করে দেয় যে আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য কী? অথবা কোনো উদ্দেশ্য আছে কী নেই, যদি থাকে তাহলে তা কী? জীবন দর্শনের অধ্যয়ন ছাড়া ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাবনা সম্ভব নয়। সঠিক পথই যখন না জানব তখন কোনদিকে অগ্রসর হব? একটি সঠিক জীবন দর্শন থাকলে এটিকে আরও সহজ সরলভাবে বোঝা সম্ভব যে— আমরা কেমন জীবন-যাপন

করছি এবং তার কি পরিণাম আসবে। অর্থাৎ পরিণাম সম্পর্কে শুরু থেকেই জানতে পারা যায়। ফলে আমাদের যেমন পরিণাম পাবার ইচ্ছে তেমন জীবন-যাপন আমরা উপভোগ করতে পারি এবং সেইমত ফলাফল প্রাপ্ত করতে পারি। এতে জীবনে এক নিশ্চয়তা থাকে। জীবনের দিশাকে নিশ্চিত করার জন্যই জীবন দর্শনের স্থান সর্ব প্রথমে রয়েছে। আমরা শুনেছি যে ধর্মগ্রন্থগুলিতে সকল দুঃখের মূল কারণ সম্পর্কে নিশ্চিৎ করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ মূল কারণ আজ্ঞাত রয়েছে। জীবন দর্শন এই অজ্ঞানকেই প্রকাশিত করে দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে— যদি কোনো সমাজ দুঃখী অবস্থায় থাকে তবে তার অর্থ ধরে নিতে পারি যে সেই সমাজের কাছে সঠিক জীবন দর্শনের অভাব রয়েছে। যেমন দর্শনশাস্ত্র হবে তেমন দিশা হবে, যেমন দিশা হবে তেমনই দশা হবে। সেইজন্য যে কোনো অবস্থার জন্য দর্শনশাস্ত্রই হচ্ছে মূল আধার। সঠিক দর্শনশাস্ত্র থাকলে পরিস্থিতি সঠিক হবে, ভ্রষ্ট দর্শনশাস্ত্র হলে পরিস্থিতি ভ্রষ্ট হবে। জীবনের দশাই হচ্ছে মূল কষ্টিপাথর। এটি জানার জন্য সর্বপ্রথমে দেখতে হবে— আমাদের কাছে যে দর্শনশাস্ত্র রয়েছে তা সঠিক না ভ্রষ্ট।

প্রশ্ন ৫ ।। বর্তমান অর্থব্যবস্থা অথবা পুঁজিবাদে কী দোষ রয়েছে?

উত্তর ।। পুঁজিবাদের দোষ তো উন্মোচিত হয়েই গিয়েছে। সেখানে আর্থিক অসমানতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোষ। যার ফলে অবশিষ্ট সব দোষগুলি আপনিই চলে আসে। এই আর্থিক অসমানতার কারণে সমগ্র সমাজ নির্ধন এবং ধনবান এই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নির্ধন নিজের ইচ্ছেমত বস্তু বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে না, যার ফলে বাজারে সর্বদাই চাহিদার অভাব তৈরি হয়। চাহিদার অভাবের কারণে নির্মাণেও অভাব থেকে যায়। যার পরিণামস্বরূপ প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান উৎপন্ন হতে পারে না। সমাজে বেকারত্ব তৈরি হতে থাকে। বেকারত্বের কারণে শ্রমের মূল্য কমে যায়। ফলে নির্ধন অধিক নির্ধন, ধনবান অধিক ধনবান হয়ে যায়। এমনকি ধনীদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে এবং নির্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আপনি বর্তমান সময়েও দেখছেন যে ৮০ শতাংশ সম্পদের উপর কেবলমাত্র ১ শতাংশ লোকের দখলদারি রয়েছে। অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ মানুষ কেবলমাত্র ২০ শতাংশ সম্পদ নিয়ে কোনো প্রকারে জীবন-যাপন করছে। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে পুঁজিবাদে না দরিদ্ররা সুখী রয়েছে না ধনীরা। দরিদ্রদের একরকম দুঃখ রয়েছে এবং ধনীদের আরেকরকম দুঃখ রয়েছে। যেমনটি পুঁজিবাদের নাম থেকেই আপনি বুঝতে পারছেন যে এই প্রকার ব্যবস্থায় যার কাছে অধিক পূঁজি রয়েছে তিনিই যে কোনো সীমা অবধি ইচ্ছেমত যা খুশি করার

স্বাধীনতা পেয়ে থাকেন। কোনোকিছু কিনতে চাইলে পূঁজির প্রয়োজন, কোনো কর্ম করতে চাইলে পূঁজির প্রয়োজন, কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে পূঁজির প্রয়োজন, চিকিৎসা করাতে চাইলেও পূঁজির প্রয়োজন হয়। যাদের কাছে পূঁজি নেই তাদের কাছে কোনোকিছু করার স্বাধীনতাও নেই। না তারা কিছু কিনতে পারেন, না কিছু করতে পারেন, না কিছু শিখতে পারেন, না সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। কোনো প্রকারে কিছু একটা শিখে নিলেও তারা আয়ের পথ তৈরি করতে পারে না। তারা সামান্য কিছু আয়ের ব্যবস্থাই শুধুমাত্র করতে পারেন এবং সেই সামান্য আয় দিয়ে সামান্য কিছু ভোগ্য বস্তু ক্রয় করে কোনোরকমভাবে জীবিত থাকেন। তারা যেন মানুষ নন মেশিন। কর্ম করার জন্য যেন তাদের সামান্য কিছু রসদ যোগান হলেই হল। ফলে মেশিন এবং সামান্য উপার্জনকারী মানুষদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা দুজনের জীবনের পার্থক্য ভিন্নভাবে বোঝা যায় না। বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক চরম সীমায় উপনীত হয়ে রয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যাদের হাতে পূঁজি রয়েছে তাদের হাতেই সমস্ত সম্পদের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। কেবলমাত্র প্রাকৃতিকভাবে সম্পদই নয় মানব সম্পদের নিয়ন্ত্রণও সামান্য কিছু মানুষের হাতে চলে যায়। তারাই নিজেদের ইচ্ছেমত সবকিছু ব্যবহার করে। যাদের কাছে পূঁজি কম থাকে অথবা থাকে না তারা কোনো না কোনো দুর্নীতির পথ খুঁজতে শুরু করে। যার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অপরাধের সৃজন হতে থাকে। ধীরে ধীরে এই অপরাধ সামগ্রিক রূপ ধারণ করে নেয়। ফলে তারা সমাজবিরোধী হতে শুরু করে। সমাজের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে থাকে। অবশেষে দুর্নীতি এবং অপরাধ সমাজের এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়। যখন তা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তখন মানুষ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। যেন কোনোভাবে অপরাধ কিছুটা কমানো যেতে পারে। কিন্তু সমাপ্ত করতে পারে না। এইভাবেই জীবন চলতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সঠিক চাহিদা কখনই জানা যায় না, কেননা কার কাছে কতটা পূঁজি রয়েছে এবং সেই পুঁজিকে সে কোন মনোভাব নিয়ে খরচ করতে চায় তা জানতে পারা যায় না। যে কারণে একটি ধারণার ভিত্তিতে অনুমান করে নেওয়া হয় এবং উৎপাদন করা হয়। এরপর আঞ্চলিক ব্যবসায়ীরাও অনুমানের ভিত্তিতেই বস্তু এনে গুদাম ঘর ভরে নেয়। বস্তুসামগ্রী দোকানে ভরে রেখে গ্রাহকের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। কখনো তো দোকানদার সারা দিন দোকানে বসে থাকা সত্ত্বেও কোনো গ্রাহক আসে না। এইভাবে অনেক ব্যবসায়ী কিছু মাস পর নিজের জমানো সকল পূঁজি দোকানের ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদিতে খরচ করে ফেলে এবং বিপুল ক্ষতির ভারে হতাশ হয়ে ব্যবসা ছেড়ে দেয়। এইভাবে আপনারা কত মানুষকে নিজেদের পূঁজি হারাতে দেখেছেন। যেমন আমরা প্রায়ই খবর শুনি যে অমুক স্থানে কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কৃষক তার সমস্ত পূঁজি নিজের চাষের কাজে খরচ করে ফেলে। তারপর বিভিন্ন কারণে তাদের লোকসান হয়ে যায়। যেমন খরা দেখা দেয়, বন্যা এসে যায়, ফসলে

পোকা ধরে যায় অথবা বাজারে ফসলের উচিত মূল্য পাওয়া যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর আর কোনো পূঁজি কৃষকের কাছে থাকে না। এই দুশ্চিন্তায় তারা আত্মহত্যাই একমাত্র পথ হিসেবে দেখতে পায়। কোনো পূঁজি ছাড়া কীভাবে তারা পরিবারের দায়িত্ব পালন করবে? মানুষ একসময় চুরি, ডাকাতি, ঠকবাজি, দুর্নীতি, অপহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উপায় বের করেই নেয়। এতে সমাজে আরও সমস্যার জন্ম দিতে থাকে। সরকার নিজের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেও তা বন্ধ করতে পারে না। এদের নাহয় ছেড়েই দিলাম। নির্বাচিত পদে আসীন ব্যক্তিরাও নিজেকে দুর্নীতি করা থেকে বিরত রাখতে পারে না। কেননা তাদেরও তো প্রতি ৫ বছর পর পর নির্বাচনে দাঁড়াতে হয় এবং মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়। সেই অর্থ আইনি পথে ফেরত পাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। যাদের থেকেই অর্থ নিচ্ছে নিজেদের লাভের জন্যই নিচ্ছে কারণ সরকারকে নীতিনিয়ম তৈরি করতে হয়। যদিও তার পরিণাম এই দাঁড়ায় যে ধনবানরা অধিক ধনবান হয়ে যায় আর নির্ধন হয়ে যায় আরও নিঃস্ব। এই দুষ্ট চক্র আপন গতিতে আবর্তিত হতেই থাকে। মানুষ বদলে যায় সরকার বদলে যায়, ব্যবস্থা কিন্তু বদলায় না। কেননা অর্থশাস্ত্র যে বদলায় না। ভ্রষ্ট পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণেই এমনটি চলতে থাকে। যে নতুন অর্থশাস্ত্র আমি উপরে বর্ণনা করেছি তা তো আপনি অধ্যয়ন করে নিয়েছেন। ফলে আপনি বুঝে গিয়েছেন যে কেবলমাত্র সঠিক অর্থশাস্ত্রই হচ্ছে সঠিক ব্যবস্থার মূল ভিত। সঠিক অর্থশাস্ত্রের কারণেই সম্পদ নির্মাণ ও বিতরণ সঠিকভাবে সম্পাদন হতে পারে। পুঁজিবাদের দোষ নিয়ে বহু পুস্তক রচিত হয়েছে যা অধ্যয়ন করে আপনি তার ত্রুটি সম্পর্কে গভীরভাবে জেনে নিতে পারেন। জগতে এখনও পর্যন্ত এমনতর অর্থশাস্ত্র বিদ্যমান রয়েছে, কেননা এখনও পর্যন্ত সঠিক অর্থশাস্ত্র কেউ সৃজন করেনি। আমি কিন্তু একটি সঠিক অর্থশাস্ত্রের সৃজন করে দিয়েছি। এবার এই ভ্রষ্ট পুঁজিবাদের প্রভাবে নির্মিত অর্থশাস্ত্র থেকে মুক্তি মিলবে এবং সুখী জীবনের প্রাপ্তি হবে।

প্রশ্ন ৬ ।। আপনি সকলকে সমান আয়ের শ্রেণীতে কেন রেখেছেন?

উত্তর ।। ন্যায় অনুসারে সম্পূর্ণ সমাজে আয়ের একটিই মাপদন্ড থাকা উচিত। কেননা আয়ই আমাদের জীবনের মূল্যকে বাস্তবে রূপ দিতে সাহায্য করে। কোনো ব্যক্তির আয় কম হলে তার জীবনের মূল্যও অপেক্ষাকৃত হীন হয়ে থাকে। অসমান আয়ের ফলে সকল প্রকার সমস্যা উৎপন্ন হয়, ফলে সকলেই বিভিন্ন দুঃখে জর্জরিত থাকে। এছাড়া আমরা যদি অন্য কোনো ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে দিই তাহলেও স্বল্প বা অধিক আয়ের কারণে আর্থিক অসাম্যই সৃষ্টি হবে। অধিক মাত্রায় অপরাধ উৎপন্ন হবে এবং জীবন দুঃখে

জর্জরিত হয়ে পড়বে। যা কেউ চায় না। এইজন্য নতুন ব্যবস্থায় সকলকে সমান আয়ের শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। কারোর কাছে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো উপায় থাকলে আপনাকে স্বাগত এবং আমায় অবশ্যই সেই বিষয়ে অবগত করাবেন।

প্রশ্ন ৭ ।। যারা সাধারণ কর্ম করবে তাদেরকেও তো সমপরিমাণ আয় প্রদান করা হবে। তাহলে যে সকল ব্যক্তিরা অত্যন্ত্য কঠিন পরিশ্রম করবে তাদের সাথে কি অন্যায় করা হবে না?

উত্তর ।। উপরে আপনি নিশ্চয়ই অধ্যয়ন করে নিয়েছেন যে আর্থিক অসমতার কারণেই মূলত সমাজে নানা প্রকারের অপরাধ উৎপন্ন হতে থাকে। যার পরিণামস্বরূপ দরিদ্রতা, দাসত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুর্নীতি, চুরি এবং সকল প্রকার অপরাধের জন্ম হতে থাকে। ফলে আমাদের জীবন নানা প্রকার দুঃখে জর্জরিত হয়ে যায়। জীবনের দুঃখদায়ী পরিস্থিতি কেউ চায় না। এই কারণেই নতুন ব্যবস্থায় সকলের আয়কে একসমান রাখা হয়েছে। ফলে সকলে আর্থিক দিক দিয়ে সমানরূপে সমৃদ্ধশালী হতে পারবে এবং সকলের জীবনের মূল্যও সমান হবে। সকলের জন্য সমস্ত সুখসুবিধা সমানরূপে উপলব্ধ হবে। ফলে যার যেমন সুখসুবিধা প্রয়োজন তিনি তা গ্রহণ করে সুখী হতে পারবেন এবং সমাজে সহযোগিতা, সত্য, প্রেম, ন্যায়, পুণ্য ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হতে থাকবে। পরিণামস্বরূপ সমস্তরকম ভৌতিক, দৈবিক এবং আধ্যাত্মিক সুখের প্রাপ্তি হতে থাকবে। জীবনের পরম উদ্দেশ্যও তাই এবং আমরা সকলেই তাইই চাই। বর্তমান ব্যবস্থায় অসমান আয় থাকার কারণে ৯০% মানুষ উচ্চ মূল্যের বস্তু এবং সুখসুবিধা কখনোই সমানভাবে উপভোগ করতে পারবে না। নতুন ব্যবস্থায় সমান আয় এবং সমান সুখসুবিধার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ব্যবস্থাকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য। এই মূল্যাংকন বা মুদ্রা গণনার সাথে কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকবে না। যাদের যা কিছু প্রয়োজন হবে তা তো সামঞ্জস্যরূপে সকলে পেতেই থাকবে। এই প্রকার গণনা থাকার কারণে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সুখসুবিধার অপব্যবহার করতে পারবে না। একসমান আয় অথবা সুখসুবিধার গণনা কেবলমাত্র সরকারের হিসেব নিকেশের জন্যই থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে এই হিসেব নিকেশের বিশেষ গুরুত্ব থাকবে না। এটি কেবলমাত্র ব্যবস্থাকে সহজ-সরল, স্পষ্ট এবং অপব্যবহারমুক্ত করবে। আমাদের সকলের জীবনে সমস্ত সুখসুবিধার গুরুত্ব তো সমানই থাকে। কোনো ব্যক্তি কখনোই এমনটি চাইবেন না তার জীবনে কোনোপ্রকার সুখসুবিধার অভাব থাকুক এবং ফলস্বরূপ কোনো দুঃখ বয়ে চলুক। তাহলে গুরুত্বের দিক দিয়ে সমস্ত কর্মসংস্থান সমান হবে কেননা আমরা এমনটি কখনোই বলতে পারি না আমাদের জীবনে খাদ্যের গুরুত্ব অধিক নাকি আবাসের, বস্ত্রের গুরুত্ব অধিক নাকি অন্য

কোনো বস্তু অথবা পরিষেবার। কেননা সবকিছু থেকেই আমরা সুখ পেয়ে থাকি। এতে তো অন্য কারোর সাথে কোনো প্রকারের অন্যায় করা হচ্ছে না। সকলেই চায় তাদের জীবন সুখী হোক। যদি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সম্ভব হয় তবে আমরা কি করে বলব এতে কারোর সাথে কোনো অন্যায় করা হচ্ছে? কেননা তারা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী কর্মসংস্থান পাচ্ছে। তবে তো প্রকৃতপক্ষে ন্যায় বিচারই করা হল। একই কর্মসংস্থান কারোর পক্ষে সহজ আবার কারোর পক্ষে কঠিন হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারিং কারোর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কর্ম হতে পারে আবার কারোর পক্ষে তা 'বাঁ হাতের খেল' অর্থাৎ খুবই সহজ হতে পারে। যখন সকলেই তাদের জীবনের সকল প্রকার সুখসুবিধা সমান হারে পেতে থাকবে তাহলে খামোখা কেউ এমনটি কেন মনে করবে তার সাথে কোনোপ্রকার অন্যায় করা হচ্ছে? বরং অন্যায় তো বর্তমান ব্যবস্থায় করা হচ্ছে, কারণ পৃথিবীতে বিপুল ধনসম্পদ থাকার পরও এমন জীবন উপভোগ করা যাচ্ছে না যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সুখী বলা যাবে। বলতে পারা যাবে সকলের জীবনে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি রয়েছে। এই আন্যায় যুগ যুগ ধরে চলে আসছে যা এখনও হয়ে চলছে।

প্রশ্ন ৮ ।। এটি এমন এক ব্যবস্থা যা সকলকে সমস্তকিছু অতি সহজেই প্রদান করবে। এমন ব্যবস্থায় মানুষ অলস হয়ে পড়বে না তো? মানুষ কঠিন পরিশ্রম কেন করতে চাইবে?

উত্তর ।। প্রথমত— এই ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি নিজের উচিত কর্ম সম্পাদন করবে না সেই ব্যক্তি এই ব্যবস্থা থেকে কোনোপ্রকার সুখসুবিধা প্রাপ্ত করতে পারবে না। নতুন ব্যবস্থায় এই শর্ত থাকার ফলে কারোর অলস হবার কোনো সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত— সকলেই তাদের প্রথম অথবা দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী কর্ম অথবা জীবিকা পেয়ে যাবে, সেটিও প্রতিদিন মোটামুটি ৫ ঘণ্টা সময়ের জন্য। সপ্তাহে ৫ দিন কর্ম করতে হবে। যেখানে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত কর্ম সম্পাদনের ফলে সকলেই সুখ প্রাপ্তি করবে। যেমন ভোগ থেকে সুখ পাওয়া যায় তেমনি কর্ম এবং জ্ঞান অর্জনেরও নিজস্ব সুখ রয়েছে, যদি সেই কর্ম আমাদের পছন্দের হয়। এই কারণে জীবনে আলস্যতার ভাব থাকবে না। তৃতীয়ত— সেইসময় সকলে এই ব্যপারে অবগত থাকবে যে তারা যদি নিজেদের কর্ম সঠিকভাবে সম্পাদন না করে তবে সকলের প্রয়োজনীয় বস্তু অথবা পরিষেবা তৈরি হবে না, নিজেরাও সুখসুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না যা সকলে পেতে চায়। এই কারণেও মানুষ নিজেদের কাজে অলসতা দেখাবে না। আরেকটি কথা নিজের তরফ থেকে বলতে চাই— আমি অধ্যয়ন এবং উপলব্ধি করে বুঝেছি যে জগতে কোনো মানুষই অলস হয় না। ভ্রষ্ট ব্যবস্থার কারণেই আমাদের জীবনে অলসতা উৎপন্ন হয়। উদাহরণ হিসেবে ধরে

নিন আপনার রসগোল্লা পছন্দ নয় কিন্তু রসমালাই পছন্দ। এবার যদি আপনাকে রসগোল্লা খেতে দেওয়া হয় তাহলে আপনি কি রসগোল্লা খাবেন? যে কেউ এর উত্তরে বলবে, আমি খাবোনা। তবে কি এই কথাকে আমরা এভাবে কখনও বলব, আপনি রসগোল্লা খাবার ক্ষেত্রে খুব অলস? অবশ্যই তা বলব না। কিন্তু যদি আপনাকে রসমালাই খেতে দেওয়া হয় তবে কি আপনাকে বলে দিতে হবে, ভাই রসমালাই খেয়ে নিন? তা বলতে হবে না বরং আপনি আনন্দের সাথে রসমালাই খেয়ে নেবেন এবং আমাকে ধন্যবাদও জানাবেন। তাহলে এই উদাহরণ অনুযায়ী আপনি কি বলবেন, আপনি রসমালাই খাবার বেলায় অত্যন্ত কর্মঠ? একথা বলবেন না। মুখ্য কথা হচ্ছে পছন্দ নিয়ে, অলসতা নিয়ে নয়। যদি কোনো ব্যবস্থা আমাদের পছন্দের কর্ম প্রদান করে এবং তাও আবার সমান পারিশ্রমিকের সাথে তবে তো অলসতার কোনো প্রশ্নই উদয় হয় না। অলসতা কেবলমাত্র অপছন্দের কাজের ক্ষেত্রেই তৈরি হয়। আর স্বভাববশত কোনো মানুষই অলস হয় না। সকল মানুষ সুখ পেতে চায় এবং পছন্দের কর্ম সম্পাদন করতে চায়। কর্মেরও নিজস্ব সুখ রয়েছে যা সকলেই গ্রহণ করতে চায়। কোনো কর্মই কঠিন অথবা সহজ হয় না। কথা হচ্ছে পছন্দ, যোগ্যতা, সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সঠিক রয়েছে কিনা তা দেখা। একই কর্ম কারোর জন্য কঠিন হতে পারে আবার কারোর জন্য অত্যন্ত সহজ হতে পারে। যে কাজের প্রতি আমাদের ভেতরে রুচি, যোগ্যতা, সক্ষমতা থাকে সেই কর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায় এবং সুখ প্রদানকারী হয়ে যায়। এর বিপরীতে একই কর্ম কঠিন হয়ে যায় এবং দুঃখ প্রদানকারী হয়ে যায়। তাই নতুন ব্যবস্থায় সমস্তকিছু সরলই থাকবে।

প্রশ্ন ৯ ।। মানুষ অতিমাত্রায় সুখী হলে নিজেদের সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলবে না?

উত্তর ।। আসুন প্রথমে বুঝে নিই সংবেদনশীলতার অর্থ কি। একটি উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি। চলুন ক্ষুধাকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই। আমরা জানি কোনো মানুষ নিজের ক্ষুধার প্রতি যেমন সংবেদনশীল হয় তেমনি ভোজন গ্রহণ করার সময়ও সংবেদনশীল থাকে এই ভেবে যে ভোজন সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর কিনা, প্রয়োজনীয় মাত্রায় রয়েছে কিনা ইত্যাদি। এই হচ্ছে ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা। এবার দ্বিতীয় সংবেদনশীলতা হচ্ছে অন্যদের সম্পর্কে জানা— তারা ক্ষুধার্ত রয়েছে কিনা, যে ভোজন পরিবেশন করা হচ্ছে তাতে সকলে সুখী অথবা দুঃখী হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। কোন পরিস্থিতিতে কারা কেমন অনুভব করছে ইত্যাদি বিষয়ে জেনে নেওয়াকেই সংবেদনশীলতা বলা হয়। আর এটি সুখ-দুঃখ দুদিক থেকেই হয়ে থাকে। কেবলমাত্র দুঃখের ক্ষেত্রেই হয় এমনটি নয়। যেমন আপনার চোখ যদি সুস্থ্য থাকে তাহলে আপনি সকল প্রকার দৃশ্য ততটাই স্পষ্টভাবে

দেখতে পাবেন। ওই দৃশ্য সুখ প্রদানকারী হোক বা দুঃখপ্রদানকারী হোক। তাহলে আমরা বুঝলাম যে সুখ-দুঃখের সাথে সংবেদনশীলতার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং দেখতে হবে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ্য রয়েছে কিনা, যার মাধ্যমে আমরা কোনোকিছুর জ্ঞান অনুভব করি। সঠিক ব্যবস্থায় তো আপনি সর্বাধিক সুস্থ্য অবস্থায় থাকবেন। আমরা তো জানি সুখী মানুষই অধিক সুস্থ্য এবং অধিক সংবেদনশীল হয়। নতুন ব্যবস্থায় সকলে অধিক স্বাস্থ্যবান হবে এবং পরিণামস্বরূপ সংবেদনশীলতাও বাড়বে। অসুস্থ্য ব্যক্তি নিজের প্রতি সঠিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারে না। কেননা তার কোনো না কোনো অঙ্গ সঠিকভাবে কার্য করতে পারে না। যেমন জ্বর হলে মানুষের জিহ্বার স্বাদে সংবেদনশীলতা থাকে না। তখন সে ব্যঞ্জনের সঠিক স্বাদ সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। সুখ-দুঃখের সাথে নয়, বরং বাহ্যিক স্বাস্থ্য এবং অন্তঃকরণ বিকাশের সাথে সংবেদনশীলতার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ নিজের এই অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণের মাধ্যমে বিষয়কে ধারণ করে সুখ অথবা দুঃখকে অনুভব করে। তাহলে সংবেদনশীলতা আমাদের করণের উপর আশ্রিত রয়েছে, সুখ-দুঃখের উপর নয়। যেমন ছোট শিশুর অন্তঃকরণের বিকাশ না হবার কারণে তারা অন্যদের প্রতি সংবেদনশীল হয় না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের প্রতি সংবেদনশীল থাকে এবং বাহ্যকরণই শুধুমাত্র কর্মশীল থাকে। উপরে আপনি অধ্যয়ন করে নিয়েছেন যে অন্তঃকরণ বিকাশের জন্য শিক্ষাই হচ্ছে মূল ভিত্তি। যে মানুষ অন্যের সুখ থেকে যত সুখী হয় এবং অন্যের দুঃখ থেকে যত দুঃখী হয় তাকে ততটাই সংবেদনশীল বলা হবে। তাই সুখ-দুঃখ হচ্ছে সংবেদনশীলতার মাপকাঠি, কোনো করণসমূহের মাপকাঠি নয়। এমনটি নয় যে মানুষ সুখে কম সংবেদনশীল এবং দুঃখে অধিক সংবেদনশীল হয়। বরং মানুষ অন্যের সুখ-দুঃখ কতটা গভীরভাবে অনুভব করে তার উপরই সেই ব্যক্তির সংবেদনশীলতার গভীরতা বোঝা যাবে।

প্রশ্ন ১০ ।। কেবলমাত্র সুখ থাকলে আমাদের জীবন নীরস হয়ে পড়বে না? মানুষ সবকিছু পেয়ে গেলে আগামী ভবিষ্যতের জন্য কেনই বা আগ্রহী হবে এবং কীসেরই বা আশা করবে?

উত্তর ।। প্রথমে এটি বুঝতে হবে যে নীরস মূলত কী এবং কোন কারণে আমাদের ভেতর নীরসতা উৎপন্ন হয়। যখন কোনো ভোগ আমাদের সুখ প্রদান করে না তখন আমরা উক্ত ভোগের প্রতি নীরস হয়ে যাই। অর্থাৎ সেই ভোগকে পুনরায় উপভোগ করার ইচ্ছে হয় না। এই অবস্থাকেই নীরস হওয়া বলে। নীরস হবার অর্থ হচ্ছে যখন কোনো বিষয় থেকে রস উৎপন্ন হয় না। রস অর্থাৎ সুখ। যখন কোনো বিষয় থেকে সুখ প্রাপ্তি হচ্ছে না তখন আমাদের সেই বিষয়ে অরুচি আসে। যদি একই ঘটনা ভোগের ক্ষেত্রে ঘটে

অর্থাৎ জীবনের কোনো জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ থেকে রস না আসে বা সুখ উৎপন্ন না হয় তবে এমন অবস্থা নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতেই চাইব না। আর এমনটি হলে সেইসময় আমাদের চেতনাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন আমরা বর্তমান শরীর নিয়ে জীবিত থাকব না। ইচ্ছে ব্যতীত কোনো চেতনা সম্ভব নয়। নিদ্রা থেকে আমরা এইজন্য জেগে যাই কেননা আমাদের ভেতর ইচ্ছে রয়েছে। যদি কোনো ইচ্ছে না থাকে তবে আমাদের দেহে কোনো ব্যক্তিত্ব বা প্রাণ থাকবে না। শরীর নির্জীব হয়ে যাবে, অর্থাৎ ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। বলতে পারেন মৃত হয়ে যাবে, সজীব অবস্থায় থাকবে না। প্রাণ বা ব্যক্তিত্বই এই শরীরকে দিকনির্দেশ দিয়ে থাকে। যাকে কেন্দ্র করে শরীরের চেতন এবং অচেতন প্রক্রিয়াগুলি চলতে থাকে। যখন আমাদের ভেতর কোনো ইচ্ছে উৎপন্ন হবে না তখন আমরা চেতন বা অচেতন অবস্থা নিয়ে বেঁচে থেকে কি করব? যখন আমরা শরীরের মধ্যেই থাকব না তখন আমাদের ভেতরে পরবর্তী প্রশ্বাস প্রবেশ করবে কেন? কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াশীল হবেই বা কেন? কোনো প্রকারের গতিবিধি কেন ঘটবে? অর্থাৎ আমাদের মৃত্যু ঘটবে। যদি তাই হয় তবে সমস্যা কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা নিজেদের সকল প্রকার ঈপ্সিত সুখ প্রাপ্ত করব এবং তা করে নিয়েছি, এবার যদি আর কোনো ইচ্ছে উৎপন্ন না হয় তবে ইচ্ছেহীন অবস্থায় চলে যাব। অর্থাৎ দীর্ঘ বিশ্রামে চলে যাব যতদিন আমাদের ভেতরে পুনরায় কোনো সুখের ইচ্ছে উদয় না হয়। ধরুন আমরা আহার গ্রহণ করছি এবং আহার গ্রহণের প্রক্রিয়া ততক্ষণ অবধি চলতে থাকে যতক্ষণ অবধি আহার আমাদের সুখ দিতে থাকে। যখনই সুখ সমাপ্ত হয়ে যায় আমরা আহার গ্রহণ করা বন্ধ করে দিই। পরবর্তী সময়ের অপেক্ষা করি। একইভাবে আমরা যখন সুখ থেকে বিমুখ হয়ে যাই তখন ঘুমের মতই দীর্ঘ বিশ্রামে চলে যাই। এতে আমাদের কোনো দুঃখ হয় না বরং এইসব আনন্দের সাথেই চলতে থাকে। আমরা যখন নিজেদের ভোজন সমাপ্ত করে পরবর্তী সময়ের জন্য স্থগিত করে দিই তখন কি এই প্রক্রিয়ায় আমাদের কোনো দুঃখ হয়? কোনো দুঃখ হয় না। যদি আপনি বলতে চান দুঃখ আমাদের জীবনে রস উৎপন্ন করে তবে চলুন এবার এটিও পর্যবেক্ষণ করে দেখে নিই। আমাদের জীবনে কি দুঃখের কারণে রস উৎপন্ন হয় অথবা উৎপন্ন হবার কি কোনো কারণ রয়েছে? আসুন রস উৎপন্ন হবার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি জেনে নিই এবং বোঝার চেষ্টা করি। এখানে আমি স্বাদের উদাহরণ নিচ্ছি। সর্বপ্রথমে আমাদের কিছু খাবার ইচ্ছে জাগ্রত হয় এবং তারপর কিছু সুস্বাদু খাবারের খোঁজ করতে শুরু করি। তখন বিভিন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করি। যে ব্যঞ্জন থেকে আমরা ঈপ্সিত সুখ পেয়ে যাই সেই খাবার আমরা স্বীকার করে নিই অথবা বলতে পারেন তা থেকে আমরা রস বা সুখ পেয়ে থাকি। তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে সুখ অথবা রস একই বিষয়। কেননা সুখই হচ্ছে জীবনের রস। সুখ প্রাপ্তিই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। দুঃখের সময়ও কি এমনটি হয়? আপনি বলবেন যে হয় না। দুঃখের প্রতি পর্যবেক্ষণ করে দেখুন

যে দুঃখ কখন আসে। খিদে পেলে যখন আমাদের কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই আমরা কিছু খাবারের খোঁজ করি। স্বাদ পরখ করে দেখি যে কোন খাবারটা আমরা খেতে চাই। কিন্তু আমরা যদি খাবারের জন্য কিছুই না পাই যা গ্রহণ করে আমরা সুখী বা সন্তুষ্ট হব তখনই আমরা দুঃখী হই। অথবা আমাদের কাছে যদি খাবার জন্য কিছুই না থাকে তবে দুঃখী হই। তখন কি আমরা বলি এই দুঃখ থেকে রস উপভোগ করেছি। অথবা দুঃখের কারণে কি সুখ বেড়ে যাবে? এমনটি কখনোই বলি না। তাহলে উপরের উদাহরণ থেকে বুঝে গিয়েছি যে ইচ্ছে অনুযায়ী আমরা যখন অগ্রসর হই তখন তা থেকে সুখ-সন্তুষ্টি অথবা বলতে পারেন রস গ্রহণ করতে থাকি। দুঃখের অবস্থাই তো নীরসতা উৎপন্ন করে। যে ভোগ থেকে দুঃখ উৎপন্ন হয়, ভবিষ্যতে সেই ভোগের প্রতি আমাদের ভেতরে ইচ্ছে উৎপন্ন হয় না। বরং তা থেকে সরে যাবার ইচ্ছেই তৈরি হয়। ইচ্ছে অনুযায়ী অগ্রসর হবার জন্য রসের সাথে সুখের সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে। দুঃখের প্রতি নয়। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি সুখের ইচ্ছে নিয়ে কোনো কর্ম বারবার শুরু করেন এবং পরিণাম যদি ইচ্ছে অনুযায়ী না আসে তখন সেই কর্ম থেকে আপনার রস হারিয়ে যেতে থাকে এবং নীরসতা অনুভব করেন। এরপর ওই কর্ম বন্ধ করে দেন। যেমন ব্যবসা থেকে যখন আমাদের আয় হয় না বরং ক্ষতি হতে থাকে তখন আমরা সেই ব্যবসা বন্ধ করে দিই। কারণ আমরা বুঝে যাই তা থেকে আমাদের ইচ্ছে পূরণ হবে না। একইভাবে সেই ব্যবসা থেকে যদি লাভ হতে থাকে তবে তার প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ে। এবার আমরা বুঝে গিয়েছি যে জীবনের রস সুখের জন্য বাড়তে থাকে এবং দুঃখের জন্য কমতে থাকে। তাই আপনি সুখকে রস এবং দুঃখকে নীরস বলতে পারেন।

ভবিষ্যতে যেন অধিক সুখ পাওয়া যায় তার প্রতি মানুষের আশা থাকে। এটি ততদিন অবধি থাকবে যতদিন অবধি আমরা সন্তুষ্টির স্তরে উপনীত না হব। প্রতিটি মানুষের সন্তুষ্টির স্তর ভিন্ন হয়ে থাকে। এমন কোনো সমস্যা নতুন ব্যবস্থায় থাকবে না যা থেকে অসন্তুষ্টি উৎপন্ন হয়। জীবনে দুঃখ থাকলে ভয় হয় এই ভেবে যে ভবিষ্যতে আবার না দুঃখ চলে আসে। দুঃখ থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ভয়েরই সৃষ্টি করে কোনোপ্রকার রসের নয়।

প্রশ্ন ১১ ।। সাধু-সন্তরা বলেন যে সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যদি সুখ পেতে চান তবে দুঃখও সাথে থাকবে। এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন? কেননা একথা যদি সত্যি হয় তবে তো আপনার ব্যবস্থায় দুঃখ সর্বদা থেকেই যাবে?

উত্তর ।। যদি একথা সত্যি হয় তবে তো সুখের সাথে দুঃখ সর্বদা বিরাজ করবেই। সুখ যতটা গভীর হবে দুঃখও ততটা গভীর হবে। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী একথা সত্য নয়। সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠও নয় বরং সুখ-দুঃখ দুটো আলাদা আলাদা মুদ্রা। চলুন বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। আসুন বুঝে নিই সুখ-দুঃখ আমাদের কাছে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে। উদাহরণ হিসেবে দুটি ঘটনাকে ধরে নিই। ধরুন এক ব্যক্তি আপনাকে সম্মানজনক কিছু বলল, একইসাথে অপর ব্যক্তি অসম্মানজনক কিছু বলল। দুটি ঘটনাই আপনার সাথে হল। প্রথম ঘটনা থেকে আপনাকে সুখ প্রাপ্তি হল এবং দ্বিতীয় ঘটনা থেকে আপনার দুঃখ প্রাপ্তি হল। এখানে দুটি ঘটনাই তো আলাদা আলাদা। আরেকটি উদাহরণ নিচ্ছি। ধরে নিন আপনি রসগোল্লা খেতে খুব পছন্দ করেন অর্থাৎ রসগোল্লা থেকে আপনি অনেক সুখ উপভোগ করেন। কিন্তু যদি রসগোল্লা আপনাকে ভরপেট খেতে দেওয়া হয় তখন কি করবেন? রসগোল্লা খাবার সময় তো আপনি অনেক সুখ পাচ্ছেন এবং সুস্বাদু অনুভব করছেন কিন্তু পেটে স্থান না থাকার কারণে পেটে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। অর্থাৎ পেটের জন্য কষ্ট অনুভব হচ্ছে। এর অর্থ জিভ থেকে সুখ অনুভব করছেন এবং পেট থেকে দুঃখ অনুভব করছেন। এখানে দুটি ঘটনাই মোটামুটি সাথে সাথে ঘটছে। যদি আমরা এই ঘটনাটিকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করি তবে জানব যে এটি একটি ঘটনা নয় বরং দুটি আলাদা আলাদা ঘটনা। কেননা রসগোল্লা সুস্বাদু সেইজন্যই তো সুখ অনুভব হচ্ছে, যেহেতু পেটে অতিরিক্ত স্থান নেই তাই রসগোল্লা প্রবেশ করার পর পেটকে প্রসারিত হতে হচ্ছে এবং ব্যথার কারণে দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে। তাহলে আমরা বুঝে গিয়েছি যে এখানে সুখ-দুঃখ দুটি আলাদা ঘটনার কারণে ঘটছে। কেননা রসগোল্লা নিজে কোনো সুখও নয় এবং দুঃখও নয়। এটি একটি খাদ্যবস্তু যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুখ-দুঃখরূপে পরিণাম প্রদান করে থাকে। স্পষ্ট করে বোঝার জন্য আরও একটি উদাহরণ নিচ্ছি। ধরুন আপনার রসগোল্লা অধিক পছন্দ এবং আপনাকে ১০ কিলো রসগোল্লা খেতে দেওয়া হল। আপনি রসগোল্লা খেতে আরম্ভ করে দিলেন যা থেকে আপনি সুখ অনুভব করেন। কিছুক্ষণ পর আর আপনার রসগোল্লা খেতে ইচ্ছে হয় না এবং আপনি আর রসগোল্লা খেতে চান না। কিন্তু আপনাকে যদি অবশিষ্ট সমস্ত রসগোল্লা খেতে বাধ্য করা হয় তাহলে ওই রসগল্লাই আপনাকে দুঃখ দিতে শুরু করবে যা একসময় যা আপনাকে সুখ-সন্তুষ্টি দিয়ে আসছিল। এবার অনেকে বলবেন দেখুন একই বস্তু কখনো সুখ দেয় আবার কখনো দুঃখ দেয় তাই সুখ-দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাহলে যতক্ষণ অবধি রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সুখ প্রদান করছিল এবং যখন ইচ্ছে ব্যতিরেকে অন্যের চাপে বাধ্য হয়ে খেতে হচ্ছিল তখন দুঃখ অনুভব হচ্ছিল। তাহলে দুটি ঘটনা এখানে আলাদা আলাদা। একটিতে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ছিল এবং অন্যটিতে ইচ্ছের বিপরীতে অন্যের চাপে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই এখানে সুখের কারণ আলাদা

এবং দুঃখের কারণও আলাদা। এমনটি তো দেখা যাচ্ছে না যে এখানে সুখ-দুঃখের কারণ বা দুঃখ সুখের কারণ। সুখ-দুঃখ তো পরিণামমাত্র একে অপরের কারণ নয়। কিছু মানুষ বলেন যে দুঃখের অনুভব ছাড়া আমরা কোনো সুখের অনুভব করতে পারি না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে হয় যে দুঃখই হচ্ছে মূল ভিত্তি কোনোপ্রকার সুখ অনুভব করার জন্য। উপরের আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন কোনো দুঃখের অনুভব ছাড়া আমরা সুখ অনুভব করতে পারব না, একথা অত্যন্ত শিশুসুলভ হবে। বাস্তবতা হচ্ছে আমরা নিজেদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনোকিছু অনুভব করি। যদি এই অনুভব আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী হয় তবে তা থেকে আমরা সুখ অনুভব করি। যদি ইচ্ছের বিপরীত হয় তবে তা থেকে আমরা দুঃখ অনুভব করি। এই উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে দুঃখ সুখের ভিত্তি নয় বরং ভাল লাগাই অনুভব করাই হচ্ছে সুখের আধার। কোনো ভোগের নিকট এলে আমাদের ভাল লাগা অনুভব হয় এবং তখন আমরা সুখ অনুভব করি। এইজন্য তো নয় যে আমরা দুঃখ অনুভব করছি বলে সুখ অনুভূত হচ্ছে। যদি এমনটি হতো তাহলে দরিদ্র মানুষ সর্বাধিক সুখী অনুভব করত কেননা দরিদ্র মানুষ তো সারাজীবন অত্যধিক দুঃখ অনুভব করে থাকে। একথা সত্য হলে দরিদ্র হবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত এবং প্রতিটি মানুষ নানা কৌশলে দরিদ্র হবার জন্য চেষ্টা করত। এইভাবে সর্বদা সুখী হবার প্রয়াস করত। কিন্তু এমনটি হতে দেখা যায় না। আর ধনীদের তো কম সুখী হওয়া উচিত কেননা তাদের জীবনে তো গভীর কোনো দুঃখ থাকে না। আরেকটি উদাহরণ থেকে বুঝে নিই যে ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ যিনি ৩০ বছর বয়স অবধি কোনোপ্রকার দুঃখ অনুভব করেননি। তাঁর জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। তাঁর পিতা এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যার কারণে ৩০ বছর অবধি কোনোপ্রকার দুঃখ অনুভব হয়নি। এমনটি তাঁর পিতা এইজন্য করেছিলেন কেননা তাঁর সাধু হয়ে চলে যাবার ভয় ছিল। তাঁর পিতা চাননি যে পুত্র সাধু হয়ে যাক। তাহলে এই উদাহরণ থেকেও আমরা বুঝতে পারলাম যে সুখের অনুভব করার জন্য দুঃখের অনুভব করা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা সরাসরি সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করতে পারি। সেইজন্য আমাদের কেবলমাত্র অনুভব করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। যা জন্ম থেকেই আমাদের মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের অনুভব করার জন্য পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ই হচ্ছে মূল অঙ্গ। এইসকল অঙ্গ যাদের সুস্থ্য রয়েছে তারা যে কোনো প্রকারের বিষয়বস্তু অনুভব করতে পারেন।

প্রশ্ন ১২ ।। পরিবর্তনশীলতাই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সেইজন্য সাধু-সন্তরা বলে থাকেন পরিবর্তনশীল সংসারে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। যদি এই

বাক্য সত্য হয় তবে কোনো ব্যবস্থা থেকেই তো সুখ প্রাপ্তি সম্ভব হবে না। তাহলে আপনি কীভাবে বলছেন আপনার ব্যবস্থায় সকলেই সুখে থাকবে?

উত্তর ।। বন্ধুরা, আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এই ধারণা অসত্য। আসুন তা বোঝার প্রয়াস করি। পরিবর্তনশীলতার অর্থ হচ্ছে এই জগৎ সংসারে সমস্তকিছুই সর্বদা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখানে কোনো বস্তু অথবা পরিস্থিতি একরকম থাকে না। বরং নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ জল যেমন বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তেমনি জল আবার বরফে রূপান্তরিত হয়। বরফ আবার জলে রূপান্তরিত হয়। এটি জল চক্রের বৃত্ত। এইভাবেই প্রতিটি বস্তু কোনো ছোট অথবা বড় বৃত্তে নিরন্তর পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত জগৎ সংসারের অস্তিত্ব চলতে থাকে এবং পরিবর্তিত হতে থাকে। অস্তিত্ব এবং পরিবর্তন দুটোই একসাথে চলতে থাকে। যদি এই পরিবর্তনশীলতার নিয়ম জগৎ সংসারে না থাকত তবে এই সংসারের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যেত। এই জগৎ যে আদি তত্ত্ব দিয়ে তৈরি হয়েছে এই নিয়মের অভাব থাকলে তাতে কোনো গতিবিধিই হবে না। অর্থাৎ আদি তত্ত্ব সর্বদা এক অবস্থায় থেকে যাবে এবং কখনোই তা রূপান্তরিত হয়ে সংসারে পরিবর্তিত হতে পারত না। তাই এই নিয়ম তো সংসারেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তা আদি তত্ত্বের মধ্যেই ছিল এবং আদি তত্ত্বে থাকার কারণেই এই নিয়ম আমরা সংসারের মধ্যে সর্বত্র অনুভব করি। এই নিয়মের ফলেই সংসারে এত বিভিন্নতা উৎপন্ন হতে পেরেছে। সকল পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে সকল প্রকার সুখ উপভোগের উপকরণ উৎপাদন সম্ভব হয়। যদি পরিবর্তনশীলতার এই নিয়ম আদি তত্ত্বে না থাকতো তবে তো কোনো সৃষ্টিই সম্ভব হতো না। আর সেই আদি তত্ত্বের অস্তিত্বও কোনো প্রয়োজনে আসতো না। তা সর্বদাই আদি তত্ত্ব রূপেই থাকতো, পরিবর্তিত হতে পারত না। এমনটি নাহলে তার কোনো মহিমাও থাকত না বা কোনো মহত্ত্বও থাকতো না। অর্থাৎ কিছুই থাকতো না। পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে আদি তত্ত্বের এক বৃহৎ ভিত্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী। এই আদি তত্ত্বকে আত্মা বা পরমাত্মার নামেও জানি। অর্থাৎ এই গুণাবলী বা পরিবর্তনশীলতার নিয়ম পরমাত্মার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এইজন্য সংসারের উৎপত্তির মধ্যেও এই নিয়মের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। এত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝে গিয়েছি যে পরিবর্তনশীলতা কোনো দুঃখ অথবা সুখের জন্য উত্তরদায়ী নয়। এ তো কেবলমাত্র একটি পদার্থকে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদার্থকে উৎপন্ন করতে সহায়ক এবং চক্রাকার নিয়মের মাধ্যমে সকল পদার্থ কোনো না কোনো রূপে আমরা সর্বদা প্রাপ্ত করতে থাকি। উদাহরণ হিসেবে দেখেছি যে জলকে আমরা তিনটি রূপে সর্বদাই প্রাপ্ত করে থাকি এবং তিনটি রূপই সর্বদা পরিবর্তন হতে থাকে। তাহলে এই পরিবর্তনশীলতা পরমাত্মার অথবা প্রকৃতির একটি সুখ প্রদানকারী সৎগুণ। কোনো দুঃখ

প্রদানকারী অসৎগুণ নয়। তাই পরিবর্তনশীলতার গুণাবলী কোনোপ্রকার দুঃখের জন্য দায়ী নয়। কীভাবে আমাদের জীবনে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়ে থাকে তা আপনি উপরে জেনে-বুঝেই নিয়েছেন। আরও বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য আমার দ্বিতীয় পুস্তক 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন' অধ্যয়ন করুন।

প্রশ্ন ১৩ ।। সমাজবাদ এবং সাম্যবাদের দর্শনকে দেখতে তো আদর্শবান ব্যবস্থা বলে মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা অসফল কেন? এর পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ।। শুধুমাত্র সমাজবাদ এবং সাম্যবাদই নয় বরং অন্য সকল ব্যবস্থাতেও এটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা রয়েছে যে সকলের জন্য সমস্তকিছু সমানভাবে প্রাপ্তি হওয়া উচিত। চারিদিকে সুখ আর সুখই তো থাকা উচিত। দুঃখ যেন কোথাও না থাকে। সকলে রামরাজ্যের আশা করে, কিন্তু তখন তো সেখানে একজন রাজাকে কেন্দ্র করে রাজতন্ত্র ছিল। অথবা সকলে কোনো এক স্বর্গের আশা করে থাকে যেখানে সকলে সমস্তরকম সুখ অতি সহজেই উপভোগ করতে পারবে কোনোপ্রকার দুঃখ ছাড়াই। তারা সমস্তরকমের বাদকে এইজন্য নিয়ে এসেছেন যেন সর্বত্রই সুখ বিরাজ করে। কিন্তু যখনই এই সুখময় অবস্থাকে নিয়ে আসার জন্য কোনো সংবিধান প্রণয়ণ করা হয়েছে, সেই সংবিধানের মাধ্যমে তেমন অবস্থা আজ অবধি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্যই ওইসকল ব্যবস্থা অসফল হয়েছে। কিন্তু এমনটিও নয় যে সেইসব থেকে একেবারে কিছুই প্রাপ্তি হয়নি। অনেক বিভাগের অবস্থা পূর্বের তুলনায় ভাল হয়েছে আবার অনেক বিভাগের অবস্থা মন্দও হয়েছে। আজ অবধি অনেক প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি যা আমরা সকলে চাইছি। আমার বোধ অনুযায়ী ওইসকল ব্যবস্থা অসফল হবার সবচেয়ে বড় এবং মূল কারণ হচ্ছে যে সমস্তরকম উপাদানের মূল অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তন-মনন বা আলোচনা করা হয়নি। মানুষকে তারা ভেতর থেকে বুঝতে পারেনি যাদের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়ে আসতে চলেছি। এমনকি এই সংসারকেও ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা হয়নি যার মধ্যে এই ব্যবস্থা বিরাজ করবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি এই বিষয়ের উপর প্রথম থেকেই চিন্তা-ভাবনা চলে আসছিল কিন্তু এমন একটি সিদ্ধান্তে আশা সম্ভব হয়নি যা নিয়ে সকলে একমত হতে পারে। আপনারা অতীতে দেখেছেন যে বারবার ব্যবস্থা পরিবর্তিত হবার সময় বহু লড়াই হয়েছে কেননা সকলে সেই সিদ্ধান্তে একমত ছিলেন না। ওই সকল ব্যবস্থা সমস্ত মানুষকে ভাল এবং মন্দ এই দুটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যার পরিণামে আমরা সারাক্ষণ

নিজেদের ভাল এবং অন্যদের মন্দ ভেবে লড়াই করে এসেছি। আর এই সমাজবাদী ব্যবস্থাতেও তো মানুষকে বলা হয়েছিল যে এই ব্যবস্থা এলে আপনার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে এবং আপনি সবকিছু পাবেন যা এখন কেবলমাত্র ধনবান ব্যক্তিরা ভোগ করে আসছে। কিন্তু রাশিয়ার মানুষ দেখেছে যে ৩০-৪০ বছরেও এমন কিছুই বাস্তবে সম্ভব হয়নি। ভাল দিন পেতে তারা আর কতদিন অপেক্ষা করবে? এখনও আর্থিক দিক দিয়ে সমাজ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। দরিদ্র এখনও দরিদ্র রয়েছে এবং তাদের শোষণও অব্যাহত রয়েছে। একটি ছোট্ট কক্ষে বহু শ্রমিকদের রাখা হতো। তাদের কাছে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। নিজেদের কোনো সমস্যা আলোচনা করার জন্য কোথাও কোনো স্বতন্ত্র স্থান ছিল না। ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করলে তাকে হত্যা করা হতো। এমনই ভয়ানক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। নামমাত্র সমাজবাদ ছিল। একটি গোষ্ঠীই শাসন করছিল। সমাজবাদের মত প্রকৃতঅর্থে কিছুই ছিল না। আর শাসকবর্গ এমন ভাবেই ব্যবহার করে আসছিল যেমনটি রাজারা করতো। তারা ধনীদের মতই সমস্ত সুখসুবিধা ভোগ করত যেখানে অন্যদের সেই সুখসুবিধা গ্রহণের অধিকার ছিল না। বলা হয়েছিল যে শ্রমিকদেরই শাসন ব্যবস্থা তৈরি হবে এবং তারাই শাসন করবে কিন্তু বাস্তবে এমনটি হয়নি। এখনও অবধি কিছু ব্যক্তিরাই শাসনভারের দায়িত্বে রয়েছে এবং রাজাদের মতই শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভেবেছিল যে সমাজবাদ ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন কিছু বাস্তবে ঘটেনি এবং সেই ব্যবস্থা অসফল হয়ে গিয়েছে। বরং মানুষের পুঁজিবাদ ব্যবস্থাকে অধিক উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। এতে স্বাধীনতাও অধিক রয়েছে বলে মনে হয়েছে। সেইজন্য রাশিয়াতে আবারও ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ প্রবেশ করতে থাকে। আমি এখন এইসব সমস্যার মূল কারণ খুঁজে নিয়ে স্থায়ী সমাধান তৈরি করে দিয়েছি। সেটিও একেবারে সমস্ত সুখসুবিধাযুক্ত ব্যবস্থা যা আমরা সকলে চাইছি। তা প্রতিষ্ঠিত না হবার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না। আপনি কেবলমাত্র একবার পড়েই এই ব্যবস্থাকে বুঝে নিতে পারবেন যে এই নতুন ব্যবস্থায় ঈপ্সিত পরিণাম অতি সহজেই বাস্তবায়িত হবে। এই ব্যবস্থা মানুষকে ভাল বা মন্দে বিভাজিত করবে না। সেই কারণে এই ব্যবস্থা কোনো মানুষেরই বিপক্ষে যাবে না। এই ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠিত হলে সকলে সহজেই একমত হয়ে যাবে। এতে সকলেই উপকৃত হবে। এই ব্যবস্থা থেকে কোনো মানুষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। এটি বোঝাও অত্যন্ত সহজ। নিজস্ব বোধ অনুযায়ী সকলেই এই ব্যবস্থাকে বুঝে নিতে পারবেন। এই ব্যবস্থা চলে এলে সমৃদ্ধির দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যাবে। সকলের জন্য সমস্ত রকমের স্বাধীনতা সমানভাবে থাকবে। সকলের জীবনযাপনের স্তর একসমান এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন হবে। একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকবে যেখানে সকলে নিজেদের মতামত জানাতে পারবে। যদি কারোর কাছে আরও ভাল সমাধান থাকে সেসবও তারা জানাতে

পারবে। এমনকি সেইসব তথ্য সকলে যে কোনো সময় অনলাইনে দেখেও নিতে পারবে। প্রশাসনিক কর্তারা কি করছে, কি করতে যাচ্ছে এবং কেন করছে ইত্যাদি সমস্তরকম কার্যপ্রণালী অনলাইনে সকলে দেখতে পারবে। এই ব্যবস্থায় সর্বশেষে জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। আর এই অধিকার কেবলমাত্র নির্বাচনের সময়ই নয় বরং নির্বাচনের পরও সর্বদা জনগণের কাছেই থাকবে। এই নতুন ব্যবস্থায় সকলের মান-মর্যাদা একসমান থাকবে। সকল প্রকার কর্মেরও মূল্যাংকনও একসমান থাকবে। জীবনযাপনের স্তর সমান থাকবে। সকল প্রকার স্বাধীনতা সকলের জন্য সর্বদা সমানরূপে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৪ ।। নতুন ব্যবস্থায় সঠিক বা ভুলের নির্ধারণ কীভাবে হবে? নৈতিকতা এবং অনৈতিকতা কীরূপে থাকবে? কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কাউকে স্বেচ্ছামৃত্যু অথবা প্রাণদণ্ড প্রদান করা কি উচিত?

উত্তর ।। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের জন্য সুখ উৎপন্ন হয় তাকে সঠিক বলা হবে এবং যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের জন্য দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই ব্যবস্থাকে ভুল বলা হবে। তাই সঠিক এবং ভুল নির্ধারিত হয় সুখ-দুঃখের অনুভব থেকে। সুতরাং সুখী হবার অর্থ হচ্ছে সঠিক এবং দুঃখী হবার অর্থ হচ্ছে ভুল। আমরা সকলে সুখী হতে চাই অর্থাৎ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখ প্রাপ্তি করা। যা ঘটছে তা ঠিক না ভুল তা জানার জন্য সুখই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি। নৈতিক শব্দের অর্থ হচ্ছে নীতিনিয়ম। জীবনকে সুখী করার জন্যই অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণের কথাকে মাথায় রেখেই নীতিনিয়ম প্রণয়ন করা হয়। আমরা জেনেছি যে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখী হওয়া। তাই নৈতিক এবং অনৈতিকতার নির্ধারণও জীবনের উদ্দেশ্য কী তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে। যা করলে সুখ উৎপন্ন হয় তা নৈতিক এবং যা করলে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা অনৈতিক। যেসব করলে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে সেসব নৈতিক হবে এবং অবশিষ্টসব অনৈতিক হবে।

যদি কেউ কোনো কারণবশতঃ এমন কোনো মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে অন্যদের হত্যা করতে থাকে, যদি তার চিকিৎসা উপলব্ধ না থাকে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা মৃত্যু প্রদান করা যেতে পারে। যদি এমন কোনো পরিস্থিতি চলে আসে যে আপনি সামনের ব্যক্তিকে হত্যা না করলে সে আপনাকে হত্যা করবে তবে আত্মরক্ষার জন্য আপনি বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহকে মৃত্যু প্রদান করতে পারেন। কিন্তু ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব ঘটনাকে পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধান করা হবে। দেখতে হবে ব্যবস্থার কোনো দুর্বলতার কারণে এমন ঘটনা ঘটছে কিনা। যদি কোনো কারণ দেখা যায় তবে তাকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন

করা উচিত, নাহলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। আর আমার বোধ অনুযায়ী ৯৯ শতাংশেরও অধিক এই সম্ভাবনা রয়েছে যে কোনো দুর্ঘটনার পেছনে ব্যবস্থাই দায়ী থাকে। কেননা মানুষ স্বভাববশত সুখপ্রেমী হয়ে থাকে। এমনকি সে স্বপ্নেও এমন কোনো কর্ম জেনে বুঝে করে না যার ফলে তাকে দুঃখ পেতে হয়। হয় সে না জেনে করে অথবা মন্দ ব্যবস্থার কারণে এমন কিছু করতে বাধ্য হয়। তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ব্যবস্থার দুর্বলতার উপর উচ্চস্তরের অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ১৫ ।। আমরা কীভাবে বুঝতে পারব যে কোনো ব্যবস্থা সফল হচ্ছে কিনা? অথবা ব্যবস্থা সফল হবার মাপকাঠি কী?

উত্তর ।। যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সহজ সরলভাবে নিরন্তর প্রাপ্ত হতে থাকে তবে আমরা বলতে পারি সেই ব্যবস্থা সফল হয়েছে অন্যথায় তা অসফল বলে ধরা হবে। তেমন নাহলে সংশোধনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ আমাদের সকলের ব্যক্তিগত সুখ, পারিবারিক সুখ, সামাজিক সুখ এবং সমষ্টিগত সুখ যদি অবিরত প্রাপ্ত হতে থাকে তবে নিশ্চিতভাবে বলা হবে যে সেই ব্যবস্থা সফল হয়েছে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অবিরত প্রাপ্ত হতে থাকলে এটিই হবে কোনো সঠিক ব্যবস্থার মাপকাঠি। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণই হবে মাপকাঠি।

প্রশ্ন ১৬ ।। আমরা জানি আদর্শ ব্যবস্থা বলে কিছু হয় না। সবকিছুরই নিজস্ব লাভ-ক্ষতি রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বহু ব্যবস্থা এসেছে এবং অসফলও হয়েছে। আপনার রচিত ব্যবস্থায় কী এমন রয়েছে যে তা সফল হবেই?

উত্তর ।। আমার পর্যালোচনা কিছুটা ভিন্ন। জীবনে লাভ-ক্ষতির বিষয়টি তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এমন কিছু থাকে যা থেকে কেবলমাত্র লাভই হয়। এমন কিছু থাকে যা থেকে কেবলমাত্র ক্ষতিই হয়। আবার এমন অনেক বিষয় থাকে যা থেকে লাভ এবং ক্ষতি দুটিই হয়। আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যে এই তিন প্রকারের বিষয়ই অনুভব করে থাকি। এই কথাটিকে যদি ব্যবস্থার নিরিখে বিচার করতে হয় তবে বলা যেতে পারে যে ব্যবস্থাও এই তিন প্রকারের হতে পারে। যার মাধ্যমে সর্বদা লাভ হবে, আবার এমনও হতে পারে যা থেকে সর্বদা ক্ষতিই হবে অথবা এমনও হতে পারে যা থেকে লাভ এবং ক্ষতি দুটিই হবে। সাধারণতঃ পূর্ণরূপে ক্ষতি হবে এমন ব্যবস্থা কেউ চাইবে না কেননা ক্ষতি আমরা কেউ চাই না। তাই দুই প্রকারের ব্যবস্থারই প্রয়োগ হয়ে থাকে। মানুষ মূলত নিজেদের লাভের কথা ভেবেই ক্রিয়া করে তাতে অন্য কারোর জন্য ক্ষতিকর হলেও। যদিও কেউ অন্যের ক্ষতি চায় না কিন্তু যখন দেখতে পায় তার কাছে অন্য কোনো বিকল্প নেই যার মাধ্যমে

সবদিক দিয়ে শুধুমাত্র লাভই হবে এবং অন্যের কোনো ক্ষতি হবে না তখন সে বাধ্য হয়ে এমন কিছু বিকল্পকে চয়ন করে। যার ফলে নিজের তো লাভ হয় কিন্তু অন্যের ক্ষতি হয়ে যায়। যদি সে এমন কোনো বিকল্প পেয়ে যায় যার মাধ্যমে শুধুমাত্র লাভই হয় এবং অন্য কারোর কোনো ক্ষতি হয় না তবে তো সে সঠিক বিকল্পই চয়ন করবে। এমন ব্যবস্থা হতে পারে যার মাধ্যমে সকলের লাভ হবে, আবার এমন ব্যবস্থাও হতে পারে যার মাধ্যমে সকলের সর্বাধিক লাভ হবে। কারোর কোনোপ্রকার ক্ষতি হবে না। যে ব্যবস্থা আমি লিখেছি তা এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। যার মাধ্যমে সকলের সর্বাধিক লাভ হবে এবং কারোর কোনো ক্ষতি হবে না। আপনারা সকলে এই ব্যবস্থা অধ্যয়ন করে সহজেই বুঝতে পারবেন যে নতুন ব্যবস্থায় এমনই সম্ভবনা রয়েছে। একবার এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলে বুঝে যাবেন যে এমনটি হওয়া কঠিন কিছু নয়। যতদিন পর্যন্ত মোবাইল ফোনের আবিষ্কার হয়নি ততদিন আমরা দূরে থেকেও একে অপরের সাথে কথা বলতে পারব এমনটি ভাবা শুধুমাত্র কঠিন ছিল না বরং অসম্ভব ছিল। কিন্তু আবিষ্কার হবার পর এই খবর সকলের কাছে দ্রুত পৌঁছে গিয়েছে এবং এখন আমরা অতি সহজেই একে অপরের সাথে কথা বলতে পারছি। তাহলে বিষয়টিকে শুধুমাত্র জেনে বুঝে নেওয়ার অপেক্ষা ছাড়া অন্য কিছু নয়। যতদিন অবধি আদর্শ কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত না হই ততদিন পর্যন্ত এমনই মনে হবে যে আদর্শ ব্যবস্থা বলে কিছু হয় না। যদিও সংসারে এমন অনেক কিছু রয়েছে যার আদর্শ রূপকে আমরা অনুভবও করে থাকি। আমরা অনেক সময় খাবার এতটাই সুস্বাদু পেয়ে যাই তখন মনে হয় এর চাইতে আর অধিক সুস্বাদু খাবার হতে পারে না। অনেক সময় আবহাওয়া বা তাপমাত্রা এতটাই মনোরম হয়ে যায় যে মনে হয় যদি এমন তাপমাত্রা পুরো বছর থাকে তবে খুব ভাল হয়। কখনও সুন্দর পরিবেশ দেখে মনে হয় যে এর থেকে ভাল দৃশ্য হতে পারে না। যেখানে আমাদের কাছে এখন কোনো সঠিক ব্যবস্থা নেই তবুও অনেক সময় আদর্শসম্বলিত কোনো ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে যায়। যখনই সঠিক ব্যবস্থা আমাদের জীবনে চলে আসবে তখন সবকিছু আদর্শসম্বলিতভাবেই আমাদের সকলের জীবনে সর্বদা ঘটতে থাকবে। এবার ভাবুন যদি আপনার জীবন সর্বদা আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে থাকে তবে কি তা কোনো ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শ অবস্থা হবে না? নিশ্চিতভাবে হবে। আর এটি সকলের জীবনে হতে চলেছে।

প্রশ্ন ১৭ ।। কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা বোঝার জন্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বোধ রয়েছে। তাহলে এমন অবস্থায় সকল মানুষ কীভাবে একটি ব্যবস্থার জন্য সহমত পোষণ করবে?

উত্তর ।। একথা অবশ্যই সত্য যে সকলের নিজস্ব বোধ রয়েছে। কিন্তু সকল প্রকার বোধেরও তো একটি কাঠামো রয়েছে। যেমন আমরা ফুটবল খেলায় দেখে থাকি সকলে নিজের নিজের যায়গায় দাঁড়িয়ে খেলে থাকে। আলাদা যায়গায় দাঁড়িয়ে খেললেও মূলত সকলে খেলার নিয়ম মেনেই খেলে থাকে। তেমনি একটি ব্যবস্থায় সকলের আলাদা অবস্থান থাকে। সকলের নিজস্ব পছন্দ থাকে। সকলের নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মও থাকে। যার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন বোধেরও প্রয়োজন হয়। যেমন স্বাভাবিকভাবে ভোজনের ক্ষেত্রে সকলের বিভিন্ন স্বাদের খাবার পছন্দ তেমনি ব্যবস্থাতেও সকলের জন্য সবকিছু সহজলভ্য থাকবে। যার যা কিছু প্রয়োজন তা পূরণ করে নিতে পারবে। তাই বিভিন্ন প্রকারের বোধ থাকলেও কোনো একটি ব্যবস্থার জন্য সকলেই একমত হতে পারে যদি সেই ব্যবস্থায় নিজেদের পছন্দের জীবন-যাপন তারা পেয়ে যায় অথবা যেমন জীবন তারা কাটাতে চায়। উদাহরণস্বরূপ, বাজারে যদি এমন কোনো বস্তু আসে যা সকলের সামর্থ্যের মধ্যে হয় এবং সকলের জীবনকেও সরল করে দেয় তখন এমন বস্তুর প্রতি সহজেই সকলে আকৃষ্ট হয়ে যায় এবং তা ভোগ করতে শুরু করে। অথবা সরকার যখন এমন কোনো নিয়ম প্রণয়ন করে যা অধিকাংশ মানুষের কল্যান করবে তখন সেই নিয়মের প্রতি সকলে একমত হয়ে যায়। তাই এই নতুন ব্যবস্থাও সকলের কল্যানের কথাই বলছে এবং সম্পূর্ণ পরিকাঠামো এমন করেই তৈরি করা হয়েছে। তাই মানুষ সহমত না হবার কোনো কারণ চোখে পড়ে না। তবে হ্যাঁ যতদিন মানুষ সম্পূর্ণরূপে এই ব্যবস্থাকে জেনে বুঝে না নেবে ততদিন পর্যন্ত ছোটোখাটো অসম্মতি দেখা দিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে বুঝে গেলে অতি সহজেই সকলের সম্মতি চলে আসবে। এখন হোক বা পরে হোক সকলকে বুঝে নিতেই হবে।

প্রশ্ন ১৮ ।। মৃত্যু কি মানুষের জন্য সর্বদা সমস্যা হয়েই থাকবে? মানুষ কি কখনও অমর হতে পারবে না?

উত্তর ।। মানুষ জীবিত থাকতে চায় কেননা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী সে সমস্তরকম সুখ উপভোগ করতে চায়। সে এটি অনুভব করে যে বর্তমানে ৫০ থেকে ৮০ বছর অবধি যে গড় আয়ু সে পায় তাতে তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হয় না। এবার বিষয়টিকে এইভাবে দেখার চেষ্টা করি যদি কেউ এমন জীবন পায় যেখানে তার জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু অবধি সুখী জীবন পায় তাহলে কি তার আয়ু স্বাভাবিকভাবে অধিক হয়ে যাবে না? তখন কি সে অনুভব করবে না জীবনের সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে গেছে এবার দীর্ঘ ঘুমে চলে যাই। অর্থাৎ মৃত্যুকে কি সে নিজের ইচ্ছেয় বরণ করে নেবে না? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দুঃখ, চিন্তা, অশুদ্ধ খাবার ইত্যাদির কারণে আমাদের স্বাভাবিক আয়ু কমে যায়। যদি এমন ব্যবস্থা চলে

আসে যেখানে জীবনের সকল প্রকার দুঃখ, চিন্তা ইত্যাদি উৎপন্নই না হয় এবং খাবারদাবারও শুদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের সন্তুষ্টি জীবনে অনুভব করা যায় তবে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের গড় আয়ু বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানুষ ১৫০ থেকে ২০০ বছর অবধি গড় আয়ু প্রাপ্ত করতে পারে। কিন্তু আমার অনুমান জীবনে যদি কোনো দুঃখ না উৎপন্ন হয় এবং সর্বদা সুখই থাকে তবে মানুষের গড় আয়ু ৪০০ বছর অবধি সহজেই প্রাপ্তি হবে। ২০০ বছর থেকে ৪০০ বছরের জীবনে নিশ্চিতভাবেই মানুষ এমনটি আর অনুভব করবে না যে তার কোনো ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে গেছে। তারপর স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণেও কোনো সমস্যা থাকবে না। এমনটি আমার মনে হয়।

তৃতীয় কথাটি বিজ্ঞান বিষয়ক। বর্তমানে অথবা আগামীকাল বিজ্ঞান এমন অবস্থায় পৌঁছে যাবে যেখানে মৃত্যুর সকল কারণ জেনে নিয়ে এমন সুবিধা প্রদান করে দিতে পারে যে যার যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকার ইচ্ছে সে ততদিন অবধি জীবিত থাকতে পারে। তাও একেবারে যৌবন অবস্থায়। আর যখন এই জীবনের উপর বিরক্ত বা একঘেয়েমি চলে আসবে তখন সে ইচ্ছামৃত্যু নিতে পারে। আমার অনুমান এই যে নতুন ব্যবস্থা চলে এলে বিজ্ঞানীরা শীঘ্রই এটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হতে পারবে। কেননা নতুন ব্যবস্থায় বিজ্ঞানীরাও সঠিক পথে গবেষণা করবে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির জন্য আর গবেষণা করবে না। আর নতুন ব্যবস্থায় তো বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও বর্তমান সময়ের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে যাবে। উপকরণও বর্তমান সময়ের তুলনায় অধিক উপলভ্য হবে। এরপর একদিন মানুষ অমরত্ব প্রাপ্তি করবে।

প্রশ্ন ১৯ ।। পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে সমস্যাগুলির সমাধান এই নতুন ব্যবস্থায় কীরূপে হবে?

উত্তর ।। উপরে সম্পূর্ণ পুস্তক অধ্যয়ন করার পর এই বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে ভাল সম্পর্ক না থাকার দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্য আর্থিকভাবে স্বনির্ভর নয় এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সম্পর্ক সম্পর্কে সঠিক শিক্ষার অভাব। আসুন এবার একে একে তা বোঝার চেষ্টা করি। আমরা যদি নিজেদের পরিবারকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখব যে পরিবারের মধ্যে যখনই কোনো বিবাদ হয় সেখানে আপনি মূলত অর্থ সম্পদকেই মূল কারণ হিসেবে পাবেন। আর এমনটি হবার কারণ হচ্ছে পুরো পরিবার অর্থের জন্য বিশেষত একজনের উপর নির্ভরশীল থাকে। যার যা কিছুর প্রয়োজন হয় তার জন্য সেই ব্যক্তির কাছে সকলে দাবী করে। যদি সেই ব্যক্তির কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তবে তো ঠিক আছে নাহলে

তৎক্ষণাৎ সেখানে মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। এই নতুন ব্যবস্থায় সমস্তকিছুই সরকারের উপর নির্ভর করবে। সকলে নিজেদের চাহিদা সরাসরি সরকারের কাছে দাবী করবে। এমনকি সকলের চাহিদা পূরণও হয়ে যাবে। তাই এমন অবস্থায় সম্পর্কের মধ্যে তো অর্থ প্রবেশ করবে না। ফলে সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবিকতা বজায় থাকবে। তারপর থেকে আমাদের সম্বন্ধ কেবলমাত্র প্রেমপূর্ণ ভিত্তিতেই তৈরি হবে। যেখানে প্রেমের অনুভব থাকবে এবং যতদিন প্রেম থাকবে ততদিন সম্পর্ক টিকে থাকবে। তা নাহলে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। নতুন ব্যবস্থায় সম্পর্ক প্রেম বিনিময়ের জন্যই তৈরি হবে অর্থের জন্য নয়। প্রেম হচ্ছে এমনই অনুভব যা একজনের কাছ থেকে না পেলে অন্যজনের কাছ থেকে পেয়ে যাবে। কিন্তু অর্থের বেলায় এমনটি হয় না যে একজনের কাছে না পেলে তা অন্যজনের কাছে পাওয়া যাবে। এইজন্য বেশীরভাগ সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থই মূল সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। নতুন ব্যবস্থায় এই সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে। এইবার সম্পর্কগুলি কেবলমাত্র প্রেমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। প্রেম না থাকলে সম্পর্কও তৈরি হবে না। ইচ্ছের বিপরীতে বা অনাবশ্যক সম্পর্কের ভার আর থাকবে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার মাধ্যমে সম্পর্ক কি, কেন এবং কীভাবে জীবন্ত রাখতে হয় অথবা কীভাবে পালন করতে হয় এই সম্পর্কে জ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রদান করা হবে। অর্থ এবং জ্ঞান সঠিকভাবে থাকলে সম্পর্ক নিয়ে কখনই কোনো প্রকারের সমস্যা উৎপন্নই হবে না।

প্রশ্ন ২০ ।। আপনার কি মনে হয় না কোনো ব্যবস্থাকে বদলানোর জন্য মানুষকেও সংশোধন করা প্রয়োজন? অর্থাৎ মানুষ নিজেদের ত্রুটিমুক্ত না করলে যতই সঠিক ব্যবস্থা আসুক না কেন তা অসফল হবেই? সুতরাং মানুষকে প্রথমে সংশোধন না করলে আপনার ব্যবস্থা কীভাবে সফল হবে?

উত্তর ।। যে কোনো ব্যবস্থা মূলত মানুষের জন্যই তৈরি হয়। মানুষের স্বভাব কেমন এবং কত প্রকার হয়ে থাকে ইত্যাদি আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত জানব না ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা তৈরি করা বা প্রতিষ্ঠিত করার কোনো অর্থ থাকে না। এবার জেনে নিই মানুষ কেমন প্রকৃতির হয়। আমরা যদি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে সকলেই নিজেদের মত করে সুখী হতে চায়। এই সুখ প্রাপ্তির জন্যই তাকে জীবনভর নানারকম প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। এবার বলুন এতে কি ভুল রয়েছে? কিছু মানুষ বলে থাকেন অবশ্যই মানুষের সংশোধন প্রয়োজন। নিজের এবং পরিজনের জন্য সুখের প্রচেষ্টা করাটা কি কোনো ভুল কর্ম? আপনি বলবেন, মেনে নিলাম আপনার এই কথায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু মানুষ যে ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী জীবন-যাপন করে না এটি তো ভুল? তাহলে আসুন এই বিষয়টিকে বুঝে নিই। যদি আমরা এমন মানুষদের জীবনকে

পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যাদের আমরা এই ভেবে মন্দ বলে থাকি যে তারা ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন-যাপন করে না; সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝে নিতে হবে সকলেই প্রথমে ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা করে থাকে। কিন্তু অসফল হয়। যখন তারা ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে যায় তখন তারা নিয়মবহির্ভূত কর্মের মাধ্যমে সুখী হবার এবং নিজেদের পরিবার পরিচালনার প্রচেষ্টা করে। যাকে আমরা অনৈতিক বা ব্যবস্থার বিপরীত কর্ম বলে মনে করি। অন্যভাবে বললে এদের অপরাধী বলা হয়। এই কারণেই আমরা তাদের মন্দ মানুষ বলে থাকি এবং সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করি। এ নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনাই চলছে না বরং বহু মানুষ, বহু সংস্থা এবং বর্তমান সময়ের ব্যবস্থাও বহু প্রয়াস করে চলেছে সেইসব মানুষদের শুধরে নেবার জন্য। যদিও সকলেই অসফল হচ্ছে। কারোর মধ্যে কোনো সংশোধন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের এবং পরিবারের জন্য সুখ চাওয়া এবং নিজের যোগ্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়াস করা কি কোনো ভুল কর্ম? তা যদি ভুল না হয় তবে তাদেরকে কীসের জন্য সংশোধন করতে হবে? কোনো ব্যবস্থাও তো এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপন করা হয় যেন সকলে সুখে জীবন-যাপন করতে পারে। ব্যবস্থা সামান্য কিছু মানুষের সুখের জন্য তো নয়? এখনো অবধি ব্যবস্থার বিপরীতে না গিয়েও অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায়নি যার মাধ্যমে সকলে সুখে জীবন কাটাতে পারে। তাহলে এতে মানুষের দোষ কোথায়? কেন তারা নিজেদের পরিবারকে সর্বদা দুঃখী অবস্থাতেই দেখতে থাকবে? এমনকি দিনের পর দিন অধিক দুঃখী হতে থাকবে? এইজন্য কি তারা নিজেদেরকে, সমাজকে অথবা পূর্বজন্মের পাপকে দোষ দিতে থাকবে? অথবা এই জগতে জন্মগ্রহণ করাকে দোষ দিতে থাকবে? প্রতিটি মানুষ সুখসুবিধা উপভোগ করে বেঁচে থাকতে চায়। যাদের তারা ভালবাসে তাদেরকেও সুখী দেখতে চায়। আমার পর্যবেক্ষণও এটিই বলে যে মানুষের মধ্যে কোনো ভুল নেই। তাদের সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে। অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে তাদের এমনটি করতে বাধ্য হতে হয়। এমনটি তারা নিজেরাও করতে চায় না। তাই সকল মানুষ মূলত সঠিকই রয়েছে। তাদের জন্য ভিন্নভাবে কিছু করার প্রয়োজন নেই। কে জানে না যে চুরি করা অসৎ কর্ম? সকলেই জানে। তারপরও তো করে থাকে। তারা না জেনে করে তা কিন্তু নয়। এইজন্য করে কেননা চুরি করতে তারা বাধ্য হয়। সংশোধন করার অর্থও তো এটিই হবে যে তারা জানে না যে চুরি করা অসৎ কর্ম তাই তাদের উপদেশ দিয়ে জ্ঞান বর্ধন করতে হবে যেন তারা পুনরায় অসৎ কর্ম না করে। কিন্তু এই জ্ঞান তো সকলের কাছে প্রথম থেকেই রয়েছে। তাহলে আবার কীসের সংশোধন? বন্ধুরা, প্রয়োজন শুধুমাত্র এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করা যেন নিজের এবং প্রিয়জনদের সুখের জন্য কাউকেই কোনোপ্রকার অসৎ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য না হতে হয়। অর্থাৎ সকলের জন্য যেন সমস্তরকম সুখ স্বাভাবিকভাবে আসতে থাকে। তাই এই নতুন ব্যবস্থা

খুব সহজেই সফল হয়ে যাবে এবং মানুষকে শোধরানোর বৃথা প্রচেষ্টা করতে হবে না। কেননা কেউই মন্দ নয়। তবে হ্যাঁ, কেউ রোগগ্রস্ত হলে অবশ্যই চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২১ ।। আপনার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র ভৌতিক সুখসুবিধার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু কিছু মানুষের কাছে শুরু থেকেই তা রয়েছে। আমরা এটিও দেখছি যে তারাও সমস্ত দিক দিয়ে সুখী নয়। তাহলে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পরও কি মানুষ পূর্ণরূপে সুখী হতে পারবে? এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন?

উত্তর ।। এই সংসার ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জগৎ হিসেবে বিভক্ত নয়। এটি তো মানুষ বোঝানোর দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারকে শ্রেণীবিভক্ত করে থাকে। তার কারণ হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত করে কিছু বোঝানো এবং সেই অনুযায়ী পরিচালনা করা সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর কোথাও পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশ বলে কিছু হয় না। কিন্তু ব্যবস্থাগত দৃষ্টিকোণ থেকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করলে সেখানকার ব্যবস্থা পরিচালনা করা সহজ হয়ে যায়। এইসব শ্রেণীবিভাগ কাল্পনিক হয় এবং সুবিধার জন্য করা হয়। তার আলাদা কোনো অর্থ ভাবা উচিত নয়। যদি আলাদা কোনো অর্থ করা হয় তবে অনাবশ্যক সমস্যা উৎপন্ন হতে শুরু করে। যেমন দেশের শ্রেণীবিভাগ তৈরি করে মানুষ এর সাথে আমার দেশ তোমার দেশ ভেবে নিয়ে আবেগের সাথে জুড়ে গিয়েছে। আর এখন এটিকেই দেশপ্রেম এবং দেশদ্রোহী হিসেবে দেখা হচ্ছে। যেখানে জগতের শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থাগত দৃষ্টিকোণ থেকে করা উচিত। অর্থাৎ কাল্পনিকরূপে করা উচিত ভাবনাত্মকরূপে নয়। আমাদের বুঝে নিতে হবে কোনটি কাল্পনিকরূপে এবং কোনটি বাস্তবিকরূপে বা ভাবনাত্মকরূপে নেওয়া উচিত। ভাবনাত্মকরূপের অর্থ হচ্ছে যে বস্তু বাস্তবিক জগতে রয়েছে কাল্পনিক জগতে নয়। তাই বাস্তবিক বলুন বা ভাবরূপ বলুন তা একই কথা। যেমন নতুন ব্যবস্থা এখন কাল্পনিকরূপে রয়েছে। এই কল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সকলে কীভাবে সুখী জীবন পেতে পারি। ঠিক একইভাবে ভৌতিক জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতের কল্পনা করা হয়। যেন বাস্তবিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা জানতে পারি এবং সেইরূপ ব্যবস্থা তৈরি করে সুখী জীবন উপভোগ করতে পারি। নাহলে বাস্তবিকরূপে অথবা ভাবনারূপে কোনোকিছু ভৌতিক অথবা আধ্যাত্মিক হয় না। যা কল্পনা তাকে কাল্পনিকরূপেই নেওয়া উচিত। আর যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার কল্পনা করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে তাকে বোঝা উচিত। এমনটি না করার ফলে বহু সমস্যা আমাদের জীবনে আসতে থাকে। আসুন এবার বুঝে নিই যে বিষয়টি মূলত কীভাবে ঘটে। সমস্ত জগৎ সংসারে সবকিছুই

রয়েছে। ভেতরে-বাইরে-মাঝে সর্বত্র। সংসারের যেটি বাইরের অংশ তা সংবেদনশীলরূপে আমাদের ভেতরে প্রবেশ করে। যার মাধ্যমে আমরা সুখ-দুঃখকে অনুভব করে থাকি। সংসারের অভ্যন্তরীণ অংশ হচ্ছে স্বয়ং আমরা অথবা আমাদের চেতনা। যা সমস্তকিছুর জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে সুখ-দুঃখকে অনুভব করে। এমনকি এইসব নিয়ে চিন্তাও করে, আবার হিসেব নিকেশ করে এবং সেই ভিত্তিতেই সংসারের বাইরের অংশে ক্রিয়াকলাপ করে থাকে। তাহলে ভেতর থেকে বাইরে একই জীবন বিস্তৃত হয়ে রয়েছে যার একটি অভিমুখ ভেতরে শুরু হয়েছে এবং অন্যটি বাইরের জগতে বিস্তার লাভ করেছে। আর মাঝের যে অংশ রয়েছে তা হচ্ছে শরীর। বাইরে কোনো ঘটনার সাথে যদি আমরা সম্পর্কযুক্ত থাকি তবে আমাদের ভেতরে তার প্রভাব পড়ে যার কারণে আমরা সুখী অথবা দুঃখী হই। অন্যভাবে বললে আমাদের ভেতরে যে প্রভাব পড়ে যার মধ্যে আমরা শান্তি, অশান্তি, সন্তুষ্টি, সুখ, দুঃখ, ভয়, লোভ, চিন্তা, প্রেম, ঈর্ষা ইত্যাদি যতরকমের ভাব আমরা অনুভব করে থাকি; বাইরেও সেইসব বিষয় নানারকম অবস্থায় থাকে যার কারণে আমাদের ভেতরে ভাল এবং মন্দ ভাব উৎপন্ন হয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে গেলে সংসারে বাইরের অংশকে ভৌতিক বা জড় এবং সংসারের ভেতরের অংশকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বলে থাকি। মধ্যবর্তী অবস্থানেও কিছু থাকে যাকে আমরা আধিদৈবিক বা মানসিক বলে থাকি। সুতরাং এইসব শ্রেণীবিভাগ এইজন্য করা হয়েছে কারণ এমনভাবে নামকরণ করলে আমরা তা সহজেই বুঝতে পারি এবং এতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারও সরল হয়ে যায়। যেহেতু সুখ-দুঃখের অবস্থা বাইরের পরিস্থিতির কারণে ঘটে সেহেতু আমাদের বুঝতে হবে সুখ-দুঃখ কীভাবে ঘটে থাকে। এরপর আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করে নিতে হবে যেন সমস্ত পরিস্থিতিতে সকলের জন্য শুধুমাত্র সুখই উৎপন্ন হয়। এমন একটি ব্যবস্থা এতদিন সকলের কল্পনায় ছিল। সৌভাগ্য এই যে সেই কল্পনাগুলির একত্রিত রূপায়ণ আমি করে দিয়েছি। এমন এক ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছি যার মাধ্যমে সকলের জীবনে সর্বদা সুখ প্রদানকারী পরিস্থিতিই উৎপন্ন করবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে যত রকম আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ করেছি সেসবের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। এই সকল আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ করে আমরা কেবলমাত্র নিজেদের দুঃখকে কিছুটা লাঘব করতে পারি। যেমনভাবে আমরা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করিয়ে কোনোরকমভাবে বেঁচে থাকি। এর চেয়ে অধিক লাভ কখনও কারোর হয়নি। বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা দেখছি মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ ভৌতিক সুখসুবিধা ভোগ করছে। তারা বাস্তবে কিন্তু পূর্ণরূপে সুখ উপভোগ করতে পারছে না। আবার যারা ভৌতিক সুখ থেকে বঞ্চিত তারাও তো সমস্ত সুখসুবিধা ভোগ করতে চায়। বর্তমানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার কারণে ভৌতিক সুখ উপভোগকারীরাও নিজেদের সুখ হারানোর ভয়ে দুশ্চিন্তা এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেক সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং

প্রতিযোগিতার চাপে আত্মহত্যাও করে ফেলে। আমার রচিত নতুন ব্যবস্থায় সকলেই নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সমস্তরকম সুখ উপভোগ করতে পারবে। অর্থাৎ সকলেই সমৃদ্ধশালী জীবন উপভোগ করবে। সুখী জীবনযাপনের জন্য কারোরই কোনোরূপ দুশ্চিন্তা বা নিরাপত্তাহীনতার অসুখে ভুগতে হবে না। অসমান ব্যবস্থার কারণেই তারা ভৌতিক সুখসুবিধা সত্ত্বেও সুখী জীবন উপভোগ করতে পারছে না। অপরদিকে তারা যদি আধ্যাত্মিকভাবে সুখ অনুভব করতে পারতো তাহলে ভিন্নভাবে কোনো ধ্যান-তপস্যা করার প্রয়োজন হতো না। এইসব আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ ওইসব বিষয়ের জন্য নয়। জীবনে এসবের অন্য উপযোগিতা রয়েছে। এ বিষয়ে কেউ চাইলে আমার সাথে ভিন্নভাবে আলোচনা করতে পারেন অথবা আমার দ্বিতীয় পুস্তক ‘সম্পূর্ণ জীবন দর্শন’ অধ্যয়ন করতে পারেন। যেখানে আমি বিস্তারিতভাবে এইসব বিষয়ের ব্যখ্যা করেছি।

প্রশ্ন ২২ ।। আপনার রচিত নতুন ব্যবস্থায় সকলেই তো সমান হয়ে যাবে। তাহলে ধনবান এবং বলবান ব্যক্তিরা নতুন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত হতে দেবে কেন? তারা তো সাম্যবস্থা চান না বরং মহান হয়ে থাকতে চান। এই বিষয়ে আপনি কী ভেবেছেন?

উত্তর ।। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কোনো মানুষই মহান অথবা হীন হতে চান না। বর্তমান ব্যবস্থায় মানুষ এইজন্য মহান হতে চান কেননা তাদের এমনটি মনে হয় যে সুখী হবার জন্য জীবনে যা কিছু প্রয়োজন মহান নাহলে তা পাওয়া যাবে না। এমনকি জন্মের পর থেকেই চারপাশের পরিস্থিতি দেখে এমনটিই অনুভব করে। সে দেখতে পায় মানুষ যখন মহান হয়ে যায় তার কাছে জীবনের সর্বাধিক সুখসুবিধাগুলি চলে আসে। এইজন্য মানুষ নিজের চেয়ে মহান ব্যক্তিদের পূজা করতে থাকে এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে। যেমন মানুষ মন্দিরে গিয়ে কত আশা ভরা নয়নে ভগবানের মূর্তির প্রতি চেয়ে থাকে এবং প্রার্থনা করতে থাকে, হে মহান পরমাত্মা আমাকেও মহান কর, যেন আমি বৈভবশালী হতে পারি এবং সুখী জীবন উপভোগ করতে পারি। যদি আমরা মানুষকে তার মূল স্বভাব অনুযায়ী দেখি যেমনটি আমি এই পুস্তকে বর্ণনা করেছি তা হচ্ছে আমাদের স্বভাব শুধুমাত্র সুখী জীবন উপভোগ করা। তাই সুখী হবার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন হবে আমরা তা করব। যদি মহান হবার প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য প্রচেষ্টা করব। যদি চুরি করতে হয় তবে তাই করব। কারোর ক্ষতি করে যদি সুখ পাওয়া যায় তবে সেটিও করব। সে আমাদের নিজের ভাই, বন্ধু, আত্মীয় যে কেউ হোন না কেন। আত্মিক দিক দিয়ে আমরা সকলেই তো ভাই-বন্ধু। আমরা একে অপরের সাথে যেসব ভাল অথবা মন্দ ব্যবহার করি সেসব নিজেদের ভাই-বন্ধুদের সাথেও করে থাকি। আর এটি কি প্রকার মহানুভবতা যে

আমরা একে অপরের সম্মান হরণ করে চলেছি? অপরের সুখসুবিধাগুলি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের সুখের জন্য ব্যবহার করছি? একে মহানুভবতা নয় বরং হীনতাই বলা চলে। এইসব নিম্ন স্তরের কর্মও তো আমরা নিজেদের সুখসুবিধার জন্যই করে চলেছি তাই না? যদি আমরা এই সমস্ত সুখসুবিধা অতি সহজেই পেয়ে যাই এবং তার জন্য যদি মহান অথবা নিম্ন স্তরে নামার প্রয়োজন না পড়ে তবে কার মাথায় মহান হবার ভাবনা জাগ্রত হবে? কারোরই হবে না। মানুষ কখনই অনাবশ্যক কর্ম করে না। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মানুষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনোকিছুই করে না। মানুষ সকল সৎ এবং অসৎ কর্ম প্রয়োজন হলে তবেই করে থাকে। এইজন্য যারা বর্তমানে কোনো মহান পদে আসীন রয়েছেন অথবা যারা কোনো নিম্ন পদে আসীন রয়েছেন তারা যখন শুনবেন এবং বুঝবেন যে এমন কোনো ব্যবস্থা রয়েছে যা প্রতিষ্ঠিত হলে সকলের সকল প্রকার সুখসুবিধা সহজেই প্রাপ্তি হয়ে যাবে, তখন তারা অত্যন্ত সুখ অনুভব করবেন এই ভেবে— এবার আর মারামারি হানাহানি করতে হবে না। আমাদের হয়তো অনুভব নেই যে মহান পদে আসীন হতে এবং সেই পদ বহাল রাখতে কত কিছুই না করতে হয়? কতই না বলিদান দিতে হয়? অর্থাৎ বহু প্রকারের দুঃখ ভোগ করতে হয়। কখনও কখনও প্রাণ নিতেও হয় এবং প্রাণ দিতেও হয়। সারা জীবন ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় এই ভেবে, জানি না কবে কেউ এসে আমার পদ না ছিনিয়ে নেয়। ধনবান এবং বলবান উভয় মানুষের একই অবস্থা। এটিও এক প্রকারের মহানুভবতাই বটে! কেউ এসে আমাদের সম্পদ যেন চুরি না করে এই ভয় নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। আর বাহুবলও তো সর্বদা সমান থাকে না। শরীর নিয়ে তো ভয় অধিক থাকে এই ভেবে যে, না জানি কবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ে, তখন যে কেউ এসে প্রতিশোধ নিতে পারে। এইসব দুশ্চিন্তা ভয় তৈরি করে। এরপরও তারা লোভ সামলাতে পারে না এবং নিজেদের সম্পূর্ণ মনোযোগ সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োগ করে। এই বিষয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। যদি সকলের কাছে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সমস্ত সুখসুবিধা চলে আসে তাহলে কেন প্রধানমন্ত্রী বা সেইরূপ কোনো উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির জন্য সুরক্ষার প্রয়োজন পড়বে? তাহলে কেনই বা কেউ অপরের উপর আক্রমণ করবে? কেনই বা কাউকে ঠকাবে, অপমান করবে, শোষণ করবে, চুরি-ছিনতাই করবে, কাউকে নিচু দেখানোর চেষ্টা করবে, কারোর প্রতি ঈর্ষা করবে, কারোর সন্তান অপহরণ করবে, দুর্নীতি করবে, অপরাধ করবে, নিজের ধন সম্পদ নিয়ে অপরের সাথে লড়াই করবে? অথবা কেনই বা সুখসুবিধার জন্য কেউ নিজের মান-মর্যাদা নিয়ে গর্ব অনুভব করবে?

এবার ভেবে দেখুন যদি আপনার কাছে সকল সুখসুবিধা থাকে তাহলে কেন আপনি আপনজনদের অথবা অপরজনদের দুঃখ দিতে চাইবেন? আপনার উত্তর এটিই হবে—

কেন আমরা অপরের ক্ষতি চাইব? সুতরাং এমনভাবেই অন্য সব বিষয় সম্পর্কে বুঝে নিতে পারেন। এইসব হচ্ছে ভ্রষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার কারণে। চারিদিকে শুধুই হানাহানি। আজকাল আবার বন্দুক থাকার ফলে শারীরিক বলের তেমন প্রয়োজনই পড়ে না। এমন সুখে কি লাভ যা নিজের জন্য দুঃখ বয়ে আনবে। আমরা সমস্ত প্রকার সুখ এমনভাবে চাই যেন সাথে কোনো দুঃখ না আসে। এইসব বিষয় নতুন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হয়ে যাবে। নতুন ব্যবস্থায় সকল প্রকার সুখ কোনো প্রকারের দুঃখ ছাড়াই আসবে। তাই নতুন ব্যবস্থাকে সকল মানুষ সহজে স্বীকার করে নেবে এবং নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সকলে মিলে সহযোগিতাও করবে।

প্রশ্ন ২৩ ।। অণু-পরমাণুর পূর্বে চেতনা কীভাবে থাকতে পারে? যদি থাকে তাহলে আপনি তা কীভাবে নিশ্চিত হয়ে বলছেন?

উত্তর ।। প্রথমে বুঝতে হবে চেতনার সাথে আমাদের কীসের সম্পর্ক? আমরা যখন বলি চেতন এবং অচেতন দুইই তো বাস্তবে রয়েছে। তখন এর মাধ্যমে আমরা কী বুঝি? চেতনার অর্থ হচ্ছে যা ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন বিষয় অনুভব করে। সেইসব বিষয়কে সুখ-দুঃখ অনুযায়ী মূল্যায়ন করে এবং পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি নির্বাচন করে। চেতনার বিশেষ অর্থ হচ্ছে সে ইচ্ছে অনুভব করতে পারে। এইজন্য একে ঈশ্বরও বলা হয়। ঈশ্বরের অর্থ হচ্ছে যে ইচ্ছেকে ধারণ করতে পারে এবং ইচ্ছে অনুভব করতে পারে। অণু-পরমাণু বা পদার্থ তো ইচ্ছে উৎপন্ন করতে পারে না। তবে এটি ঠিক যে কোনো ইচ্ছে প্রকাশকারী সচেতন অণু আপন ইচ্ছে অনুযায়ী অবশ্যই চালিত হতে পারে। যেমন আমরা প্রতিদিন নানারকম চেতন-অচেতন বস্তুকে উদ্দেশ্যে অনুযায়ী বা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী চালনা করতে থাকি। এই কথাকে অবশ্য অন্যভাবেও বোঝা যেতে পারে। যেমন বিজ্ঞান অথবা কিছু নাস্তিক দর্শন এমনটি বলে থাকে যে আদিতে কেবলমাত্র পদার্থই ছিল, কিন্তু কোনো চেতনা ছিল না। আর আস্তিক দর্শন বলছে পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম পদার্থের পূর্ব থেকেই রয়েছে। অর্থাৎ চেতনা প্রথমে এবং পদার্থ পরে এসেছে। এখানে দুটির সম্ভাবনাই রয়েছে। আদিতে হয় পদার্থ ছিল নাহলে চেতনা ছিল। তৃতীয় কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। এটিকে এবার যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। মেনে নিচ্ছি প্রথমে পদার্থ ছিল কোনো চেতনা ছিল না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে সেখানে প্রথম গতিবিধি কীভাবে উৎপন্ন হল? কেননা গতিবিধি ছাড়া তো জগতের রচনা সম্ভব নয়। এবার যদি আপনি বলেন সেই পদার্থের মধ্যে গতি ছিল তাহলে প্রশ্ন ওঠে সেই অণু বা পদার্থ থেকে ইচ্ছে উৎপাদনকারী চেতনা বা জীব কীভাবে উৎপন্ন হতে পারে? সর্বত্র পদার্থ বা জড় বস্তুই তো থাকা উচিত ছিল। চেতনা থেকে জড় বস্তুর জন্ম হতে পারে। কেননা চেতনা জড় বস্তুতে পরিণত হবার

ইচ্ছে করলে সে জড় হতে পারে। কিন্তু জড় বস্তু তো কিছু হবার ইচ্ছে করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ ধরে নিই আমি এবং আপনি জেগেও থাকতে পারি অথবা ঘুমিয়েও থাকতে পারি। এখানে জেগে থাকার অর্থ হচ্ছে চেতনার অবস্থা এবং ঘুমিয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে অচেতন অবস্থা। অচেতনের অর্থ হচ্ছে জড়। অর্থাৎ তখন আমরা কোনো ইচ্ছে করতে পারি না এবং পূর্বের ইচ্ছে অনুযায়ী কোনো গতিবিধিও করতে পারি না। আমরা নিদ্রারূপে বিশ্রাম নিতে থাকি। বিশ্রামের অর্থ হচ্ছে আমরা কিছুর ইচ্ছে করছি না। অর্থাৎ কিছুই করছি না। অণু তো জড়। এইবার আপনিই বলুন– মূল বা আদিতে জড় ছিল না চেতনা ছিল? চেতনা জড় অবস্থাতেও থাকতে পারে অথবা চেতন অবস্থাতেও থাকতে পারে। কিন্তু জড় যেহেতু ইচ্ছে করতে পারে না সেইজন্য সে কখনই নিজ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ জড় কখনই চেতন হতে পারে না। সে সর্বদা জড় অবস্থাতেই থাকবে। এবার প্রশ্ন উঠে আসে যে অণু বা পদার্থ যেহেতু জড় সেহেতু সে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে না। তাহলে জড় বস্তু থেকে সংসার কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে? কীভাবে সেই জড় থেকে দ্বিতীয় কোনো স্তর উৎপন্ন হতে পারে? সেখানে কোনো প্রকারের গতিবিধিই বা কীভাবে উৎপন্ন হতে পারে? সে প্রারম্ভে যে অবস্থায় থাকবে সর্বদা সেই অবস্থাতেই থাকতে হবে কেননা তার মধ্যে অবস্থা পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছে তো থাকতে পারে না যার দ্বারা সে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। আর এটিও বোঝা প্রয়োজন যে চেতনার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং একটি দিকনির্দেশ থাকে। সেক্ষেত্রে ইচ্ছেই হচ্ছে তার দিকনির্দেশ। বলতে পারেন এটিই তার উদ্দেশ্য। কোনোপ্রকার গতিবিধির জন্য কারোর একটি দিকনির্দেশ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। লক্ষ্য ছাড়া কোনো গতিবিধিই সম্ভব নয়। এটি তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো গতিবিধির সম্ভাবনা থাকতে পারে না। আর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চেতনাতেই থাকতে পারে। জড় বস্তুর উদ্দেশ্য থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকতে পারে না। তাহলে আমরা নিরন্তর গতিশীল সংসারকে দেখে বলতে পারি যে প্রারম্ভে চেতনাই থেকে থাকবে কোনো জড় নয়। এই সংসারকে যদি আপনি পর্যালোচনা করেন তাহলে পাবেন যে এখানে সবই চক্রাকারে অস্তিত্বরহিত অবস্থায় অবস্থান করছে। এটি নিরন্তর পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে এবং তিন অবস্থাতেই অবস্থান করে। যার কারণে আমরা তাকে যে অবস্থায় যতটা ব্যবহার করতে পারি তা করে নিতে পারি। আর আমাদের ব্যবহারের সময়ও তা অবিরত পরিবর্তনশীল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। তার পরিবর্তনশীলতা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হবার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই পরিবর্তনশীলতার কারণেই জগৎ সঠিকভাবে অবস্থান করে থাকে। যদি চেতনার মধ্যে পরিবর্তনশীলতার গুণাগুণ না থাকতো, অর্থাৎ অন্যভাবে বললে যদি প্রারম্ভে জড় বা অচেতন থাকতো তবে এই সংসার সৃষ্টিই হতো না। কেননা পরিবর্তনশীলতা কেবলমাত্র চেতনাতেই সম্ভব, কোনো জড় বস্তুতে

নয়। যদি কারোর মনে হয় এই পরিবর্তনশীলতা জড় অথবা অচেতন বস্তুতে সম্ভব হতে পারে তবে সে অন্যভাবে এটিই বলার চেষ্টা করছে যে জড় মূলত অচেতন নয় বরং চেতনা। তাহলে এইভাবে প্রারম্ভে চেতনাই থাকতে পারে জড় নয়। জড়তা চেতনারই একটি ঈপ্সিত অবস্থা যার মাধ্যমে সে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মধ্যেই তাকে উৎপন্ন করে নেয়। আর প্রয়োজন পূরণ হবার পর তাকে বিলীন করে দেয়। অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন করে নেয়। আপনি বলছেন যে আমি তা নিশ্চিতভাবে কীভাবে জানতে পারলাম? যখন আমি সাধনার সময় নিজের ভেতরে অধ্যয়ন করেছি তখন এইসব বিষয় আমার নিজ অনুভবের মাধ্যমে এসেছে। ফলে আমি এইসব নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি এবং সেই কারণে আপনাদেরও গভীরভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। কেননা কোনো ব্যক্তি গবেষণা ছাড়া কোনো বিষয়কে গভীরভাবে বুঝতে পারে না এবং বোঝাতেও পারে না। তবে একবার কিছু একটা আবিষ্কার হয়ে গেলে এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা করে দিলে অবশিষ্টদের জন্য বুঝে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। কিন্তু প্রথমবার আবিষ্কার না করে এবং অনুভব না করে অথবা না বুঝে কখনই কারোর পক্ষে কিছু বোঝানো সম্ভব হবে না। এইসব তথ্যকে আমি বহুবার অনুভব করেছি এবং নিজে বুঝেছি। কীভাবে অন্যকে বোঝাতে পারব এর উপর চিন্তন-মননও করেছি। এইজন্য আমি বলতে পারি যা বলছি তা নিশ্চিতভাবে জেনে-বুঝেই বলছি। যদি কারোর প্রয়োজন হয় তবে নানা উদাহরণ সহযোগে আমি সেসব অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যাও করতে পারি। আমার কথাগুলোকে আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বোঝার চেষ্টা করুন না কেন সঠিকই পাবেন। এই ব্যাখ্যাগুলি আপনার সকল দৃষ্টিকোণ থেকেই যুক্তিযুক্ত মনে হবে, যা আপনাকে সকল প্রকার দর্শন বিষয়ক প্রশ্নের সন্তুষ্টিপূর্ণ উত্তর প্রদান করবে।

প্রশ্ন ২৪ ।। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ সম্বন্ধে আপনার কী বক্তব্য?

উত্তর ।। আমার পূর্বে এ বিষয়ে বহু মানুষ বলেছেন এবং লিখেছেন। আমি নিজেও যা কিছু অধ্যয়ন করেছি এবং শুনেছি তাতে কখনও সন্তুষ্ট হইনি। পরে যখন এইসব বিষয়ে গবেষণা করি তখন যে অর্থ বেরিয়ে আসে তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইব। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি সবকিছু বলে দিচ্ছে। বলছে ধর্ম দিয়ে জীবনের প্রারম্ভ হওয়া উচিত এবং মোক্ষ দিয়ে তার সমাপ্তি হওয়া উচিত। এর মাঝখানে রয়েছে অর্থ এবং কাম। এখানে ধর্মের তাৎপর্য হচ্ছে ধারণ করার যোগ্য। যা কিছু ধারণ করার যোগ্য তাকেই ধর্ম বলা হয়। এবার আমরা কীভাবে জানব যে কি ধারণ করার যোগ্য এবং কি ধারণ করার যোগ্য নয়। এর উত্তরও এই বাক্যের মধ্যেই রয়েছে এবং তা হচ্ছে যা কিছু ধারণ করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তা ধর্ম

হবে এবং যা কিছু ধারণ করলে বন্ধনে আবদ্ধ হই সেইসব অধর্ম হবে। এই কারণে ধর্মের মাপকাঠি হবে মোক্ষ। অর্থাৎ যে প্রকারের জীবন আমাদের মোক্ষ প্রদান করবে সেটি হবে ধর্ম এবং যে প্রকারের জীবন আমাদের বন্ধন প্রদান করবে তা হবে অধর্ম। এখানে আরেকটি কথা মাথায় রাখা উচিত যে এইসব জীবিত থাকাকালীন অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। মৃত্যুর পরের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। যদি মোক্ষের তাৎপর্য মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়ে হতো তবে তা থেকে আমরা এটি কখনই জানতে পারতাম না যে কোনটি ধারণ করলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় অথবা কোনটি ধারণ করলে বন্ধন প্রাপ্তি হয়। যেখানে বন্ধন থাকবে সেখানেই মোক্ষের কথা বলা যায়। দুটোই একই স্তরের কথা। এমনটি হতেই পারে না যে বন্ধন তো এই সংসারের মধ্যে প্রাপ্তি হয়েই যাচ্ছে এবং মোক্ষ অন্য কোনো সংসারে অথবা সংসারের ওপারে অন্য কোনো জগতে পাওয়া যাবে। যদি অন্য কোনো জগতের কথা হতো তবে তো আমরা জানতে পারতাম না ধর্ম মূলত কী। তাহলে এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি— উপরে যে চার বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তা জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, মৃত্যুর সাথে নয়। আমার গবেষণা অনুযায়ী মোক্ষের তাৎপর্য হচ্ছে জীবনের সন্তুষ্টি প্রদানকারী চরম অবস্থা। অর্থাৎ আমরা অনুভব করব— যা কিছু জ্ঞান আমরা গ্রহণ করতে চাইছি তা গ্রহণ করতে পারছি। যে কর্ম আমরা করতে চাইছি তা করতে পারছি। যা কিছু ভোগ করতে চাইছি তা ভোগ করতে পারছি। যখন বিশ্রাম করতে চাইছি তা করতে পারছি। যখন এমন জীবন মিলবে তখনই কেবলমাত্র সন্তুষ্টি উৎপন্ন হবে। যদি এই অবস্থা আমাদের জীবনে সর্বদা বজায় থাকে তবে এমন অবস্থাকে মোক্ষ বলা হবে। যদি এমন অবস্থা আমাদের জীবনে না আসে তবে তাকে বন্ধন নামে জানা উচিত। বন্ধনের তাৎপর্য এটিই হবে যা কিছু জ্ঞান আমরা গ্রহণ করতে চাইছি তা গ্রহণ করতে পারছি না, যে কর্ম আমরা করতে চাইছি তা করতে পারছি না, যা কিছু ভোগ করতে চাইছি তা ভোগ করতে পারছি না, যখন বিশ্রাম করতে চাইছি তা করতে পারছি না। তাই বন্ধনের অবস্থা কোনো মানুষই চায় না। কোনো মানুষই চায় না তার কামনার পূর্তি না হোক। সকলেই চায় তাদের কামনার পূর্তি নিরন্তর হতে থাকুক। এই অবস্থাকেই মোক্ষ বলা উচিত। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষ প্রাপ্তি অর্থাৎ সর্বদা সুখী অবস্থায় থাকা। এবার যখন জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ হয়ে গেছে তখন এ প্রশ্নই উঠে আসছে যে— এই অবস্থা কীভাবে প্রাপ্ত করা যাবে। এ বিষয়টিকে বোঝার জন্য মানুষ ধর্ম দিয়ে প্রারম্ভ করেছে। ধর্মের অর্থ বুঝতে চাইলে সর্বপ্রথমে আমাদের এই বিষয়টিকে জানতে হবে যে— আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী এবং তা পাবার জন্য কী ধারণ করা উচিত এবং কী উচিত নয়। সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫ থেকে ২০ বছর বয়স অবধি সকল শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ধর্ম শিক্ষায় শিক্ষিত করানো উচিত। যার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সময় কালেই প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে যেন সঠিক বোধ তৈরি হয়ে যায়।

এরপর আসে অর্থ। অর্থ কী এবং এর উৎপত্তি কীভাবে হয়? এখানে অর্থের তাৎপর্য হবে যেসব বস্তু এবং পরিষেবা উপভোগ করলে আমাদের সার্বিকভাবে সুখ প্রাপ্তি হয় সেইসব বস্তু এবং পরিষেবাসমূহকেই অর্থ বলা হয়। আর যা থেকে আমাদের দুঃখ প্রাপ্তি হয় তাকে অনর্থ বলা হয়। এরপর আসে কাম। কামের তাৎপর্য হচ্ছে আমাদের ইচ্ছে, কামনা, বাসনা ইতাদি। এই সংসারে সকল মানুষের কামনা ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। এইজন্য অর্থও আলাদা হয়ে থাকে। একজন একটি বস্তু থেকে সুখ পেয়ে থাকলে অপরজন অন্য বস্তু থেকে দুঃখ পেয়ে থাকে। আবার কখনও একই বস্তু থেকে সুখ কখনও একই বস্তু থেকে দুঃখ পেয়ে থাকে। আমাদের কীসের থেকে সুখ আসবে তা ঠিক হবে আমাদের কামনা বাসনা কী রয়েছে তার উপর। কামনার পূর্তি থেকে আমরা সুখী হই এবং কামনার অপূর্তি থেকে আমরা দুঃখী হই। জ্ঞানের আধারে আমাদের কামনা উৎপন্ন হয় কিন্তু পূর্তি হয় অর্থের আধারে। এখানেই মোক্ষের বিষয় আসে। যদি আমাদের কামনা অবিরত পূর্তি হতে থাকে তবে মোক্ষের অবস্থা উৎপন্ন হয়। নীচের বাক্যগুলিকে দেখলে আপনি জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ প্রাপ্তি। যার জন্য আমাদের কিছু ধারণ করতে হবে। আমরা যা ধারণ করব তা থেকে যদি মোক্ষ প্রাপ্তি হয় তবে তা হবে ধর্ম। ধর্ম কী হবে তার কষ্টিপাথর হবে মোক্ষ। মোক্ষ প্রাপ্তি হয় কামের দ্বারা। যদি আপনি জীবিত থাকেন এবং কামনাও না থাকে তাহলে আপনার জীবিত থাকার কোনো তাৎপর্য থাকে না। তাই মোক্ষ নির্ভর করে আমাদের কামনার নিরন্তর পূর্তি হচ্ছে কিনা তার উপর। কেবলমাত্র অর্থের দ্বারাই কামনার পূর্তি হতে পারে। অর্থের প্রাপ্তি সম্ভব হবে ধর্মের দ্বারা। ধর্মের অর্থ হচ্ছে আমরা যেন মোক্ষ প্রাপ্তি করতে পারি। এবার আমরা বুঝে নিতে পারি যে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ— এই চার বিষয় কীভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কীভাবে তা মানুষের জীবনকে এক সঠিক দিকনির্দেশ প্রদান করে।

প্রশ্ন ২৫ ।। আপনার নতুন ব্যবস্থা আসার পর কারোর কোনো দুঃখ থাকবে না। তাহলে তো কর্ম-ফলের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়ে যাবে? যে সকল জীব পূর্ব জন্মে পাপ করে এসেছে সেই পাপের দন্ড কীভাবে মিলবে?

উত্তর ।। আমার গবেষণা অনুযায়ী এমনটি কিন্তু হয় না। এই সংসারে প্রকৃতি দ্বারা কোনো দন্ড বিধান তৈরি করা হয়নি। এই সংসারের রচনা কেবলমাত্র সকল প্রকার সুখ প্রাপ্তির জন্যই হয়েছে। যখন আদি চেতন সত্ত্বা অথবা ঈশ্বর একা ছিল তখন তার ভেতরেই সুখী হবার বাসনা ছিল। সেই আদি চেতন সত্ত্বাই রূপান্তরিত হয়ে এই সংসারে পরিণত

হয়েছে। স্রষ্টাই সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন একটি বীজ থেকে বৃক্ষ হয়, পরে সেই বৃক্ষ ফলের মাধ্যমে বহু বীজে রূপান্তরিত হয় তেমনি স্রষ্টাও প্রাণীরূপে বহুত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মনুষ্য এবং মনুষ্যের সকল গুণাবলী সেই স্রষ্টার ভেতর ছিল। এই সংসারে সেই স্রষ্টাই বর্তমানে মনুষ্যরূপে পূর্ণ চেতনায় বিরাজ করছে। অবশিষ্ট সৃষ্টিও অবচেতন, অর্ধচেতন, কোথাও অধিচেতনরূপে অবস্থিত রয়েছে। সেই স্রষ্টাই আপন ইচ্ছে অনুযায়ী সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার সুখ প্রাপ্তি করা। এবার ঈশ্বর নিজেকে কেনই বা দণ্ড প্রদান করবে? এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আমার দ্বিতীয় পুস্তক 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন' অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

এমনটি নয় যে মানুষ পূর্ব জন্মে যে পাপ করেছিল এবং সেইসব পাপের দণ্ড বর্তমানে ভোগ করছে। এই দন্ড বিধান কেবলমাত্র মানুষের কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এখনও অবধি এমন ব্যবস্থা আসেনি যেখানে পুনর্জন্মের দন্ড বিধানের প্রয়োজনই পড়বে না। আমি এই বিষয় সম্পর্কে জেনেছি এবং এমনতর একটি ব্যবস্থার কল্পনাও করে ফেলেছি। যেখানে কোনো দণ্ড বিধানের প্রয়োজন পড়বে না এবং সকলেই নিজেদের ঈপ্সিত সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে। এই নতুন ব্যবস্থাকে আমি এমনভাবে রূপায়িত করেছি যেখানে একজনের সুখ কখনই অন্যের জন্য দুঃখের কারণ হবে না। বরং একজনের সুখ অপরজনের সুখের কারণ হবে। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় একজন যত অধিক সুখ ভোগ করবে অপরের জন্যও সুখ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নতুন ব্যবস্থায় সকলের সুখ পর্যাপ্ত থাকবে। শুধুমাত্র পুণ্য সৃষ্টি হবে কোনো পাপ সৃষ্টি হবে না। মানুষের পাপ-পুণ্যের জন্য বাস্তবে ভ্রষ্ট ব্যবস্থাই দায়ী, কোনো ব্যক্তি নয়। এর কারণ হচ্ছে মানুষ এখনও পর্যন্ত সেই জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে পারে নি যেখানে সে একটি সঠিক ব্যবস্থার কল্পানা করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বৈজ্ঞানিকরা যতদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং বাল্বের আবিষ্কার করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা রাতের অন্ধকারে বাস করতে বাধ্য ছিলাম। এবার আপনি কি বলবেন আমরা সকলে তখন কোনো না কোনো পাপের দন্ড ভোগ করছিলাম? এর জন্য আপনি কাকে অপরাধী বলবেন? যখন বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ এবং বাল্বের আবিষ্কার করে দিলেন এবং নির্মাণ ও বিতরণ ব্যবস্থার কারণে এখন বহু মানুষের কাছে আলোক বাতির সুবিধা পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানে দুর্গম স্থানেও পৌঁছে যাচ্ছে। এবার আপনি কি বলবেন মানুষ পূর্ব জন্মের পুণ্যের কারণে এই সুখ উপভোগ করছে? বাস্তবে এই সকল সুখ আমাদের জ্ঞানের কারণে উপভোগ করছি এবং অজ্ঞানের কারণে যাবতীয় দুঃখ প্রাপ্ত করে চলেছি। এই জ্ঞান এবং অজ্ঞান হয়তো আমাদের কাছে ব্যক্তিগত মনে হতে পারে মূলত তা সমষ্টিগত। যারা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন তাদের জন্য কি সেই সময়কালীন সমাজের অবদান থাকে না? এবার আপনি একজন বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে ভাবুন। সেই বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানী হবার পেছনে কি মনুষ্য সমাজের যোগদান নেই? অবশ্যই রয়েছে।

সেই সময়ে যেমন ব্যবস্থা ছিল সেই মত তারা নিজেদের শিক্ষা, লালন-পালন ইত্যাদি সমাজ থেকেই পেয়েছে। যার কারণে তারা এত জ্ঞানী হতে পেরেছে। তাই গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে এখানে সমস্তকিছুই হচ্ছে সমষ্টিগত।

আপনি পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে আমি বলব সেসবও সমষ্টিগতই হবে। ব্যক্তিগত বলার অর্থ হবে সেই ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করা। পাপজ্ঞান এবং পুণ্যজ্ঞান মূলত অজ্ঞান থেকেই উৎপন্ন হয়। যার কারণ সমষ্টিগত ব্যক্তিগত নয়। এই সংসারে আমরা যতটুকু জ্ঞান প্রাপ্ত করব ততটুকুই সুখ সকলে উপভোগ করব এবং যে সকল বিষয়ে আমরা অজ্ঞানী থাকব সেইসবদিক গুলিতে আমরা দুঃখ ভোগ করব। এবার আশা করি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন ২৬ ।। সকলের পক্ষে কি পরম সুখী হওয়া সম্ভব?

উত্তর ।। অবশ্যই সম্ভব। চলুন এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। দুজন অভিভাবকের কল্পনা করুন যারা সমস্ত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। ধরুন তাদের একটি সন্তান রয়েছে সে মাতাপিতার সাথেই থাকে। পিতামাতা সমৃদ্ধশালী হবার কারণে সেই সন্তান যা কিছু ইচ্ছে করে সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হতে থাকে। সেইসময় যেমন সুখসুবিধা সম্ভব ছিল সেই অনুযায়ী। যেমন করে আমরা প্রবীণদের কাছ থেকে গৌতম বুদ্ধের গল্প শুনে থাকি। গৌতম বুদ্ধ ৩০ বছর বয়স অবধি কোনো রকম দুঃখ অনুভব করেননি। তারপরই তিনি দুঃখ অনুভব করেন এবং সেইসব দুঃখ সমাধানের জন্য রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সন্যাসি হয়ে যান। এই গল্পের মাধ্যমে আমি বলতে চেয়েছি যেভাবে গৌতম বুদ্ধের ৩০ বছর বয়স অবধি কোনোপ্রকার দুঃখ অনুভব হয়নি, একইভাবে সকলের জীবন এতটাই সমৃদ্ধশালী তৈরি করা যেতে পারে যে কারোর জীবনে কোনোপ্রকার দুঃখ যেন না আসে। এবার যখন জীবনে দুঃখই থাকবে না তখন দুঃখ বলে কিছু রয়েছে এমন কেউ অনুভবও করবে না। কোনো এক বয়সে যদি কারোর জীবনে আধ্যাত্মিক উৎসুকতা জাগ্রত হয়ে যায় এবং তা অভ্যাস করারও ব্যবস্থা থাকে তাহলে তার জীবনে কোনোপ্রকার দুঃখ থাকবে না। গৌতম বুদ্ধ যদি এমন কোনো ব্যবস্থা পেতেন যার মাধ্যমে দুঃখের কারণ জানা যেত তাহলে তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে কঠিন তপস্যার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে তার প্রয়াস করতেন না। তাকে কোনোপ্রকার দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হতো না। আনন্দের সাথে এই সকল জ্ঞান প্রাপ্ত করতেন এবং জীবনে কোনোপ্রকার দুঃখই থাকত না। এইভাবে আমরা বুঝে নিতে পারি যে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করা সম্ভব, যদি সকল প্রকার ব্যবস্থা নির্মাণ করে দেওয়া যায়। এমন ব্যবস্থা যেখানে আমরা যেমন জ্ঞান অর্জন করতে চাই,

যেমন কর্ম করতে চাই, যেমন ভোগ করতে চাই এবং যেমন বিশ্রাম করতে চাই সেসব করতে পারব। এই নিয়ম অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা থাকলে দুঃখ থাকার কোনো কারণ তো আমার চোখে পড়ে না। যদি আপনি কিছু দেখতে পান তাহলে সে সম্পর্কে আমায় অবগত করুন। আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ। আমি নিশ্চিত হয়েই বলতে পারি জীবনে পরম সুখের অবস্থা সহজেই প্রাপ্ত করা সম্ভব। আমি এমন একটি ব্যবস্থাকেই খুঁজে নিয়েছি যেখানে এইসব অতি সহজেই সম্ভব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ২৭ ।। অরবিন্দ দর্শন অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেবত্বের অভিব্যক্তি। এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ।। এর উত্তর তো আপনি অতি সহজেই বের করে নিতে পারেন। আপনাকে শুধুমাত্র এইকথা জিজ্ঞেস করতে হবে— দেবত্ব প্রাপ্তির পর উনি কী করবেন? কেননা উদ্দেশ্যের অর্থ এমন হওয়া উচিত যেন সকল প্রশ্নের সমাপ্তি হয়ে যায়। সেখান থেকে আর কোনো প্রশ্ন যেন উদয় হতে পারে না। অর্থাৎ আমরা আর জিজ্ঞেস করতে পারি না এরপর কী হবে? যদি কোনো ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয় শিক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য কী? তাহলে সেই ছাত্রটি বলবে, ভাল কোনো চাকরি পাবার জন্য অধ্যয়ন করছি। বাস্তবে এটি কিন্তু অন্তিম উদ্দেশ্য হল না। কেননা আপনি সেই ছাত্রকে আবার জিজ্ঞেস করবেন ভাল চাকরি পাবার পর সে কী করবে? ছাত্র আপনাকে বলবে, এতে আমি সম্মানজনক জীবন-যাপন করতে পারব। এখানেও প্রশ্ন সমাপ্ত হয় না। আপনি আবার জিজ্ঞেস করবেন, সম্মানজনক জীবন-যাপন করে কী মিলবে? এরপর ছাত্র আপনাকে বলবে, সম্মানজনক জীবন-যাপন করে আমি পরিবারের সাথে সুখ অনুভব করব এবং সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করব। এবার এই স্থানে এসে সকল প্রশ্ন সমাপ্ত হয়ে যায়। আর আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না, সুখ-সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করে কী করবে? সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন উৎপন্ন হয় না বরং এখানে এসে আলোচনা সমাপ্ত হয়ে যায়। এই আলোচনার মূল অর্থ এটিই যে সুখী থাকার ইচ্ছেই আমাদের অন্তরের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কোনো একটি কথা ইচ্ছে দিয়ে প্রারম্ভ হয় এবং ইচ্ছেপূরণ দিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়। এই জন্য আমি বলতে পারি জীবনের উদ্দেশ্য দেবত্ব প্রাপ্তি হতে পারে না, বরং সুখ প্রাপ্তিই হবে জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কেননা কোনো ইচ্ছের সমাপ্তি ইচ্ছেপূরণ দ্বারাই হতে পারে তার পূর্বে নয়। দেবত্ব প্রাপ্তি থেকেও কিছু না কিছু লাভ হবে তাই না? দেবত্ব প্রাপ্তি হলে এমন সুখ কি আমরা পাব যেমনটি একটি ভাল চাকরি অথবা সুস্বাদু আহার গ্রহণ করলে পেয়ে থাকি? তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সমস্ত প্রশ্ন সুখের প্রান্তে এসেই থেমে যাচ্ছে। এইজন্য সুখ প্রাপ্তিই হবে জীবনের উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়। সুখ প্রাপ্তির জন্য

অবশিষ্ট সব বিষয় মধ্যবর্তী উপকরণ হতে পারে অন্তিম উদ্দেশ্য কখনই নয়। তাই সুখের কাছে এসেই আলোচনা সমাপ্ত হবে অন্য কোথাও নয়।

প্রশ্ন ২৮ ।। জীবনে কি এমন কোনো বিষয় আছে যা যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা এবং যুক্তি দ্বারা বোঝানো যেতে পারে? মানুষের জীবনে বিশ্বাসের স্থানই বা কোথায়?

উত্তর ।। অবশ্যই যুক্তির মাধ্যমে সবকিছু নিজে বোঝা এবং অপরকে বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু এইকথা বোঝার পূর্বে সর্বপ্রথমে বুঝতে হবে যুক্তি কী এবং এর উপযোগিতা কী। যুক্তি সম্পর্কে মানুষের নানা প্রকার ভুল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে যুক্তির দিয়ে আমাদের অনুভব কাউকে বোঝানো সম্ভব নয়। কারণ যুক্তির মাধ্যমে আমি যেমন অনুভব করব অপরজনও কি একইরকম অনুভব করবে? সুতরাং আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে যুক্তি কোনো বিষয়ের অনুভবকে বোঝানোর জন্য করা হয় কাউকে অনুভব করানোর জন্য নয়। যেমন জল দ্বারা পিপাসা নিবারণের অনুভব হয় তা দিয়ে মখমলের নরম অনুভব তো হয় না। তেমনি প্রতিটি সামগ্রীর নিজস্ব গুরুত্ব এবং পরিণাম থাকে। যুক্তি এমন একটি মাধ্যম যা আমাদের বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান প্রদান করে থাকে, এমনকি আমরা সেই বিষয় সম্পর্কে অনুভব না করলেও যুক্তির মাধ্যমে এই পরিণাম পেতে পারি। এর চেয়ে আলাদা কোনো পরিণামের আশা করার অর্থ হল আমরা যুক্তির সম্বন্ধকে বুঝতে পারিনি। যুক্তি কি ধরণের উপকরণ এবং আমাদের জীবনে এটির কি গুরুত্ব রয়েছে? যুক্তি কোনো অনুভব করার উপকরণ নয়। যুক্তিকে এভাবে বুঝে নিতে হবে ধরুন— কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এবার আপনার অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হয়েছে। এখানে আপনি নিজের কাছে থাকা অনুভব ছাড়া এমন কোনো বিষয়বস্তুকে বুঝতে চাইছেন যার সম্পর্কে আপনার পূর্বের অনুভব নেই। আপনি আপনার অনুভবের আধারেই যুক্তি প্রস্তুত করেন এবং সেই সম্পর্কে অনেক বিষয় বুঝতে পারেন। এমনটি নয় যে অজানা বিষয় সম্পর্কে অনুভব হয়ে যাবে। অনুভব তখনই হবে যখন আপনি সেই বিষয়বস্তুর সংস্পর্শে আসবেন। আমাদের জীবনে এই তর্কযুক্ত বোধের একটি নিজস্ব উপযোগিতা রয়েছে। যে সকল অনুভব আমরা উপলব্ধি করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেইসব অনুভবকে আমরা বোঝাতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় যুক্তি দ্বারা না বুঝব। তাহলে যুক্তি এখানে আমাদের এমন কিছু বোঝাতে সাহায্য করে যা কেবলমাত্র অনুভব দ্বারা বোঝা সম্ভব হতো না। তাই যুক্তি আমাদেরকে কোনোকিছু বুঝতে সাহায্য করে এবং বোঝানোর এই মাধ্যমই হচ্ছে তর্ক। যুক্তি আমাদের সঠিক এবং ভুলের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। করব কি করব না, খাব

কি খাব না, যাব কি যাব না ইত্যাদি বলে দেয়। এইভাবে আমরা যুক্তির গুরুত্বকে বুঝে নিতে পারি। আমি আপনাদের এইসব বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি সেটিও তো যুক্তির দ্বারাই এবং আপনিও যে বুঝতে পারছেন সেটিও তো যুক্তির সাহায্যেই। যুক্তির সহায়তায় সমস্তকিছুই বোঝা সম্ভব। তা সে আত্মা হোক বা ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয় হোক, অথবা অন্য কোনো বিষয় হোক না কেন। হোক বা না হোক দুটোই যুক্তির সহায়তায় বোঝা যেতে পারে। শুধুমাত্র যুক্তির ব্যবহার করতে জানা চাই। এটিও একটি শিল্পকলা।

প্রশ্ন ২৯ ।। সংস্কার বিষয়ে আপনি কী বোঝেন? নতুন ব্যবস্থায় আপনি মন্দ সংস্কারকে কীভাবে সংশোধন করবেন?

উত্তর ।। সংস্কারের অর্থ হচ্ছে জেনে বুঝে প্রদান করা কোনো আকার। অর্থাৎ কোনোকিছুকে উপযুক্ত তৈরি করা। আপনি শুনে থাকবেন যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ঔষধির সংস্কার করা হয়। কেননা প্রকৃতিতে বহু ঔষধ শুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না বলে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। তাই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সেসবের শোধন করে নিতে হয়। তাতে এমন কিছু তত্ত্ব মিশে থাকে যা সরাসরি ব্যবহার করলে উপকার করবে না বরং অপকার করবে। ঔষধ থেকে ক্ষতিকারক তত্ত্বগুলিকে নিষ্কাশন করার প্রক্রিয়াকে সংস্কার বলা হয়। একইভাবে জন্মের সময় মানুষের কাছে সংসার সম্পর্কে এবং সমাজ সম্পর্কে কোনো আগাম তথ্য থাকে না। যদি সে কোনো তথ্য ছাড়াই বড় হয়ে যায় তবে তার নিজের সাথে সমাজের কোনো মেলবন্ধন থাকবে না। যার কারণে তাকে এবং সমাজকে বহু অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে। সমাজে বহু রকমের দুঃখ উৎপন্ন হবে। উদাহরণস্বরূপ পথে চলাচলের সময় যদি কাউকে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষা না দেওয়া হয় তবে সে পথে চলার সময় কোনোরূপ নিয়ম পালন করবে না। ফলে বার বার দুর্ঘটনা ঘটবে, সমাজে দুঃখ উৎপন্ন হতে থাকবে। তাই মানুষকে ওইসব প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা অথবা শিক্ষিত করাকেই সংস্কার বলা হবে। বলা হবে সমাজ তাকে সংস্কার প্রদান করছে অথবা শোধন করছে। অর্থাৎ তাকে সভ্য করে তোলা হচ্ছে এবং সমাজে বসবাসের যোগ্য তৈরি করা হচ্ছে। এতে নিজের এবং সকলের জীবন সুখে থাকবে। এটিই হচ্ছে সংস্কার। না অধিক না কম। সংস্কারের অর্থ উপযুক্ত তৈরি করা। উপযুক্ত তৈরি করার অর্থ তার ব্যবহারিক জীবন যেন সুখের হয়। এমনটি নয় যে কেউ ভ্রষ্ট হয়ে জন্ম নিয়েছে এবার তাকে শোধরাতে হবে। এর থেকে আপনি বুঝে নিতে পারেন যে পূর্ব জন্মের কোনো সংস্কারের সাথে এই জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি এই জীবনের সংস্কারের সাথেও পরবর্তী জীবনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এই জীবনে সংস্কারের সম্পর্ক এই জীবনের সাথেই জড়িত। কেননা প্রকৃতির নিয়মে পূর্ব জীবনের কথা কোনো আমাদের মনে

থাকে না এবং এই জীবনের কোনো কথাও পরের জীবনে মনে থাকবে না। এই জীবনে যদি আপনি অন্য কোনো দেশে বসবাস করতে যান তবে আপনাকে সেই দেশের আইন কানুন অথবা সংস্কার শিখতে হবে। তা নাহলে সেখানে সুখে বসবাস করতে পারবেন না। নিজেও দুঃখী হবেন এবং সেখানকার সমাজও দুঃখী হবে। দুঃখ তো কেউ চায় না। এইজন্য সংস্কার প্রদান করা হয় যেন সকলে সুখে জীবন-যাপন করতে পারে। খুব ভাল হয় পুরো বিশ্বে যদি একরকম নীতিনিয়ম অথবা একরকম সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেন বারবার সেইসব শিখতে না হয়। এই পুস্তকের মাধ্যমে এটিই বলছি চাইছি যে সম্পূর্ণ বিশ্বে সমস্ত শিক্ষা ও নীতিনিয়ম একরকম হোক। এতে বহু সমস্যা উৎপন্নই হবে না যা বর্তমানে অবিরত হয়ে চলেছে। একজন কিছু বললে অপরজন অন্য কিছু বোঝে। ফলে সমস্যার পাহাড় উৎপন্ন হয়। যার কোনো সমাধান দেখতে পাওয়া যায় না। মনে হয় মনুষ্য জাতি দুঃখ ভোগ করার জন্যই অভিশপ্ত। কিছু মানুষের বোধের অভাবে এটিকে সমাজের অভিন্ন অঙ্গ মনে করে থাকে। এর ফলে তারা সগর্বে দুঃখ ভোগ করে চলেছে। তারা বলে থাকে সুখ-দুঃখ জীবনের অভিন্ন অঙ্গ। জীবনে দুটোই থাকবে। এ নিয়ে আমরা কিছু করতে পারব না। যদিও আমরা বুঝে গিয়েছি যে একথা সত্য নয়। অজ্ঞানতাই হচ্ছে এর মূল কারণ।

মন্দ সংস্কারের অর্থ হচ্ছে কারোর কাছে কোনো বিষয় নিয়ে ভুল সূচনা রয়েছে। যখনই আপনি জেনে যাবেন এইসব তথ্য এবং জ্ঞান ভুল তখনই তাকে সংশোধন করে নিন। একেই সঠিক সংস্কার করা বলা হবে। এর অধিক কিছু নয়। আশা করি আপনি আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছেন।

***

অধ্যায় ১৫

সারাংশ

এই পুস্তক সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে অতি সহজেই পৌঁছাতে পারি এই ভেবে যে এখন আমাদের কাছে সমস্ত সমস্যার সমাধান একটি পুস্তক আকারে রয়েছে। এই পুস্তক অনুযায়ী আমরা কোনো দুঃখ ছাড়াই একটি সর্বাধিক সুন্দর, সুস্থ্য এবং সুখী জীবন উপভোগ করতে পারি। কারোর জন্য কোনো প্রকারের দুঃখ এই নতুন ব্যবস্থায় উৎপন্নই হবে না এবং আমাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সমস্ত প্রকার সুখ সর্বদা প্রাপ্ত হতে থাকবে। অর্থাৎ আমরা যে কোনো জ্ঞান, কর্ম এবং ভোগ অরিরত উপভোগ করতে থাকব। কোনোপ্রকার সুখ প্রাপ্তির জন্য মানুষের জীবনে এই তিন প্রকার বিষয়ই রয়েছে। সকল প্রকার সুখ এই তিন প্রকার মাধ্যম দিয়েই আমরা প্রাপ্ত করতে পারি।

সম্পূর্ণ সমাধান জানার পর এই প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত যে আমরা সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থা কি অন্যের জীবনে দেখতে চাই? যদি না চাই তবে এই প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হয়ে যাক। এরপর কেউ বলতে পারবে না— ভাই আমি তো চাই সকলের জীবন সুখের হোক কিন্তু কোনো সমাধান তো আমাদের কাছে নেই, সুতরাং আমি কি করতে পারি? এবার মানুষকে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে তারা কোন দিকে রয়েছে। তারা সকলের জন্য সুখ চায় কিনা। যদি চায় তবে হ্যাঁ বলতে হবে এবং যদি না চায় তবে স্পষ্ট করে না বলতে হবে। যদি সুখী হবার পক্ষে অধিক সমর্থন হয় তবে এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের কর্ম শুরু করা হবে। যদি সুখী না হবার পক্ষে অধিক সমর্থন আসে তবে এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার এই ব্যবস্থার বার্তা বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা সকল ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম লক্ষ্য।

দ্বিতীয় লক্ষ্য তখনই প্রারম্ভ হবে যখন সুখী হবার পক্ষে সর্বাধিক সমর্থন আসবে। দেখা যাক কোন পক্ষের মতামত সর্বাধিক হয়। আমার বোধ অনুযায়ী সুখী হবার পক্ষে সর্বাধিক ভোট শীঘ্রই এসে যাবে। এরপর এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কী হবে তার উপরেও একটি পুস্তক রচনা করব। যার মাধ্যমে

আপনারা জানতে পারবেন আমরা কীভাবে বর্তমান ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হব। তবে আমি একটি কথা এখনই বলে দিতে চাই— বর্তমান ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে কোনো ব্যক্তির কোনোপ্রকার সমস্যা হবে না। কারোর সাথে কারোর লড়াই হবে না, এমনকি কাউকে কোনো রকম বাধ্যও করা হবে না। ব্যবস্থার পরিবর্তন কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের নিয়েই হবে যারা নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে চায়। যারা পুরনো ব্যবস্থায় অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থায় জীবন-যাপন করতে চায় তারা নিজেদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা তৈরি করে জীবন-যাপন করতে পারবে। যেন একে অপরের সাথে কোনো রকমের সমস্যা উৎপন্ন না হয়। অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থা সকলকেই পরম স্বাধীনতা প্রদান করবে। সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থার সাথে জীবন-যাপন করে সকলের এমন অনুভব হবে যেন তারা সব সময়ের জন্য পরম স্বাধীন রয়েছে। কখনই কোনো প্রকারের দাসত্ব অনুভব করবে না।

***

পরিশিষ্ট

পাঠকবর্গের মতামত

শ্রী প্রেমজিৎ সিরোহী মহাশয় একজন অনুসন্ধানকারী, চিন্তাবিদ এবং রহস্যদর্শী। গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি মানব প্রক্রিয়ার মূল এবং স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে বুঝেছেন। এমনকি তাকে কি করে সহজভাবে অর্জন করা যায় তার রোডম্যাপও প্রদান করেছেন।

ওনার রচিত 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক সত্যই সম্পূর্ণ কেননা এটি মানব চেতনার মূল আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ সুখ অনুসন্ধানের প্রতিটি দিককে বুঝে নিয়ে স্থায়ী সমাধান প্রদান করেছে। আর্থিক হোক, সামাজিক হোক, রাজনৈতিক হোক, পারিবারিক হোক অথবা বৈষয়িক হোক। আগামী ভবিষ্যতে ওনার এই অবদান ফ্রয়েড, আইনস্টাইন এবং মার্ক্সের সমকক্ষ হিসেবে পরিগণিত হবে।

ওনার এবং ULM টিমের সম্পূর্ণ প্রয়াস সমগ্র মানবজাতিকে স্বাভাবিক সুখ এবং মূল মানবীয় অধিকার দ্রুত প্রদান করবে বলে আমার বিশ্বাস—

উৎপল ইয়াগ্নিক
এম এ, এম এড
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এবং ক্যাম্পাস ডিরেক্টর,
বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া নিবাসী
ফোনঃ +৬১ ৪৫০১৭৬০০৭
ইমেল: utpalyagnik@hotmail.com

একজন মনোবিদ এবং শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি প্রতিদিন বহু মানুষের কাছ থেকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হই। যেমন— অসুস্থতা, বিরক্তি, হতাশা ইত্যাদি। তারা সহায়তা গ্রহণের জন্য আমাদের কাছে আসে। আমার সামান্য সাহায্য হয়তো তাদের মানসিক কষ্টকে কিছুটা লাঘব করতে পারে, কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে নিত্যদিন যে বহুসংখ্যক সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চলেছি তার সমসধান দিতে পারি না। স্থায়ী সমাধান না হলে সমাজে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রণা উৎপন্ন হতেই থাকবে—

'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক যা আমি রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদও করেছি সেখানে প্রেমজীৎ সিরোহী মহাশয় একটি পরিপূর্ণ সমাধানসূত্র উপস্থাপন করেছেন। এই অনুসন্ধানের জন্য ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সকলের সুখী জীবনের জন্য সমগ্র বিশ্ব একটি নতুন সুযোগ পেয়েছে। যা প্রাপ্তির জন্য আমরা বহু শতাব্দী ধরে কামনা করে আসছিলাম—

জুলিয়ানা এপস্টল
মনোবিদ, শিক্ষক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং অনুবাদক
মস্কো, রাশিয়া
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরঃ +৯১ ৯৫২৮৮ ৬৮৯৩১
ইমেল: Julia.soaring-bird@yandex.ru

ULM সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় প্রেমজীৎ সিরোহী মহাশয় রচিত 'সম্পূর্ণ সমাধান' নামক চমৎকার পুস্তকটি আমি অধ্যয়ন করেছি এবং একইসাথে এই সংস্থা যে বাস্তবিক মানব জগতের কষ্টকে উপশমের জন্য নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে তা পরীক্ষণ করে দেখেছি।

আমি অন্তর থেকে লেখকের এই রচনা এবং উদ্দেশ্যকে পূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের সুখী জীবনের জন্য সমগ্র বিশ্বে এমনই একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি—

বীরভদ্র সিং চৌহান
অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট ডিরেক্টর,
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বিভাগ এবং
হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের
সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান
যোগাযোগঃ ৮০৭৬১ ৫৪৬৬৮, ৯৯৫৮০ ০৩৬৫৯
ইমেল: virbhadra1951@gmail.com

আমি 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক অত্যন্ত মনোযোগসহ অধ্যয়ন করেছি এবং এই পুস্তকের উদীয়মান কার্যক্ষমতা যে মনুষ্যের সকল প্রকার মহান সুখানুভূতির জন্য দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকসহ সমস্ত দিক দিয়ে পরিপূর্ণ তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি।

এমন একটি স্বপ্নদর্শী এবং চিন্তাশীল ব্যবস্থা উপহার দেবার জন্য শ্রী প্রেমজীৎ সিরোহী মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। একইসাথে ULM টিমের সকল সদস্যদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এই মহান এবং ঐশ্বরিক কাজে দিনরাত সেবা প্রদান করে চলেছেন—

প্রফেসর প্রণবীর সিং

PhD (IITK), FIE, FSED,

ডিরেক্টর জেনারেল

GNIOT-GOIs, Gr. Noida,

EduVed Consortium-এর

প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট,

গ্রেটার নয়ডা, উত্তর প্রদেশ

যোগাযোগঃ +৯১ ৯৯৯০৬ ৬১৩৪৯

***

যেসব ভাষায় 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তক অনুবাদ হয়েছে
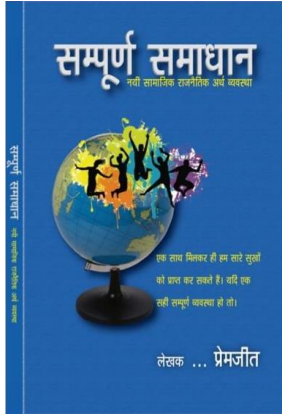
মূল হিন্দি পুস্তক, লেখক— প্রেমজীৎ সিরোহী
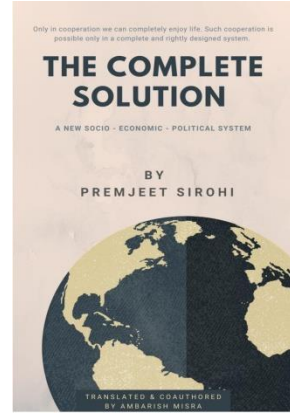
ইংরিজি অনুবাদ— অম্বরিশ মিশ্র

রাশিয়ান অনুবাদ— জুলিয়ানা এপস্টল
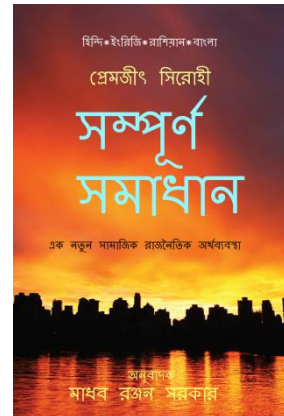
বাংলা অনুবাদ— মাধব রঞ্জন সরকার

পাঞ্জাবী, গুজরাতি, মারাঠি সহ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে।

অনলাইনে বিস্তারিত তথ্য এবং সমস্ত উপকরণ প্রাপ্তির লিংক

বাংলা

Youtube Channel— ULM Bangla

Facebook Page— ULM Bangla

হিন্দি

YouTube— ULM Hindi

Facebook Page— ULM Hindi

ইংরিজি

YouTube channel— ULM English

ফোন নম্বর

প্রেমজীৎ সিরোহী— 90133 83424 সুকান্ত প্রধান— 70010 79159

মাধব রঞ্জন সরকার— 98309 25502

সম্পূর্ণ সমাধান ব্যবস্থাকে আপনি স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করতে পারেন অথবা আমাদের সাথেও যুক্ত হতে পারেন।

***

অধ্যয়ন করুন 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন' পুস্তক
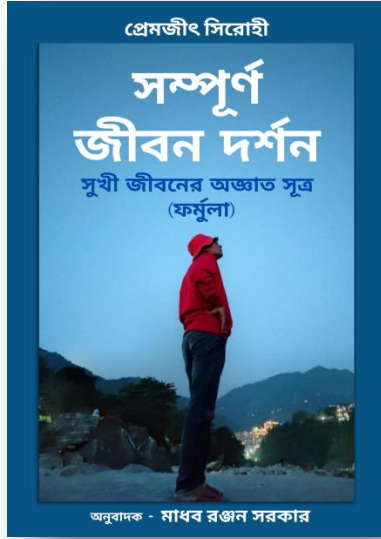
এই পুস্তকটি অধ্যয়ন করলে আপনি সমগ্র জীবনের দর্শন সহজেই বুঝতে পারবেন। আত্মজ্ঞানের উপর এর চেয়ে সরল পুস্তক কদাচিৎ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই জগতে আমরা যাকে 'আমি' বলি অথবা ইংরেজিতে 'আই' বলি অথবা সংস্কৃতে 'অহং' বলি এটিই সমগ্র জগতের বা এই শরীরের কেন্দ্র। সবই এই আমি'র জন্য। তিনিই সবকিছুর প্রধান এবং তাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র চিরকাল সুখী অবস্থায় থাকা। তিনিই সর্বদা কোনো না কোনো ইচ্ছে অথবা কামনা করে থাকেন। সুখী হতে হলে তাঁর সকল ইচ্ছে নিরন্তর পূরণ হওয়া আবশ্যক। সুখী হবার অর্থ ইচ্ছেপূরণ আর দুঃখী হবার অর্থ ইচ্ছেপূরণ না হওয়া। আকাঙ্ক্ষার পর তা পূরণের জন্য তিনি সাধ্যানুযায়ী এবং আগ্রহ অনুযায়ী অবিরত প্রয়াস করতে থাকেন। আত্মজ্ঞানের জন্য এই পুস্তকটি অত্যন্ত্য সরল এবং স্বতন্ত্র। এমনকি পূর্ণাঙ্গ সুখী জীবনের জন্যও পথপ্রদর্শক।

অনুবাদক প্রসঙ্গ

মাধব রঞ্জন সরকার

কোচবিহার জেলার গ্রামে নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম। আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে কলাবিভাগে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় আত্মীয়-পরিচিত কেউ ছিল না বলে এমনতর সিদ্ধান্তে কারোর সম্মতি ছিল না। ব্যয় করবার মত অতিরিক্ত অর্থও পিতার কাছে ছিল না। সেইসময় সেনাবিভাগে কর্মরত এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শেষ প্রান্ত তথা উত্তরে আলিপুরদুয়ার জেলা ও পূর্বে আসাম সীমান্তের কোণে অবস্থিত এক গ্রাম থেকে কেন কলকাতা শহরে আসবার সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত করে রেখেছিলেন এবং শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-নাটক-সিনেমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন তার পেছনে নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। আয়ের উৎস ও পরিবারের কর্তা হিসেবে পিতার কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক টানাপড়েন, কলহ, পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অল্প বয়সেই অনুভব করেছেন। গ্রামের অন্যান্য পরিবারেও একই সমস্যা দেখেছেন এবং সমাধান প্রদানে সমাজের ব্যর্থতাও দেখেছেন। অল্প বয়সেই তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন একটি পরিবারের সমস্যা শুধুমাত্র সেই পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার ব্যাপ্তি ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি দেখেছেন গ্রামের ক্ষমতাবান ব্যক্তি, গ্রামপ্রধান, গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু করে থানা-পুলিশ পর্যন্ত সাধারণ কলহ কিংবা সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রদানে বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। এই উপলব্ধির কারণেই হয়তো সমাজের প্রতি ভাবনা প্রখরতা লাভ করেছিল এবং আজীবন স্বতন্ত্র জীবনযাপন করবেন এমনতর সিদ্ধান্তকে সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। স্বাধীন জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষাই হয়তো শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। হয়তো টিভি-সিনেমায়-কাগজে শিল্পীদের দেখে ধারণা করেছিলেন তাঁরা স্বাধীন মনভাবাপন্ন হন, প্রভূত সম্মান পান এবং আনন্দময় জীবনযাপন

উপভোগ করেন। স্থির করেন নিজেকে তৈরি করতে হবে। নৈতিক হতে হবে। মানবিক হতে হবে। সফলতা অর্জন করতে হবে এবং সমাজের জন্য কিছু করতে হবে।

কাজের সন্ধানে অজানা শহরের নানা প্রান্তে ছোটাছুটির পর অবশেষে একটি কনসালট্যান্সি ফার্মের সাহায্যে এক মিনারেল ওয়াটারের কোম্পানিতে শ্রমিকের কাজে যোগ দিয়ে কর্ম জীবনের পথ চলা শুরু করেন। তারপর একের পর এক ইন্টারভিউ দিতে থাকেন। অপেক্ষাকৃত ভাল চাকরি পান এবং একটি বড় থিয়েটার গ্রুপে যুক্ত হন। থিয়েটারের নানা কাজকর্ম, অভিনয়, রাষ্ট্রীয় নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ ভ্রমন ইত্যাদি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর সেক্টর ফাইভের একটি বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি পান। এই সময়কালে মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুর ঘটনাটিই মূলত তাঁর জীবনে-মননে গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের গতানুগতিক ভাবনা ত্যাগ করে অভ্যন্তরীণ জীবনের প্রশ্নগুলি উদয় হতে শুরু করে। এমনই ভেঙ্গে পড়েন যে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা পেশাগত সফলতা অর্জনের যে স্বপ্ন নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই গভীর বেদনা থেকেই তাঁর মনে ব্যক্তিগত সফলতার আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যমে প্রশ্নচিহ্ন চলে আসে। পরবর্তী সমস্ত কর্মে, গতিবিধিতে, জীবন-সংগ্রামে তিনি অভ্যন্তরীণ প্রশ্নসমূহের উত্তর সন্ধানের প্রয়াসই করেছেন। সংস্কৃতিমনস্ক হওয়ায় পছন্দের কর্মসমূহের প্রতি মনোযোগী হবার প্রচেষ্টা করেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি সরকারি কোর্স করেন। ছোটোখাটো কিছু কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বন্ধুদের জন্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। পরিচালক হবার প্রস্তুতি নেন। উত্তরবঙ্গকেন্দ্রীক একটি চিত্রনাট্য রচনা করেন এবং কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে অডিশন নেন। কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটার থেকে অভিনেতা নির্বাচিত করেন এবং লোকেশন সুনির্দিষ্ট করেন। অবশেষে অসফল হন এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই সময় এক বন্ধু হঠাৎ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসায় যুক্ত করান। বোঝান স্বল্প ব্যায়ে অল্প সময়ে নিজের এবং বহু মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। সব ছেড়ে বছর কয়েক মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন। কিছুটা সফলতাও পান। কাজের সূত্রে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এরপর শিঙ্গাপুর ভ্রমন করেন। এই কাজের সুবাদে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সাথে মেলামেশার অভিজ্ঞতা হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার দিকটি বিশেষভাবে অনুভব করেন। এইপ্রকার পেশা যে সিংহভাগ সদস্যদের উপার্জন প্রদানে ব্যর্থ তা উপলব্ধি করেন। সম্মান এবং আর্থিক ক্ষতি জেনেও ওই সংস্থা ত্যাগ করেন। এরপর ব্যবসা প্রারম্ভ করলেও অবশেষে স্তব্ধ করে দেন। অন্তরে কিছু একটা অসঙ্গতি উললব্ধি করেন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতিও উৎসাহের অভাব বোধ করেন। যেন বুদ্ধের সিদ্ধান্তই

সঠিক বলে মনে হয়। নিরন্তর সংঘর্ষ এবং দুঃখভোগই অন্তিম সত্য। জীবনকে উদ্দেশ্যহীন এবং সমাধানহীন মনে হতে থাকে। সব ছেড়ে সন্যাসি হবেন মনঃস্থির করেন। কয়েকটি আধ্যাত্মিক সংস্থায় যাতায়াত শুরু করলেও অন্তরে অসামঞ্জস্য অনুভব করছিলেন। মনের গভীরে কোথাও যেন এক আত্মবিশ্বাস সুপ্ত অবস্থায় ভেসে চলেছে এই ভেবে যে, সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। শেষ পর্যন্ত সন্যাসি হবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। ঘুরতে ঘুরতে কিছু স্বদেশপ্রেমিক মানুষের সাথে পরিচয় হয়। নতুনভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী বস্তুর প্রচার-প্রসারে লিপ্ত হন। বিভিন্ন রাজ্যের সদস্যদের মিলিত উদ্যোগে একটি সংস্থা নির্মাণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পুনরায় বড় টিম তৈরি করেন। কাজও শুরু হয়। 'স্বদেশী চিকিৎসা এবং স্বদেশী ব্যবস্থা' নামে একটি পুস্তক সম্পাদনা করেন। যদিও পরে বিভিন্ন কারণে প্রোজেক্টটি থেমে যায়। অন্যতম কারণ ছিল করোনা সংক্রমণ। বাণিজ্য-জীবিকা সবই প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনিও বিশ্রাম এবং অধ্যয়নের অবসর পান। এই সময়কালেই একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। 'সম্পূর্ণ সমাধান' এবং 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন' পুস্তক দুটির সাথে পরিচিত হন। যেন এক নিমেষে পুস্তক দুটির অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। দীর্ঘ সময় ব্যাপী যে প্রশ্নগুলিকে জমিয়ে রেখেছিলেন অবশেষে সেসবের উত্তর খুঁজে পান। জীবন দর্শন সম্পর্কে স্পষ্টতা পান। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই নয় বরং সকলের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার মূল কারণ এবং স্থায়ী সমাধান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন। এই প্রথম তিনি উপলব্ধি করেন সততা, নৈতিকতা, মানবিকতা কিংবা ব্যক্তিগত অপারদর্শিতার অভাব নয় মূল কারণ ব্যবস্থাগত। উত্তর খুঁজে পেয়ে থেমে থাকেননি বরং মানুষের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনাও করে চলেছেন। যেন সকলে চিন্তন-মনন-সমীক্ষা করে স্থায়ী সমাধান সম্পর্কে স্পষ্ট হতে পারেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তিনি স্ব-উদ্যোগে পুস্তক দুটি অনুবাদ করেন এবং প্রকাশিত করেন। 'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকে পেয়েছেন বহির্জগতের ব্যবস্থা বিষয়ক স্পষ্টতা এবং 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন' পুস্তকে পেয়েছেন অভ্যন্তরীণ জগতের স্পষ্টতা। বর্তমানে তিনি ULM Bangla ইউটিউব চ্যানেলের কন্টেন্ট নির্মাণ, লাইভ অনুষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাকেন্দ্রিক সমাধান সংক্রান্ত আলোচনা, নতুন ব্যবস্থার প্রচার, অধ্যয়ন, আর্টিকেল রচনা, অডিও-ভিডিও নির্মাণ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। একইসাথে 'নতুন দর্শনের রূপরেখা' শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত এবং সরল পুস্তকের সম্পাদনা প্রারম্ভ করেছেন।

কার্ত্তিক, ১৪২৯
কলকাতা- ৭০০০৪১

মাধব রঞ্জন সরকার

'সম্পূর্ণ সমাধান' পুস্তকের বিষয়বস্তু একটি নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার রূপরেখা যা বাস্তবায়নের পর কোনো সমস্যা উৎপন্নই হবে না। যেমন— আর্থিক অসমতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, শোষণ, দমন, উৎপীড়ন, ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা, অরাজকতা, দুর্নীতি, অশান্তি, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভয়, ঈর্ষা, দাসত্ব, বন্ধন, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি।

১. সরকারিভাবে সকলের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং নিশ্চিত কর্মসংস্থান।
২. প্রয়োজনীয় সমস্ত সুখসুবিধা এবং সংরক্ষণ।
২. অর্থ ছাড়াই সরকারিভাবে সকলের জন্য সমস্ত বস্তু এবং পরিষেবা প্রাপ্তির অধিকার।
৩. সরকার নিয়ন্ত্রণের অধিকার সর্বদা জনগণের কাছে নিহিত থাকার ক্ষমতা।
৪. সকলের জন্য উচ্চ গুণমানসম্পন্ন জীবনযাপনের ব্যবস্থা।

প্রেমজীৎ সিরোহী

লেখক বিজ্ঞান বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনের পর ১১ বছর সন্যাস জীবন অতিবাহিত করেন। এরপর সন্যাস ত্যাগ করে গতানুগতিক জীবনে ফিরে আসেন। দু-প্রকার জীবনযাপনকালীন সময়ে বিভিন্ন প্রকার অনুসন্ধান করেন। সেইসব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা রচনা করেন। এরপর তিনি বক্তারূপে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মঞ্চে এই সমাধানকে পৌঁছে দেওয়ার অভিযান প্রারম্ভ করেন। তাঁর বক্তব্যগুলিতে অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র এবং মনোবিজ্ঞানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'সম্পূর্ণ জীবন দর্শন', যেখানে তিনি এক নতুন দর্শনশাস্ত্রের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। তাঁর আগামী পুস্তকের নাম 'এক দার্শনিকের জীবনযাত্রা', যেখানে দীর্ঘ অনুসন্ধানকালীন যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা এবং তথ্যাবলী সংকলিত থাকবে।